চর্যাগীতি পরিচয়

চর্যাগীতি পরিচয়
চর্যাগীতি পরিচয়

শ্রীসত্যব্রত দে
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক,
রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

॥ জিজ্ঞাসা ॥
কলিকাতা-৯ ॥ কলিকাতা-২৯
১৯৬০

প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ—১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

CHARYAGITI PARICHAYA

প্রকাশক :
শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪

॥ ভূমিকা ॥

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম নমুনা বলিয়া চর্যাপদগুলির একটি বিশেষ মূল্য রহিয়াছে। এই জন্য এই পদগুলি আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক পণ্ডিতই এ-বিষয়ে নানাভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীসত্যব্রত দে, এম্, এ মহাশয় পূর্বসূরিগণকে অনুসরণ করিয়া এই বিষয়ে নূতন করিয়া বর্তমান গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। ইহার ভিতরে তিনি চর্যাপদের ভাষা, দার্শনিকতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, সাহিত্যিক মূল্য সব দিক হইতেই একটি সর্বাঙ্গ আলোচনার চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে গ্রন্থখানি হইতে ছাত্র-সমাজ এবং সাধারণ পাঠক-সমাজ চর্যাপদগুলি সম্বন্ধে একটি মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করিতে পারিবেন। লেখক নিজে যাহা বুঝিয়াছেন তাহাকে যতটা সম্ভব পরিচ্ছিন্নরূপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরের দ্বারা কোথাও বিষয়বস্তুকে আরও জটিল করিয়া তোলেন নাই। বইখানি ছাত্র-সমাজে এবং সাধারণ পাঠক সমাজে আদৃত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

নিবেদন

বাংলা সাহিত্যের প্রথম অধ্যায় চর্যাগীতি। দুরূহতম অধ্যায়। পঠন পাঠন প্রসঙ্গে এই চর্যাগীতির •একখানি সুষ্ঠু সংস্করণের অভাব বহুদিন অনুভব করিয়াছি। বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় চর্যাগীতির নানা বিষয় লইয়া ইংরাজী বাংলা অনেক আলোচনা আছে। কিন্তু প্রাথমিক পাঠকের পক্ষে সেগুলি সংগ্রহ করা এবং তাহার মধ্য দিয়া একটি সংহত ধারণা করা সর্বদা সহজসাধ্য নহে। তাই চর্যাগীতির বিভিন্ন দিকের আলোচনা সমন্বিত একখানি নূতন সংস্করণ প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশরের সহিত একদা আলোচনা করি। অনুরূপ একখানি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনিও আমার সহিত একমত হইয়া সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া আমাকে গ্রন্থরচনায় উৎসাহিত করেন। প্রথমে পরিকল্পনা করিয়াছিলাম—গ্রন্থের প্রথমভাগে চর্যাগীতি সম্পর্কিত ঐতিহাসিক, দার্শনিক ইত্যাদি সমস্ত প্রকার তাত্ত্বিক আলোচনা থাকিবে এবং দ্বিতীয়ভাগে পাঠান্তর পাঠভেদ ইত্যাদি আলোচনা করিয়া পদগুলির পাঠনির্ণয় করিয়া বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও টীকা রচনা করিব। ডাঃ দাশগুপ্ত মহাশয়ের নির্দেশে প্রথম ভাগের আলোচনা যখন শেষ করিয়া আনিয়াছি তখন ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের 'চর্যাগীতি পদাবলী' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। আমার গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে যাহা করিতে চাহিয়াছিলাম ডাঃ সেন মহাশয়ের গ্রন্থে যোগ্যতরহস্তে তাহা সম্পাদিত হইয়া গেল। গ্রন্থ রচনার মূল

উদ্দেশ্য অনেকখানি সাধিত হইয়া যাওয়ায় গ্রন্থ প্রকাশে বেশ দ্বিধা অনুভব করিতেছিলাম। কিন্তু গ্রন্থেব প্রথম ভাগের আলোচনা দেখিয়া ডাঃ দাশগুপ্ত মহাশয় ঐ অংশটুকুই গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে উৎসাহিত করেন এবং সংক্ষিপ্ত একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়া গ্রন্থখানির গৌরব বৃদ্ধি করেন। পূর্ববর্তী সংস্করণগুলি—এমন কি শেষতম সংস্করণ ডাঃ সেন মহাশয়ের গ্রন্থখানি সত্ত্বেও এইরূপ একখানি গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল। প্রাথমিক পাঠকদের সেই প্রয়োজন এই গ্রন্থখানি হইতে মিটিবে বলিয়াই বিশ্বাস করি।

আমার গ্রন্থখানি প্রকৃত পক্ষে চর্যাগীতির কোন নূতন সংস্করণ নহে—প্রাথমিক পরিচয় গ্রন্থ মাত্র। চর্যাগীতির রচনা, রচয়িতা ইত্যাদি বিষয়ক ঐতিহাসিক আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার ভাষা, ছন্দ, গঠনপদ্ধতি, ধর্মমত, দার্শনিক পটভূমিকা ইত্যাদির বিচার বিশ্লেষণ, ইহার সমাজ পরিবেশ, সাহিত্যিক মূল্য, উত্তরাধিকার বিষয়ে সমস্ত প্রকার মন্তব্য ইহাতে সংযোজিত করিয়াছি। চর্যাগীতি বিষয়ক সমস্ত জ্ঞাতব্যই আমার আলোচনার অন্তর্গত। সমস্ত ক্ষেত্রেই যে নূতন কথা বলিয়াছি তাহা নহে, বিভিন্ন বিষয়ে পূর্বসূরীরা যে সমস্ত আলোচনা করিয়াছেন—বজ্র সমুৎকীর্ণ সেই সমস্ত মণির মধ্য দিয়া সূত্রের ন্যায় অগ্রসর হইয়া আমি মালা গাঁথিয়াছি। যাঁহারা চর্যাগীতি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান সংগ্রহ করিতে চান তাঁহাদের জন্য সমস্ত বিষয় গুলি একত্র সংযোজিত করিয়া সংহত আকার দান করিয়াছি। যেখানে নিজের মন্তব্যের প্রয়োজন হইয়াছে—সবিনয়ে তাহাও সন্নিবেশিত করিয়াছি। এই প্রাথমিক পরিচিতি প্রদানই আমার গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

মূল পদগুলির আস্বাদ গ্রহণ না করিলে—পরিচয় অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। তাই পদগুলিও গ্রন্থশেষে সংযোজিত করিয়াছি। কিন্তু এবিষয়ে প্রধান বাধা—পাঠ নির্ণয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে-রূপে পদগুলি প্রকাশ করেন তাহাতে স্বভাবতই অনেক প্রমাদ ছিল। বিষয়-বস্তু, ছন্দ, টীকা, তিব্বতী অনুবাদ ইত্যাদি দেখিয়া পরবর্তীকালে অনেকে অনেক প্রকার পাঠভেদ অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু তর্কাতীত নির্ভুল পাঠ নির্ণীত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। আলোচ্য গ্রন্থে পদগুলি সংযোজনের উদ্দেশ্য—নির্ভুল পাঠ নির্ণয় নহে—পাঠকদের সহিত পদগুলির পরিচয় সাধন। সুতরাং পদগুলির নির্ভুল পাঠ কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে আমি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করি নাই। আমার পূর্ববর্তী অংশের আলোচনার সহিত সংগতি রাখিয়া পূর্বসূরীদের বিভিন্ন পাঠের যখন যেটি সঙ্গত মনে হইয়াছে তখন সেটি গ্রহণ করিয়াছি। হয়তো সূক্ষ্ম অলোচনায় এই পাঠের স্থান বিশেষ ভ্রমপূর্ণ মনে হইতে পারে—কিন্তু তাহাতে প্রাথমিক পাঠকদের কোন অসুবিধা হইবে না। আর কোন পাঠই নিঃসন্দেহে নির্ভুল নহে। এক হিসাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঠই হয়তো দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অসংস্কৃত সেই পাঠে প্রমাদগুলি এত স্পষ্ট যে কিঞ্চিৎ সংস্কৃত পাঠ দেওয়াই শেষ পর্যন্ত সমীচীন মনে হইল। পদগুলিকে বুঝিবার জন্য সামান্য একটু ব্যাখ্যা সংকেত কিছু কিছু পাদটীকা ও মন্তব্যও সংযোজিত করিয়াছি। গ্রন্থ মধ্যস্থ আলোচনা অংশে প্রচুর উদ্ধৃতি সহযোগে বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করিয়াছি। সেই প্রসঙ্গেই অনেক পদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পরিশিষ্টের ব্যাখ্যাসংকেত ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাই বিষয়

বস্তুর উপলব্ধিতে কোন বাধা হইবে না। বরং পদগুলির উল্লেখ গ্রন্থখানির পূর্ণাঙ্গতা দানে সহায়তা করিবে বলিয়াই ধারণা। বঙ্গবাসী কলেজের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেরম্ব চক্রবর্তী মহাশয়ের পরোক্ষ উপদেশ শিরোধার্য করিয়া এ বিষয়ে পথনির্দেশ লাভ করিযাছি। তাঁহাকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

পুথিখানির নাম কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে আলোচনা আছে গ্রন্থমধ্যে। আমি গ্রন্থখানির নাম দিয়াছি 'চর্যাগীতি পরিচয়'। চর্যাপদ নামেই বাংলা সাহিত্যে এই গানগুলি পরিচিত। গ্রন্থখানির নাম চর্যাগীতি দিলেও গ্রন্থমধ্যে নির্বিচারে চর্যাপদ নামও ব্যবহার করিয়াছি। গ্রন্থের নাম—পুথির নাম সম্পর্কে কোন নির্দেশ নহে। যেহেতু এগুলি গান সেইহেতু ইহার নাম দিয়াছি চর্যাগীতি।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি পূর্বসূরীদের বিভিন্ন আলোচনা হইতে বিনা দ্বিধায় সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। গ্রন্থ কলেবরে প্রাসঙ্গিক ভাবে এবং গ্রন্থশেষে গ্রন্থপঞ্জীতে তাঁহাদের ঋণ স্বীকার করিয়াছি। হয়তো জ্ঞাতে অজ্ঞাতে আরও অনেকের গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। অনবধানতা বশতঃ তাহাদের নাম উল্লেখে ভুল হইতে পারে। তাঁহাদের নিকটও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। সর্বাপেক্ষা বেশী উপকৃত হইয়াছি ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের গ্রন্থাদি এবং তাঁহার উপদেশ নির্দেশ হইতে। তাঁহার সাহায্য ছাড়া এ গ্রন্থ প্রণয়ন সম্ভব হইত না। তাঁহার নিকট ঋণী থাকিয়াই আমি সুখী।

গ্রন্থ রচনা হইতে সুরু করিয়া প্রকাশ পর্যন্ত আর একজন শুভানুধ্যায়ীর দৃষ্টি সদা জাগ্রত ছিল। তিনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরু ডাঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য। শ্রদ্ধাস্পদ এই শিক্ষকের নিকট

আমার ঋণ অপরিমিত। তাঁহার সাহায্য ছাড়া এই গ্রন্থ রচনা বা প্রকাশ কোনটিই সম্ভব হইত না। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ধৃষ্টতা আমার নাই। তাঁহার রক্তচক্ষু শাসন হইতে বঞ্চিত না হইলেই কৃতার্থ হইব।

গ্রন্থরচনার প্রারম্ভ হইতেই অনেক শুভানুধ্যায়ী সহকর্মী, সহপাঠী, বন্ধু এবং অনেক প্রিয়জনের অনেক প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা আমাকে উৎসাহ যোগাইয়াছে। 'জিজ্ঞাসা'র সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শ্রীশবাবুও গ্রন্থ-প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। সমস্ত শুভার্থীকেই আমার সপ্রীতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

পরিশেষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমার নিবেদন শেষ করিতেছি। অনেক চেষ্টা করিয়াও গ্রন্থখানি মুদ্রন ত্রুটি মুক্ত করিতে পারি নাই। প্রুফ পরীক্ষা কার্যটি যে এত দুরূহ তাহা পূর্বে জানিতাম না! এত চেষ্টা করিয়াও দেখিলাম—বেশকয়েকটি ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। পূর্বস্থরী স্থলে পূর্বসুরী, আকাঙ্ক্ষা স্থলে আকাঙ্খা ইত্যাদি কয়েকটি বেশ মারাত্মক। এমন আরও আছে। শুদ্ধিপত্র রূপ চোখে আঙ্গুল দিয়া সেগুলি দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। সুধীপাঠকের দৃষ্টি সেগুলি এড়াইবেনা। পূর্বাহ্ণেই সেজন্য তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহাদের প্রশ্রয় লাভ করিলেই—গ্রন্থরচনা সার্থক বলিয়া মনে করিব।

বাবা ও মায়ের পাদপদ্মে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়া নিবেদন ইতি করিলাম—

"বিষ্ণুপুর" বিনীত

॥ ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ ॥ **গ্রন্থকার**

সূচীপত্র

১ ॥ রচনা ও রচয়িতা ॥

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা ঘাটিতে ঘাটিতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের যে পুথিখানি আবিষ্কার করেন এবং ৯ বৎসর পর অন্য তিনখানি পুথির সহিত 'হাজার বছরের পুরান বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে যাহা প্রকাশ করেন তাহা যে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কতখানি মূল্যবান সেকথা তখনই সকলে অনুধাবন করিতে পারেন নাই। 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে একটি খণ্ডিত ধারণা পোষণের হাত হইতে বাঁচাইয়া তিনি যে শুধুমাত্র বাঙালীর অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন তাহা নহে—আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শনের সন্ধান দিয়া তিনি বাঙ্গালীকে বিপুল গৌরবের অধিকারীও করিয়াছেন।' সেদিন যেমন বাঙ্গালী তাঁহার আবিষ্কারের মূল্য অনুধাবন করিতে পারে নাই তেমনি পারে নাই তাঁহার আবিষ্কারের বিষয়বস্তু অনুধাবন করিতে। আজও যে সকলে পারিয়াছেন তাহা নহে। তবে ক্রমেই সুধীজনের দৃষ্টি এদিকে পড়িতেছে এবং শাস্ত্রী মহাশয় প্রাথমিক বিচারে ইহার সম্পর্কে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন—তাহাকে একেবারে উল্টাইয়া না দিলেও ইহার সহিত অনেক নূতন নূতন তথ্য সংযোজিত হইতেছে।

পুথি প্রকাশের মুখবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"১৯০৭ সালে আবার নেপালে গিয়া আমি কয়েকখানি পুথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়। উহাতে কতকগুলি কীর্ত্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের মত, গানের নাম চর্য্যাপদ।" অর্থাৎ শাস্ত্রীমহাশয়ের ধারণা ছিল গানগুলির নাম 'চর্য্যাপদ', গানের পুথিখানির নাম 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়'। শাস্ত্রী মহাশয় যে পুথিখানি পাইয়াছিলেন তাহাতে সাড়ে ছেচল্লিশটি গান আছে। মাঝখানে পুথির কয়েকটি পাতা নষ্ট হওয়ায় সাড়ে তিনটি গানের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সংখ্যা দেখিয়া মনে হয় ৫০টি গানই পুথিতে ছিল।

পরবর্ত্তী কালে আরও অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় চর্যাপদগুলি সম্বন্ধে পূর্বোক্ত তথ্য অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় ধারণা করিয়াছিলেন প্রাপ্ত পুথিখানিই মূল গীতি সংগ্রহের। কিন্তু বস্তুতঃ পুথিখানি ছিল গীতি সংগ্রহের টীকার। টীকা রচয়িতার নাম মুনিদত্ত। মুনিদত্ত কৃত এই সংস্কৃত টীকার কীর্তিচন্দ্র কৃত একটি তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই তিব্বতী অনুবাদের প্রথম সংবাদ দেন ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং পরে তাহা অনুসন্ধান করিয়া আবিষ্কার করেন ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়। এই তিব্বতী অনুবাদ হইতেই চর্যাগীতিগুলি সম্পর্কে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। এই তিব্বতী অনুবাদ ছাড়া চর্যাগীতির ব্যাখ্যা ও পাঠ নির্ণয় অসম্ভব ও অসম্পূর্ণ হইতে বাধ্য।

মুনিদত্ত যে সংস্কৃত টীকা রচনা করেন তাহার নাম দেন 'চর্য্যাশ্চর্য্য বিনিশ্চয়'। লিপিকর প্রমাদে নামটি দাঁড়ায় চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়। পাঠটি অশুদ্ধ। ডাঃ বাগচী মহাশয় তিব্বতী অনুবাদের সহিত মিলাইয়া ঠিক

করেন—শুদ্ধ পাঠ হওয়া উচিত—চর্য্যাশ্চর্য্য বিনিশ্চয়। যে লিপিকর টীকাখানির অনুলিপি করেন তিনি অন্যকোন মূল হইতে টীকার সহিত মূল গীতিগুলিও সংযোজিত করিয়াছেন। লিপিকরের সম্মুখে-যে টীকা ও মূলগীতির দুইখানি পৃথক পৃথক পুথি ছিল তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত-পুথিখানিতেও আছে। ১০ম গীতিটির পর লেখা আছে—"লাড়ীডোম্বী পাদানাম্ সুনেত্যাদি চর্য্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি।" স্পষ্টতই বোঝা যাইতেছে—গীতিগ্রন্থে সুন...ইত্যাদি দিয়া আরম্ভ একটি চর্যা আছে কিন্তু টীকা গ্রন্থখানিতে তাহার ব্যাখ্যা নাই। (দ্রঃ বৌদ্ধগান ও দোহা—নূতন সংস্করণ পৃঃ ২১)। যাহা হউক প্রাপ্ত পুথিখানিতে গীতি এবং টীকা একসাথে থাকায় শাস্ত্রী মহাশয়ের ধারণা হইয়াছিল পুথিখানি মূলগীতির এবং তাহার সহিত টীকা সংযোজিত হইযাছে, এবং মূল গীতিসংগ্রহটিরই নাম 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়' (চর্য্যাশ্চর্য্য বিনিশ্চয়)। তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কারের পর এই ধারণা দূরীভূত হইয়াছে, এবং জানা গিয়াছে উক্ত নামটি টীকার,—মূলের নহে।

তাহা হইলে প্রশ্নঃ মূলের নাম কি? টীকার প্রারম্ভে মুনিদত্ত লিখিতেছেন—শ্রী লুয়ী চরণাদি সিদ্ধি রচিতহপ্যাশ্চর্য্য চর্য্যাচয়ে"...। ইহা হইতে বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় মূলগীতি সংগ্রহটীর নাম 'আশ্চর্য্য চর্য্যাচয়' হইতে পারে বলিয়া অনুমান করেন। অনুমান খুব যুক্তিসহ নহে। আশ্চর্য্য শব্দটি এখানে সাধারণ ভাবে—চর্যার বিশেষণ হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে—নামের অংশ বিশেষ নয়। মূল গীতিসংগ্রহটির নাম 'চর্যাগীতি কোষ' হইতে পারে; তিব্বতী অনুবাদ হইতেও এই সিদ্ধান্তের পরিপোষক প্রমাণ পাওয়া যায়। (দ্রঃ Studies in the Tantras Dr. P. C. Bagchi PP 74-75)

পরবর্ত্তী কালে চর্যার গীতি সংখ্যা এবং নষ্ট পদগুলি সম্বন্ধেও ধারণা কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে। পূর্বে ধারণা ছিল মোট গীতি সংখ্যা— ৫০টি। কিন্তু ১০ম চর্যার পর—লাড়ী ডোম্বী পাদের "সূন...ইত্যাদি" যে পদটি ছিল বলিয়া ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাতে বোঝা যায় আর একটি চর্যাও গীতি সংগ্রহে ছিল। টীকার মূলে যেকোন কারণেই হউক পদটির ব্যাখ্যা ছিলনা। লিপিকর শুধুমাত্র তাই পদটির ইঙ্গিত দিয়াই ছাড়িয়া দেন—সেটি আর নকল করেন নাই। এটিকে ধরিলে পদ সংখ্যা হয় ৫১টি। ইহা ছাড়াও একটি চর্যাপদ পূরাপূরি এবং কিছু কিছু চর্যাংশেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পুথির পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় যে পদগুলির সন্ধান পূর্বে পাওয়া যায় নাই ডাঃ বাগচী তিব্বতী অনুবাদ হইতে তাহাদের অনুবাদ প্রকাশ করায় তাহাদের সম্ভাব্য রূপটি সম্পর্কেও ধারণা করা যায়।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে শাস্ত্রী মহাশয় যে পুথিখানি আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা মূল গীতিসংগ্রহের নহে, তাহা টীকার, এবং সেই টীকা-পুথিখানির নাম ছিল চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়; মূলগীতি সংগ্রহটির নাম ছিল চর্যাগীতিকোষ; মূল সংগ্রহের বাহিরেও কিছু কিছু চর্যা ছিল, এবং মূল গীতিকোষটিতে বোধ হয় মোট ৫১টি চর্যা ছিল।

চর্যাশব্দটির মূল অর্থ—আচরণ। চর্যাপদেও চর্যাশব্দটি সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (কবিতাগুলির মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়াদের আচরণীয় বিধি নিষেধ ইত্যাদির আলোচনা আছে তাই পদকর্তারা ইহাকে বলিয়াছেন চর্যা।) চর্যাশব্দের অর্থ আচরণ হইলেও গীতিগুলি বুঝাইতেও চর্যাশব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। এ প্রয়োগ চর্যাগীতিগুলির

মধ্যেও আছে : অই সনি চর্য্যা কুক্কুরী পাএঁ গাইড়। (২)
এগুলি গীত হইত তাই ইহাকে চর্যাপদও বলা চলে। মূলতঃ পদ কথাটিতে Couplet বুঝাইলেও ব্যবহারে পদশব্দটি গীতিকেই বোঝায়। সুতরাং চর্যাপদের অর্থ চর্যাগীতি। প্রাচীন বাঙলায় সঙ্গীত শাস্ত্রে 'চর্যাগীতি বলিয়া' বিশেষ একটি সঙ্গীত রীতির উল্লেখ আছে। তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন চর্যা বলিতে বিশেষ এক রীতির সঙ্গীতকেই বোঝায়। অর্থাৎ তাহাদের মতে চর্যাশব্দের অর্থ এক বিশেষ প্রকার গীতরীতি। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নহে। চর্যাগীতিগুলির জনপ্রিয়তার জন্যই সঙ্গীতশাস্ত্রে তাহাদের জন্য বিশেষ একটি শ্রেণী-নির্দেশ আছে ;—আগে গান পরে গীত-রীতির উদ্ভব। আচরণ অর্থে চর্যা শব্দটির ব্যবহার বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রচুর আছে। সুতরাং চর্যাকে সেই অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে চর্যার অর্থ দাঁড়াইতেছে—মূলতঃ 'আচরণ', পরে আচরণীয় বিধি ইত্যাদি বিষয়ক কবিতা এবং পরে সেই কবিতাগুলিকে গান করিবার রীতি। চর্যার এই বিভিন্ন অর্থান্তর হইতে ইহাও অনুমান করা চলেযে—চর্যা তখনকার দিনে বিশেষ পরিচিত একপ্রকার গীতি-কবিতা ছিল। তাহার প্রমাণ সঙ্গীত শাস্ত্রাদিতে যেমন মেলে (দ্রঃ চর্যাগীতির গঠনরীতি ইত্যাদি বিষয়ক অধ্যায়)—তেমনি মেলে অন্যত্র হইতেও। মনে হয় যে ৫০।৫১টি চর্যার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা নাম মাত্র। এরূপ পদাবলী আরও অনেক ছিল। বিভিন্ন পদকর্তার যে রচনা পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে অন্য কয়েকখানি অনুরূপ পদাবলীর সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের চর্যাগীতি, কঙ্কনের চর্যাদোহাকোষ গীতিকা ইত্যাদি।

চর্যাগীতিতেও ভনিতা করিবার রীতি ছিল—মুনিদত্তও টীকাতে রচয়িতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সব মিলাইয়া মোট ২৩ জন পদ-কর্তার সন্ধান পাওয়া যায়। নিম্নে পদ কর্তাদের নাম, মোট পদসংখ্যা এবং রচিত পদগুলির ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখ করা হইল :

	পদকর্তা		মোট পদসংখ্যা		পদের ক্রমিক সংখ্যা
১।	লুই	—	২	—	১, ২৯,
২।	কুক্কুরীপাদ	...	৩	...	২, ২০ *৪৮
৩।	শান্তি	...	২	...	১৫, ২৬,
৪।	শবর	...	২	...	২৮, ৫০
৫।	দারিক	...	১	...	৩৪
৬।	বিরুঅ	...	১	...	৩
৭।	গুণ্ডরী	...	১	...	৪
৮।	চাটিল	...	১	...	৫
৯।	কামলি	...	১	...	৮
১০।	ডোম্বী	...	১	...	১৪
১১।	মহিআ	...	১	...	১৬
১২।	বীণা	...	১	...	১৭
১৩।	আজদেব	...	১	...	৩১
১৪।	ঢেণ্ঢণ	...	১	...	৩৩
১৫।	ভাদে	...	১	...	৩৫
১৬।	তাড়ক	...	১	...	৩৭
১৭।	কঙ্কণ	...	১	...	৪৪
১৮।	জয়নন্দী	...	১	...	৪৬

	পদকর্তা		মোট পদসংখ্যা		পদের ক্রমিক সংখ্যা
১৯।	ধাম	...	১	...	৪৭
২০।	সরহ	...	৪	...	২২, ৩২, ৩৮, ৩৯,
২১।	ভুসুকু	...	৮	...	৬, ২১, *২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯
২২।	কাহ্নুপাদ	...	১৩	...	৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, *২৪, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫,
২৩।	তান্তি	...	১	...	*২৫

[* চিহ্নিত পদগুলি পূর্ণতঃ বা আংশিকভাবে—মূল পুথির কয়েকটি পৃষ্ঠা নষ্ট হওয়ায়—তিব্বতী অনুবাদ হইতে অনুমিত।]

উল্লিখিত নামগুলির অনেক ক্ষেত্রেই পাঠভেদ আছে, কাহারও বা একাধিক নাম আছে। চর্যাপদগুলিতেও একাধিক নামেরই উল্লেখ আছে। গুণ্ডরীর পাঠভেদ আছে গুড্ডরী, মহিআর পাঠভেদ মহিত্তা বা মহিণ্ডা ; ইত্যাদি। কাহ্নুপাদ আবার—কাহ্ন, কাহ্নিল, ইত্যাদি বিভিন্ন নামে উল্লিখিত আছেন। কাহ্নুর নামেই সর্বাধিক চর্যার সন্ধান পাওয়া যায়। অনেকে একাধিক কাহ্নপাদের কল্পনা করেন। পদকর্তাদের মধ্যে তান্তির নাম চর্যার পুথিতে পাওয়া যায় নাই। এটি নষ্ট চর্যাগুলির অন্যতম। ইহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তিব্বতী অনুবাদ হইতে। তবে এরূপ অন্যচর্যাগুলির পদকর্তাদের (অর্থাৎ সরহ, কাহ্ন, কুক্কুরীপাদের) অন্য চর্যাও আছে। তান্তির কিন্তু এই একটি ভিন্ন অন্য চর্যা নাই। লাড়ী ডোম্বীপাদ বলিয়া আর একজন পদকর্তার উল্লেখ আছে—কিন্তু পদটির উল্লেখ নাই। ১৭ সংখ্যক পদটির

রচয়িতা বীণাপাদ বলিয়া টীকায় উল্লিখিত আছে কিন্তু পদটিতে বীণা শব্দটি যেভাবে আছে তাহা হয়ত ঠিক ভণিতা নয়। অনুরূপ—শবরের নামে উল্লিখিত পদ দুইটি। শবরও ভণিতা বলিয়া মনে হয় না। তবে শবরীপাদের নাম অন্যত্রও পাওয়া যায়। কতকগুলি নামকে কেহ কেহ ছদ্ম নাম বলিয়া মনে করেন—যেমন কাঙ্কন, তাড়ক, ইত্যাদি; অন্য-দিকে তান্তি ডোম্বী ইত্যাদিও ব্যক্তি বিশেষের নাম কি জাতিবাচক শব্দ বোঝা যায় না। কয়েকটি ভণিতায় নামে শ্রদ্ধাবাচক পা (পাদ) যুক্ত থাকায় এবং গৌরবার্থক ভনন্তি থাকায় ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় অনুমান করেন এগুলি তাহাদের ভক্ত শিষ্যের রচনা। অবশ্য এসমস্তই অনুমান মাত্র; খুব জোর করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই।

রচয়িতাদের অনেকেই ৮৪ সিদ্ধাচার্যদের অন্যতম। ইহাদের সম্পর্কে নির্ভুল কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তারানাথের কাহিনী বা অন্যান্য তিব্বতী নেপালী ঐতিহ্য হইতে ইঁহাদের সম্পর্কে কিছু কিছু বর্ণনা সংগ্রহ করা যায় বটে তবে তাহার ঐতিহাসিক বিশুদ্ধি সম্পর্কে কিছু জোর করিয়া বলা চলে না। সিদ্ধাচার্যদের সহিত নামের মিলই যে আবার সর্বক্ষেত্রে পদকর্তা ও সিদ্ধাচার্যদের অভিন্নত্ব প্রমাণ করে—তাহাও নহে। তারানাথের কাহিনীতে একই নামের বিভিন্ন ব্যক্তির উল্লেখ আছে; তারানাথের বর্ণনা আবার সুম্‌পা রচিত পাগ-সাম-জোন্-জাঙ্. গ্রন্থের সহিত মেলে না। কিম্বদন্তীতে প্রাপ্ত তথ্য আবার আরও বিস্ময়-কর। সেখানে কাহারও বা জন্ম আবার ডাকিনীর গর্ভে। সুতরাং কল্পনা বাস্তবের আলো আঁধারি সেই বিস্তীর্ণ বনভূমিতে পথ হারাইবার সম্ভাবনা পদে পদে। আপাততঃ সেখানে পদচারণার বিশেষ প্রয়োজনও

নাই। ইহাদের সম্পর্কে প্রায় নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়—তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হইতেছে।

সর্ববাদী সম্মতভাবে—লুই পদরচয়িতাদের মধ্যে প্রাচীনতম। তাঁহার একটি পদ দিয়া চর্যাগীতিসংগ্রহটির সূচনা—ইহাও হয়ত নিরর্থক নহে। লুই পাদের অন্য তিনখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে;—একখানিতে হয়তো দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সাহায্যও ছিল। সেখানির নাম—'অভি-সময়-বিভঙ্গ'।

কুক্কুরী পা আগে ব্রাহ্মণ ছিলেন পরে বৌদ্ধ হন। ইঁহার নামেও অনেক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। ইঁহার দুইটি পদ নারীর উক্তি; ইহা দেখিয়া ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় ইঁহাকে (অথবা পদ দুটির রচয়িতাকে) নারী বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। এ অনুমানের পশ্চাতে বিশেষ কোন যুক্তি নাই। অন্তত কুক্কুরীপাদ নারী ছিলেন বলিয়া প্রমাণ নাই।

বজ্রযানী বৌদ্ধ সাধনার ক্ষেত্রে শান্তিদেব বিখ্যাত ব্যক্তি। কিন্তু ঐ শান্তিদেব ও পদকর্তা শান্তি একই ব্যক্তি নহেন। তিব্বতী ঐতিহ্য মতে শান্তির অপর নাম ভুসুকু, তিনিই আবার রাউতু। পদকর্তা শান্তির সহিত ভুসুকু রাউতুর যোগাযোগ থাকিতে পারে, এমন কি তাঁহারা অভিন্নও হইতে পারেন; তবে পূর্বোক্ত বিখ্যাত শান্তিদেব ও ভুসুকুর মধ্যে কোন যোগাযোগ নাই। রাউতু শব্দটি ভুসুকুর বিশেষণবাচক—রাজপুত্র বা রাজসেবী অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

শবর নামে যে পদকর্তার সন্ধান পাওয়া যায় তিনি এবং সিদ্ধাচার্য শবর বা শবরীপাদ একব্যক্তি না হইবার সম্ভাবনাই বেশী। শবর নামাঙ্কিত পদ দুটিতেই শবর শব্দ ভণিতা কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। তবে

সিদ্ধাচার্য শবরীপাদ শবর জাতীয় ছিলেন আর শবর নামাঙ্কিত পদদুটিতে শবর জীবনের বর্ণনা আছে—ইহা কোন ইঙ্গিত বহন করে কিনা বলা যায় না।

পদকর্তা দারিক ছিলেন লুই-এর শিষ্য; তাহার পরিচয় আছে তাঁহার নিজের পদটিতেই। বিরুআর নামাঙ্কিত পদটি সম্ভবত তাঁহার কোন শিষ্যের রচনা। তারানাথের মতে বিরুআ আবার কৃষ্ণপাদের নামান্তর। গুড্ডরী, চাটিল জয়নন্দী ও তাড়ক—এই চারিটি নাম তিব্বতী ঐতিহ্যে নাই। গুণ্ডরী সম্ভবত বৃত্তি বাচক (গুণ্ডরিক = গুড়াকারী); চাটিল শব্দ চট্টগ্রামবাসী অর্থেও হইতে পারে। চাটিল-ও ধাম একই ব্যক্তি হওয়া সম্ভব। তাড়ক সম্ভবত ছদ্মনাম বা উপাধি। জয়নন্দীর কোন পরিচয় জানা যায় নাই। পদকর্তা কামলী ও সিদ্ধাচার্য্য কম্বলাম্বর-পাদ বোধহয় একই ব্যক্তি। কঙ্কন ছিলেন কামলির বংশধর। ডোম্বী ছিলেন ত্রিপুরার রাজা (শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে মগধের রাজা)। ইনি বিরুআর শিষ্য। বীণাপাদ ডোম্বীর সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুমিত। বীণাপাদ বিরুআর বংশধর। মহিআ কাহ্নের শিষ্য। তিব্বতী ঐতিহ্য মতে আজদেব তিনখানি গ্রন্থের রচয়িতা। ইহার একখানি হয়তো চর্যাগীতির টীকা (চর্যামেলায়ন প্রদীপ)। ঢেণ্টন তিব্বতী উচ্চারণে হন ধেতন। ধেতনকে তিব্বতী ঐতিহ্যে কাহ্নের বংশধর বলা হইয়াছে; অবশ্য কোন প্রমাণ নাই। ভাদে ছিলেন জনৈক আচার্য। ইঁহার নামান্তর ভাণ্ডারিন্ বা ভদ্র দত্ত, বা ভদ্রচন্দ্র জাতীয় কিছু হওয়া সম্ভব।

সরহের পরিচয় সম্পর্কে কিছু কিছু ভাল তথ্য পাওয়া যায়। ইহার দোহাও পাওয়া যায়। সরহের জীবৎকাল সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ তথ্য পাওয়া যায় ইহার দোহাগুলির অনুলিপির তারিখ হইতে (দ্রঃ রচনাকাল

অধ্যায়)। পদকর্তা শবরের নামান্তর ছিল সরহ। কিন্তু সেই সরহ এবং এই আচার্য এবং চর্যা ও দোহাকার সরহ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। তারানাথ দুইজন সরহের উল্লেখ করিয়াছেন।

কাহ্নের পদসংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী—কিন্তু তাঁহার সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট তথ্য নাই। একাধিক কাহ্ন যে ছিলেন সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। তারানাথ দুইজন কৃষ্ণাচার্যের (কাহ্নের) উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষা বিষয়-বস্তু ইত্যাদি বিচার করিয়া দুইজন কাহ্নের অনুমান সমর্থন যোগ্য বলিয়াই মনে হয়। একজন কৃষ্ণাচার্য (কাহ্ন) গোবিন্দ পাল দেবের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন। হেবজ্রতন্ত্র নামক গ্রন্থের যোগরত্ন-মালা নামক টীকায় তাহার উল্লেখ আছে। (দ্রঃ রচনাকাল অধ্যায়)

যাহা হউক, এই ধরণের খণ্ড বিচ্ছিন্ন তথ্য হইতে—ধারাবাহিক কোন কাহিনী গঠন করা সম্ভব নয়। এই সমস্ত বর্ণনা হইতে ইঁহাদের রচিত কিছু কিছু অন্যান্য গ্রন্থাদির সন্ধান পাওয়া যায়—অথবা কে কাঁহার বংশধর বা শিষ্য তাহার কিছু পরিচয় মেলে—এই মাত্র।

২ ॥ চর্যাগীতির রচনা কাল ॥

একথা আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে চর্যাগীতিগুলি বাঙলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। কিন্তু প্রাচীনতম নিদর্শন ইহা প্রমানিত হওয়া সত্ত্বেও ঠিক কোন সময়ে যে চর্যাগীতিগুলি রচিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা যায় নাই। চর্যাগীতির যে পুথি আবিষ্কৃত হইযাছে তাহা মূল চর্যাগীতির নহে। মুনিদত্ত কর্তৃক চর্যাগীতিগুলির যে বৃত্তি রচিত হইয়াছিল তাহার কোন অনুলিপির পুথিই আবিষ্কার করিয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। সুতরাং সেই পুথির লিপি ইত্যাদি দেখিয়া চর্যা গীতির রচনা কাল সম্পর্কে অনুমানই করা চলে কোন স্থির নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে না। অবশ্য এই ভাবে অনুমান করিয়া বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন দিক দিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা মোটামুটি এক—এবং অনুমান হইলেও তাহা কবি কল্পনা নহে—বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক অনুমান।

চর্যাপদগুলি বাঙলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। অপভ্রংশের খোলস ছাড়াইয়া যখন ভারতীয় ভাষাগুলি আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল সেই সময়কার বয়সের হিসাব ধরিয়া চর্যাপদগুলিকে নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেকার রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহার মতে চর্যাপদগুলি ভাষার দিকে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের অন্তত দেড়শত বৎসর পূর্বেকার রচনা। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন চতুর্দশ শতকের শেষ পাদের রচনা

('belongs to the last quarter of the 14th Century.')। অর্থাৎ চর্যাপদগুলির রচনা ১২২৫ হইতে ১২৫০ এর পূর্বেই। বস্তুতঃ তাঁহার গবেষণাই প্রমাণ করিয়াছে যে চর্যাপদগুলির ভাষা প্রাচীনতম বাঙলা,—অপভ্রংশও নহে, হিন্দী উড়িয়াও নহে। সুতরাং বাঙলা ভাষার প্রাচীনতমস্তরের ব্যাপ্তি ধরিয়া ইহাদের রচনা কাল ঐ সময়ের মধ্যেই ধরিতে হয়। অবশ্য একটি কথা এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে চর্যাগীতিগুলি ঠিক একই সময়ে অর্থাৎ সমসাময়িক কয়েকজন কবিদ্বারা রচিত নহে। তাঁহাদের একজন হইতে অন্যজনের সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ ব্যবধান ছিল। কিন্তু অতি উদার কল্পনায়ও সেই ব্যবধানকে দীর্ঘকাল স্থায়ী বলা চলে না, কারণ খুব বেশী দীর্ঘ ব্যবধান থাকিলে একটি পদ হইতে অন্য পদের ভাষায় রীতিমত পার্থক্য দেখা দিত; বিশেষ করিয়া ভাষার সেই গঠন যুগে পরিবর্তন ছিল অতিদ্রুত—সুতরাং এক কবি হইতে অন্য কবির ব্যবধান খুব দীর্ঘ নহে। গীতিগুলির রচনা যুগের বিস্তৃতি যদি দুই শত বৎসরও ধরা যায় তাহা হইলেও ইহাদের রচনার শেষ সীমা দ্বাদশ শতাব্দীর এদিকে আসেনা।

প্রাপ্ত পুথিখানির দিক দিয়া বিচার করিলেও ভাষা সম্পর্কিত পূর্বোক্ত অনুমানই সমর্থিত হয়। নেপাল দরবার হইতে প্রাপ্ত পুথিখানি অবশ্য খুব পুরাতন নহে। কিন্তু এখানি অনুলিপি মাত্র। মুনিদত্ত কর্তৃক বৃত্তিগুলির রচনা কাল আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দী। সুতরাং মূল গীতিগুলি যে তাহার পূর্ববর্তী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখানে প্রমান হিসাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তিব্বতী অনুবাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ৮ম হইতে ১৩শ শতকের মধ্যে তিব্বতীরা ভারতের বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থাদি অনুবাদ করিত। মুনি দত্তের

বৃত্তির অনুবাদ কবে হইয়াছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই—তবে তাহা যে চতুর্দশ শতকের মধ্যে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং অনুমান করা চলে মূল গীতিগুলির রচনা কাল তাহার পূর্বেই।

ভাষা এবং লিপির দিক ছাড়াও এই গীতিগুলির রচনা কাল সম্পর্কে আরও অনেক বাহ্য আভ্যন্তর প্রমাণ আছে। চর্যাগীতিগুলির বিষয় বস্তু সহজিয়া বৌদ্ধ সাধন-পদ্ধতি সম্পর্কিত। বাঙলা দেশের এই সহজিয়া বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায় চর্যাপদগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই রচিত। পালযুগ পর্যন্তই বৌদ্ধ ধর্ম বাঙলা দেশে রাজানুকূল্য লাভ করিয়াছিল এবং এই যুগের মধ্যেই তাহা তান্ত্রিকতার স্পর্শে পরিবর্তিতও হইয়া গিয়াছিল। সেন বর্মন যুগে বৌদ্ধ ধর্ম রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হয় এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় নানা ভাবে নিগৃহীতও হয়। চর্যাপদে ধর্মবিষয়ক যে তথ্য ও সমাজ চিত্র পাওয়া যায় তাহাও নির্ভুলভাবে পালপর্বের পতন ও সেন বর্মন পর্বের অভ্যুদয় ও রাজত্বকালের দিকে ইঙ্গিত করে। সুতরাং এই বিষয়বস্তু ও সমাজ চিত্রের আভ্যন্তর যুক্তি হইতেও চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই প্রমাণিত হয়।

আলোচ্য পদগুলির রচনাকাল সম্পর্কে আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায় ইহাদের রচয়িতাদের জন্মকাল বিচার করিয়া। অবশ্য এ প্রমাণটিও খুব সুনিশ্চিত নহে—কারণ পদকর্ত্তাদের সম্পর্কেও কোন সুনির্দিষ্ট উক্তি কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। তাঁহাদের পরিচয় সূত্রে নানা প্রসঙ্গে যাহা অবগত হওয়া যায় তাহা অনেক সময়ই পরস্পর বিরোধী। সুতরাং এই সমস্ত উক্তির মধ্য দিয়া আমরা কেবল মাত্র সেই অংশটুকুই গ্রহণ করিব যে টুকু সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে।

সিদ্ধাচার্য লুইপাদকে সাধারণতঃ চর্যার পদকর্তাদের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া ধরা হয়। এ অনুমানের নানা সমর্থন আছে। লুই পাদের সশ্রদ্ধ উল্লেখ কয়েকটি চর্যার মধ্যে আছে। লুই পাদের পদটি লইয়াই চর্যাগীতিকোষের সূচনা। সে যাহাই হউক, তিব্বতী ঐতিহ্য অনুসারে লুই পাদ 'অভি-সময়-বিভঙ্গ' নামে একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং এই গ্রন্থ রচনায় সহায়তা করিয়াছিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০৩৮ (১০৪২ ?) খৃঃ অঃ তিব্বতে গমন করেন। লুইপাদ দীপঙ্করের বর্ষীয়ান সমসাময়িক। সুতরাং লুইপাদের জীবৎ কাল একাদশ শতকের প্রথমার্ধই ধরিতে হয়। হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের এই অনুমান এতদিন পর্যন্ত নিঃসন্দেহেই গৃহীত হইয়া আসিতেছিল এবং ডাঃ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ডাঃ সুকুমার সেন ও ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী যে নূতন তথ্য সমাবেশ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় লুইপাদের সময় আরও পূর্ব-বর্তী। ডাঃ বাগচী মহাশয় কর্তৃক Journal of the Department of Letters Vol XXVIII ১৯৩৫এ প্রকাশিত নেপাল দরবারের পুথির বিবরণ হইতে জানা যায় যে ২২১ নেপাল সংবৎ অর্থাৎ ১১০১ খৃঃ অঃ শ্রীদিবাকর চন্দ সরহের দোহাগুলি বিনষ্ট প্রনষ্ট হইতে দেখিয়া একটি পুথিতে তাহা সংকলিত করেন। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় সেই সংগ্রহ গ্রন্থের পুষ্পিকাটিও উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

"সমত্তো জহালদ্ধা দোহাকোসো এসো সংগহিত্ত···পণ্ডিত-সিরি দিবাকর চন্দেণেত্তি। সম্বৎ ২২১ শ্রাবণ শুক্লপূর্ণমাস্যাং।···"

সুতরাং নিঃসন্দেহে দেখা যাইতেছে যে সরহের দোহা কোষ ১১০১ (২২১ নেপাল সংবৎ) এ অনুলিখিত। পদগুলি অনুলিখিত হইয়াছিল বিনষ্ট প্রনষ্ট (বিণট্‌ঠা-পণট্‌ঠা-পউ') হইতেছিল বলিয়া। নষ্ট হইতে অন্তত ৫০ বৎসর কাল লাগে ধরিলেও—সরহের মূল দোহাগুলি লিখিত হইয়াছিল একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। সরহের জীবৎ কাল ঐ সময়ে। তাহা হইলে লুই ও সরহ সমসাময়িক হইয়া যান। কিন্তু নানা কারণে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে লুই সরহ অপেক্ষা প্রাচীনতর। সরহের সময় সম্পর্কিত সদ্যোক্ত তথ্যটি নির্ভুল বলিয়াই মনে হয়। তাহা হইলে লুই পাদকে ধরিতে হয় দশম শতাব্দীর শেষ পাদে, অন্তত একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের পরে কিছুতেই নহে।

তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান লুইপাদের 'অভি-সময়-বিভঙ্গে' সাহায্য করিয়াছিলেন—ইহা কিরূপে সম্ভব ? ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় এখানে অনুমান করেন যে—শ্রীজ্ঞান লুইপাদকে গ্রন্থ রচনায় প্রত্যক্ষ সাহায্য করিয়াছিলেন—এ কিংবদন্তী সত্য নাও হইতে পারে। হয়তো লুই পূর্বেই 'অভিসময়' নামে মূল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীজ্ঞান পরে 'বিভঙ্গ' নামে তাহার পরিশিষ্ট বা বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র। এই অনুমান সত্য হইলে সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে লুই দশম শতাব্দীর লোক এবং সরহ তাঁহার কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালের—অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক। আর এই অনুমান যদি মিথ্যা হয় অর্থাৎ লুই এবং শ্রীজ্ঞান সম্পর্কিত তিব্বতী কিংবদন্তী যদি সত্যই হয় তবে—সিদ্ধান্ত এই হয় যে—লুই সরহের বর্ষীয়ান এবং প্রবীনতর সমসাময়িক। মোটের উপর একথা ঠিক যে লুই অথবা সরহ কাহারও জীবৎকালের সীমা একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের এ দিকে নহে।

ভুসুকু সম্পর্কে অনুরূপ একটি তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁহার 'চতুরাভরণ' নামক গ্রন্থের পুথি হইতে। পুথিখানি নকল করা হয় ৪১৫ নেপাল সংবৎএ অর্থাৎ ১২৯৫ খৃঃ অঃ। সুতরাং ভুসুকুর জীবৎকালের শেষতম সীমা ধরিতে হয় ১২৯৫ খৃঃ অঃ।

পদকর্তা কাহ্ন সম্পর্কে অনুরূপ আর একটি তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য তথ্যটি কতদূর নির্ভরযোগ্য তাহা বিচার্য। পদকর্তা কাহ্নই বা কতজন ছিলেন তাহাও নিঃসন্দেহে জানা যায় না। সে বিচার আলোচ্য প্রসঙ্গে অবান্তর। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'বাঙ্গালার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে গোবিন্দ পাল দেবের রাজত্বকালে রচিত বা অনুলিখিত পুথিগুলির বিবরণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

"শ্রীহেবজ্র পঞ্জিকা যোগরত্নমালা সমাপ্তা। কৃতিরিয়ং পণ্ডিতাচার্য্য শ্রীকাহ্নপাদানামিতি। পরমেশ্বরেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ। শ্রীমদ্ গোবিন্দ পাল দেবানাম্ সং ৩৯ ভাদ্রদিনে ১৪ লিখিতমিদং পুস্তকং কা শ্রী গয়াকরেণ।" [Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library of Cambridge ; দ্রঃ বাঙ্গালার ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ পৃঃ ৩৬২]

অর্থাৎ কায়স্থ শ্রী গয়াকর গোবিন্দপাল দেবের ৩৯ রজ্যাঙ্কে ১৪ই ভাদ্রদিনে পণ্ডিতাচার্য শ্রীকাহ্নপাদ বিরচিত 'হেবজ্রতন্ত্রের' 'যোগরত্ন-মালা' নামক টীকা পুথিখানির অনুলিপি করেন। গোবিন্দপালদেব দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে রাজত্ব করিতেন। কাহ্নপাদের গ্রন্থের টীকা ঐ সময়ে লিখিত হইলে তিনিও ঐ সময়ের অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী কালের

লোক। এই কাহ্নপাদ এবং চর্যাগীতি রচয়িতা কোন একজন কাহ্নপাদ একই ব্যক্তি হইলে তাঁহার কাল সম্পর্কে একটি তথ্য পাওয়া গেল।

কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি—এই তথ্যটি সন্দেহমুক্ত নহে। সন্দেহের প্রথম কারণ: উল্লিখিত পুষ্পিকাটি যোগরত্নমালার সমস্ত পুথিতে পাওয়া যায় না। রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও কোনও পুথি দেখিয়া ঐ পুষ্পিকাটির উল্লেখ করেন নাই, করিয়াছিলেন Bendall's Catalogue দেখিয়া। দ্বিতীয়তঃ, গোবিন্দ পাল দেবের রাজ্যাঙ্ক ৩৮ সং-এই তিনি বিনষ্ট-রাজ্য হইয়াছেন। অনুরূপ একটি পুষ্পিকায় আছে— "শ্রীমদ্ গোবিন্দ পালদেবানাম্ বিনষ্ট রাজ্যে অষ্টত্রিংশৎ সম্বৎসরে" ইত্যাদি। ৩৮ সংবৎসরে বিনষ্ট-রাজ্য হইয়া ৩৯ এ রাজ্যাঙ্কের উল্লেখ একটু বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। তৃতীয়তঃ, চর্যার একটি পদ হইতে কাহ্ন 'পণ্ডিতাচার্য' বলিয়া অনুমিত। ঐ পদটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও প্রচুর মতভেদ আছে:

শাখি করিব জালন্ধারি পাএ।
পাখি ণ রাহঅ মোরি পাণ্ডিআচাএ॥ (৩৬)

ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা অনুসারে কাহ্নপাদ এখানে নিজেকেই 'পণ্ডিতাচার্য' বলিতেছেন এবং পূর্বোক্ত যোগরত্নমালা টীকার পণ্ডিতাচার্য কাহ্নপাদের সহিত তিনি অভিন্ন। কিন্তু কাহ্নপাদ এই পদটিতে নিজেকেই পণ্ডিতাচার্য বলিতেছেন এই ব্যাখ্যা গ্রহণে মতদ্বৈধ আছে। অবশ্য এই পদটির দ্বারা পদকর্তা জনৈক কাহ্নপাদ এবং পূর্বোক্ত হেবজ্রতন্ত্রের পণ্ডিতাচার্য কাহ্নপাদ এক ব্যক্তি প্রমাণিত না হইলেও তাহাদের একত্বে অন্য কোন বাধা নাই। তাঁহারা দুইজন কোন সূত্রে এক হইলে—কাহ্নপাদের সময় সম্পর্কে পূর্বোক্ত তথ্যটি সন্দেহাতীত না হইলেও উল্লেখ করা চলে।

শৈব সিদ্ধ ও বৌদ্ধ সিদ্ধাদের যোগাযোগ এবং ইহাদের অনেকের একত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সারাভারতে প্রচলিত নানা কিংবদন্তী আছে। এই সমস্ত কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া গুরু পারম্পর্য বিচার করিয়াও ইহাদের রচনা কাল সম্পর্কে কিছু তথ্য দাঁড় করান যায়। কিন্তু যে হেতু তাহার পশ্চাতে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণের সুনির্দিষ্ট সমর্থন নাই— সেজন্য তাহা হইতে বিরত থাকাই ভাল।

চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল সম্পর্কে আর একটি বাহ্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া আলোচ্য প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। চর্যাগীতিগুলি সুরতাল সংযোগে গীত হইত। রাগরাগিনীর উল্লেখ গীতিগুলিতেই আছে। সুতরাং সমসাময়িক যুগের সঙ্গীত গ্রন্থে চর্যাগীতির উল্লেখ সন্ধান করা উচিত। প্রাচীন বাঙলার দুইখানি সঙ্গীত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। লোচনের 'রাগতরঙ্গিণী' এবং শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকর'। সঙ্গীত-রত্নাকারের রচনাকাল ১২১০-৪৭ খৃঃ অঃ, রাগতরঙ্গিণী আরও প্রাচীন। রাগতরঙ্গিণীতে চর্যাগীতির উল্লেখ নাই। সঙ্গীতরত্নাকরে ইহার বিস্তৃত উল্লেখ আছে। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীতরত্নাকরে 'প্রবন্ধ' অধ্যায়ে চর্যার বর্ণনা করিয়াছেন :

পদ্ধড়ী প্রভৃতিচ্ছন্দাঃ পাদান্ত প্রাস শোভিতাঃ
অধ্যাত্ম গোচরা চর্য্যা স্যাদ্ দ্বিতীয়াদি তালতঃ ॥ ইত্যাদি।

[শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র প্রণীত 'বাঙলার সঙ্গীত' ১ম খণ্ড পৃ ৪৫ দ্রঃ]

এই চর্য্যায়ে আমাদের আলোচ্য চর্যাগীতি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের চর্যাগীতিগুলিও পদ্ধড়ী অর্থাৎ পজ্ঝটিকা ছন্দে, পাদান্ত্যানুপ্রাস যুক্ত চরণে গঠিত এবং অধ্যাত্মগোচরা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিষয়ক। সুতরাং ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে লিখিত গ্রন্থে

চর্যাপদের যখন বিস্তৃত উল্লেখ আছে তখন—ইহা খুবই স্বাভাবিক যে চর্যাগীতিগুলি তাহার বহুপূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল—এবং বেশ পরিচিতই ছিল। এ গুলি এতদূর পরিচিত ও জনপ্রিয় ছিল যে সঙ্গীত শাস্ত্রে একটি বিশেষ রীতি হিসাবেই চর্যাগীতির স্থান হইয়া গিয়াছে। যাহাহউক এই প্রমাণ হইতেও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা চলে যে—চর্যাগীতিগুলি দ্বাদশ শতকের মধ্যেই রচিত ও প্রচারিত।

পূর্বোক্ত আলোচনার বিভিন্ন সূত্র হইতে, সুতরাং, আমরা চর্যাগীতি গুলির রচনার নির্দিষ্ট সন তারিখ কিছু উল্লেখ করিতে না পারিলেও, এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে ঐ গীতিগুলি দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই রচিত হইয়াছিল।
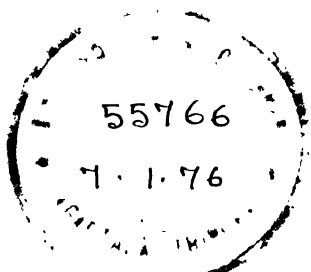
৩ ॥ চর্যাগীতির ভাষা ॥

চর্যাগীতিগুলির আলোচনার দুইটি দিক—একটি ইহার ধর্মীয় দার্শনিক দিক অন্যটি ইহার ভাষাতাত্ত্বিক দিক। বস্তুত ভাষার দিকে ইহার মূল্য অপরিসীম। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চর্যাগীতিগুলি আবিষ্কার করিবার পূর্বে আমরা একটি খণ্ডিত বাঙালা সাহিত্যের কথাই অবগত ছিলাম এবং ইহার পূর্বেও যে ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ছিল তাহা জানা সত্ত্বেও নিদর্শনের অভাবে ধারাটি অনুসরণ করিতে পারিতাম না। শাস্ত্রী মহাশয় সাধারণ ভাবেই 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়', কাহ্নপাদ ও সরোজবজ্রের দোহাকোষ এবং ডাকার্ণব সবগুলিকেই বাঙলা ভাষার নিদর্শন বলিয়া চালাইয়া দিয়াছিলেন। পরে অবশ্য বিশেষজ্ঞের বিচারে প্রমাণিত হইয়াছে যে কেবল মাত্র চর্যাগীতির ভাষাই বাঙলা—বাকীগুলির অপভ্রংশ। এ বিচার নানাদিকে বিশেষ মূল্যবান ;—একদিকে ইহা চর্যাপদের উপর অন্য ভাষার দাবীকে নিরস্ত করিয়াছে, অন্যদিকে ইহা বাঙলা ভাষার প্রাচীনতম রূপটির নির্ভুল সন্ধান দিয়া বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস গঠনে উপাদান যোগাইয়াছে। অবশ্য এখনও অনেক বাঙ্গালী মনীষী আছেন ও যাঁহারা মনে করেন চর্যাপদের ভাষা 'বাঙলা গন্ধি অপভ্রংশ'। এমন কি তাঁহারা 'অপভ্রংশ চর্যাপদ' বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। [দ্রঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বৈষ্ণব পদাবলীর চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা। এই সম্পাদকদের কেহ কেহ আবার অন্যত্র

চর্যাপদের ভাষাকে বাঙলা বলিয়া নিশ্চিত প্রমাণ করিয়াছেন। তবে কি 'অপভ্রংশ চর্যাপদ'—ধরণের উক্তি অসতর্ক বলিয়া গ্রহণ করিব? এ অসতর্কতা মারাত্মক।]

ভাষাতত্ত্ব বিশারদ ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম বিশেষ বিচারে চর্যাপদের ভাষাকে প্রাচীনতম বাঙলা ভাষা বলিয়া প্রমাণ করেন। কিন্তু যেহেতু ইহা প্রাচীনতম বাঙলা সেইজন্যই ইহাতে এমন কিছু কিছু রূপ আছে যাহা অপভ্রংশ বা অপভ্রংশগন্ধি—সে অপভ্রংশ—মাগধী, কখনও বা অর্ধমাগধী বা শৌরসেনী। ইহার কারণ হিসাবে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন যে চর্যাগীতির মধ্যেই সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে মাগধী অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত বাঙলার প্রথম ব্যবহার। বাঙলা ভাষার ব্যবহার তখন সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং রূপগুলি কি হইবে সে বিষয়ে পদকর্তারা নিশ্চিত নন। তাই তাঁহারা ভাষাদর্শের জন্য সাহিত্যিক ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত নিকটতম প্রতিবেশী শৌরসেনী অপভ্রংশের দিকে তাকাইয়াছেন। শৌরসেনী অপভ্রংশ তখন সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অভিজাত মহলে প্রচলিত ভাষা। পদকর্তারা সেই ভাষা জানিতেন। তাহা ছাড়া লিপিকরেরা তো প্রাচীন বাঙলা অপেক্ষা শৌরসেনী অপভ্রংশই বেশী জানিতেন। সুতরাং লিপিকর প্রমাদেও স্থান বিশেষে কিছু কিছু শৌর-সেনী থাকা অসম্ভব নয়। ইহা ছাড়াও, ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন, চর্যাগীতির বিষয়বস্তু ঠিক আধুনিক কালের ভৌগলিক সীমায় বদ্ধ বাঙলার নহে। আর তখনকার দিনে বাঙালা দেশ বলিতে—বর্ত্তমানের বাঙলাকে বুঝাইত না—তখনকার বাঙলার সীমা ছিল আরও বিস্তৃত। সুতরাং তখনকার দিনের লিখিত সাহিত্যে

আধুনিক বাঙলার সীমানার বাহিরের অন্যান্য প্রদেশের দুই চারিটি শব্দের প্রাচীন রূপ দেখিলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু এই সামান্য দুই চারিটি সন্দেহ জনক শব্দনিদর্শনের উপর নির্ভর করিয়া চর্যাগীতিগুলিকে বাঙলা ভিন্ন অন্য ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া দাবী করিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেহ কেহ ইহাকে প্রাচীন ওড়িয়া বলিয়া মনে করেন, [দ্রঃ History of Bengali Language by B. C. Majumdar Lecture XIII] আবার কেহ কেহ ইহাকে প্রাচীন বিহারী বলিয়া মনে করেন। [হিন্দি পত্রিকা 'গঙ্গাতে' শ্রীরাহুল সংকৃত্যায়নের প্রবন্ধ অনুসরণ করিয়া শ্রীযুক্ত জয়সোয়াল অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্স, সপ্তম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে অনুরূপ মত প্রকাশ করেন।] কিন্তু বর্তমানে ইঁহাদের সকল দাবীই নিরস্ত হইয়াছে।

চর্যাগীতিগুলির ভাষা যে প্রাচীনতম বাঙলা তাহার প্রমাণ হিসাবে নিম্নলিখিত নির্ভুল যুক্তিগুলির উল্লেখ করা চলে :

(ক) শব্দরূপে বাঙলা ভাষার বিশিষ্ট বিভক্তি—যথা তৃতীয়াতে তেঁ (তে) [সুখ দুখেতেঁ নিচিতমরি আই—১]; চতুর্থীতে—রে (রঁ) [সো করউ রস রসানে-রে কংখা-২২]; ষষ্ঠীতে এর (র) [করণক পাটের আস-১, হরিণা হরিণীর নিলয় না জানী-৬]; সপ্তমীতে—ত, এ ইত্যাদি—[সাঙ্কমত চড়িলে—৫, দুহিল দুধ কি বেণ্টে ষামায়-৩৩]

(খ) মাঝেঁ, অন্তরে, দিআঁ সাঙ্গে—ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার—কোড়ি মাঝেঁ একু—২ ; তোহার অন্তরে

—১০ ; চারিবাসে গড়িলরে দিঅাঁ চঞ্চালী—৫০ ; তুজ্জন সাঙ্গে অবসরি জাই—৩২।

(গ) ধাতুরূপের বিশিষ্ট বিভক্তি ঃ

ভবিষ্যৎকালে 'ইব'—জই তুম্‌হে লোঅ হে হোইব পারগামী—৫

কাহ্নু কহি গই করিব নিবাস—৭

অতীতকালে 'ইল'—কানেট চৌরি নিল অধরাতি—২

সসুরা নিদ গেল—২

অসমাপিকায় ইআ, ইলে—মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালী—১১

সাঙ্কমত চড়িলে—৫

(ঘ) থাকা অর্থে (Substantive) আছ্‌ এবং থাক্ ধাতু ঃ

জইসনে অছিলেস তইসন অচ্ছ (যেমন ছিলে তেমনি থাক)—৩৭

গুরুবঅণ বিহারেঁ রে থাকিব তই ঘুণ্ড কইসে—৩৯

(ঙ) বিভিন্ন বাগ্‌ বিধির ব্যবহার ঃ

যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার—কহন ন জাই—২০, পারকরেই —১৪, আহার কএলা—৩৫, নিদ গেলা—২ ; ইত্যাদি।

প্রবচন জাতীয় শব্দ সমষ্টি ঃ—অপণা মাংসে হরিণা বৈরী—৬

হাথেরে কাঙ্কাণ মা লেউ দাপণ—৩২

বরসুণ গোহালী কিমো তুঠ বলন্দেঁ—৩৯

হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী—৩৩ ;

চর্যাপদের ভাষার বাঙলা-ত্বের এই নির্ভুল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও শৌরসেনী অপভ্রংশের যে দুই চারিটি উদাহরণ গোল বাঁধাইয়াছিল তাহাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। কতকগুলি নিষ্ঠান্ত অতীতকালের (Past participle) এর রূপ যেমন—কিউ, বিআপিউ, গউ, অহারিউ বিকসিউ, থাকিউ, বহিউ, (অর্থাৎ ক্ত প্রত্যায়ন্ত কিঅ, বিআপিঅ, গঅ ইত্যাদি রূপ না হইয়া—ইউ, বা উ প্রত্যায়ান্ত রূপ হওয়া) ; সর্বনামে—জো, সো, জইস, তইস, জসু, তসু, (অর্থাৎ প্রাচীন বাঙলার যে, কে, যা (হ), তা (হ) ইত্যাদি) ; সর্বনামীয় ক্রিয়া বিশেষণ জিম, তিম, এবং সর্বনামীয বিশেষণ—জৈসন, তৈসন, জৈসো, ইত্যাদি। খুব কম ব্যবহৃত হইলেও এগুলিই ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে শৌরসেনী অপভ্রংশের উদাহরণ। অবশ্য পরবর্তীকালে এগুলির জাতি-স্বরূপ লইযা মতভেদ দেখা দিযাছে। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে জৈসনেঁ, তৈসনে আছে—সুতরাং এই দুটিকে এই তালিকা হইতে বাদ দিতে হয়। অন্যান্য উদাহরণগুলিকে খাঁটি শৌরসেনী অপভ্রংশ না বলিযা ইহার বিকৃতি—অবহট্‌ঠের রূপ বলিতে হয়। ইহা ছাড়া মৈথিলেরও দুই একটি উদাহরণ আছে—যেমন ভণথি, বোলথি ; ইহা যদি ভণন্তি, বোলন্তি হইতে আগত না হয় তবে নিতান্তই লিপিকর প্রমাদ, কারণ চর্যাপদগুলির অনুলিপি হইয়াছিল নেপালে, সেখানে মৈথিল ভাষার ব্যবহার ও চর্চা ছিল। সুতরাং এইরূপ দুই একটি মিশ্রন খুবই স্বাভাবিক।

যাহা হউক প্রাচীন বাঙলার ভৌগলিক সীমা, বিভিন্ন অপভ্রংশের পরস্পর সাদৃশ্য, শৌরসেনীর আভিজাত্য ও প্রচার বাহুল্য, নেপালে গীতিগুলির অনুলিখন—ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে চর্যাপদের

ভাষায় অন্যান্য অপভ্রংশের কিছুকিছু প্রভাব স্বীকার করিলেও—এই ভাষা যে বাংলা নয়—এ সিদ্ধান্ত স্বীকার করা চলে না। অথবা এ সিদ্ধান্তও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না যে চর্যার ভাষা ব্রজবুলির ন্যায় কোন মিশ্রিত কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা, (দ্রঃ হাজার বছরের পুরাণো বাংলা ও বাঙ্গালী' : ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত : বিশ্বভারতী : ১৩৫৪।) কারণ সামান্য কিছু অন্য অপভ্রংশের প্রভাব বা মিশ্রণ থাকিলেও এ ভাষায় এমন কিছু নাই যাহা বাংলা ব্যাকরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলেনা। সামান্য শৌরসেনী থাকার জন্য যদি এই ভাষাকে কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা বলিতে হয় তবে প্রচুর দেশী বিদেশী শব্দ মিশ্রিত আধুনিক বাংলা ভাষাকেও কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা বলিতে হয়!

চর্যাগীতির ভাষার ব্যাকরণগত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য :

(ক) ধ্বনিবিষয়ক :

(i) প্রাকৃতের সমীভূত যুক্ত ব্যঞ্জন সরল হইয়াছে এবং পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হইয়াছে। পূর্বস্বরের দীর্ঘত্ব অবশ্য মাঝে মাঝে লেখায় দেখান হয় নাই। যেমন মঝেঁ = মাঝেঁ < মঝ্ঝেন < মধ্যেন। এগুলি অবশ্য লিপিকর প্রমাদ হওয়াও বিচিত্র নহে। যুক্ত ব্যঞ্জনে প্রথমটি নাসিক্য থাকিলে পূর্বস্বর সানুনাসিক হইয়াছে। এখানেও লেখায় মাঝে মাঝে নাসিক্য ধ্বনি বজায় আছে,- মন্তে, তন্তে, তান্তী ইত্যাদি।

(ii) পদান্তের স্বরধ্বনি উচ্চারিত হইত, তবে অনেক সময় -ইঅ (-ইআ) এই যুক্তস্বর ই (ঈ)-তে পরিণত হইয়াছে। ভণতি > ভণই, জ্বলিত > জলিঅ ; আবার পুস্তিকা > পোত্থিআ > পোথী ;

বুঝিঅ>বুঝি ; ভবিত>ভইঅ>ভই। পদান্ত ই-কার স্থলে অনেক স্থলেই লিপিতে 'অ' বা 'য়' লেখা হইত, যেমন খাই=খাঅ, খায় ; জাই=জাঅ, জায় ইত্যাদি।

(iii) য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় যেমন নিকটে>নিয়ড়ি (=নিঅড়ি); আয়াতি>আবই (=আআই) ইত্যাদি।

(iv) উচ্চারণে হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর, তিন স-কার, দুই ন-কার এবং জ-কার এবং য-কারের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না—যেমন এখনও নাই। লিপিতে একটির স্থানে অন্যটির ব্যবহারে ইহা অনুমান করা চলে।

(খ) রূপগত :

(i) চর্যাগীতিতে ক্লীবলিঙ্গ নাই তবে স্ত্রী ও পুংলিঙ্গের ব্যবহার বিষয়ে আধুনিক ভাষা অপেক্ষা কড়াকড়ি অনেক বেশী। কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে অতীতকালের ক্রিয়া প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ হইত,—লাগেলি আগি। সম্বন্ধপদ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইত এবং প্রয়োজনমত স্ত্রীলিঙ্গ হইত,—কাহেরি শঙ্কা, হাড়েরি মালী। স্ত্রীলিঙ্গের সাধারণ বিশেষণ তো স্ত্রীলিঙ্গ হইতই যেমন : নিশি অন্ধারী ইত্যাদি। শব্দরূপের ক্ষেত্রে একমাত্র ষষ্ঠী বিভক্তি ছাড়া স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিলনা।

(ii) দ্বিবচনের ব্যবহার নাই ; একবচন ও বহুবচনে শব্দরূপে কোন পার্থক্য নাই। বহুত্ব বুঝাইবার জন্য সকল, সব, জন ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হইত : সকল সমাহিঅ, বিদুজন লোঅ, ইত্যাদি।

(iii) বিভিন্ন কারকের জন্য বিভিন্ন কারক-বিভক্তি ব্যবহৃত

হইত। যেমন—তৃতীয়ায় এন>এঁ অথবা অন্ত>ত এর সহিত যুক্ত এঁ=তেঁ, তে, এতে ইত্যাদি; কৃত শব্দ জাত 'ক' এবং ইহার সহিত 'এ' যোগ করিয়া ২য়া—৪র্থীর বিভক্তি গঠিত হইত; কখনও রেঁ, রে, কখনওবা শুধু এ, কখনওবা বিনা বিভক্তিতেই ২য়া-৪র্থীর পদগঠিত হইত। ৫মীতে অনেক সময় ৭মীর বিভক্তি ব্যবহৃত হইত—জামে কাম কি কামে জাম; ৬ষ্ঠীতে কার্য্য, কর শব্দ হইতে উদ্ভূত এর, অর, র বিভক্তি ব্যবহৃত হইত; সপ্তমীতে—ই<এ; -এ<অকে, হি<*ধি, ত<অন্ত—এই বিভক্তিগুলির ব্যবহার ছিল। সপ্তমীর বিভক্তি তৃতীয়ার সহিত একাকার হইয়া সানুনাসিক রূপ লইত (এঁ, তেঁ ইত্যাদি)। সপ্তমীর বিভক্তিগুলির ব্যবহার সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ছিল—কর্তৃব্যতিরিক্ত অন্যান্য বিভিন্ন কারকেও ইহার ব্যবহার ছিল।

(iv) সর্বনামের রূপেও সাধারণতঃ বিশেষ্যের বিভক্তিগুলি ব্যবহৃত হইত। আহ্মে এবং তুহ্মে বহুবচন জাত হওয়া সত্ত্বেও এক-বচনেও ব্যবহৃত হইত। মো (মম শব্দ জাত) এবং মই ও তই (*ময়েন এবং *ত্বয়েন অর্থাৎ ময়া এবং ত্বয়া শব্দ জাত)—কর্তৃ-কারকেও ব্যবহৃত হইত।

(v) বিভিন্ন কারক বিভক্তি ছাড়াও বিনা, অন্তরে, মাঝ, দিযা (দিআ) ইত্যাদি অনুসর্গেরও ব্যবহার ছিল।

(vi) পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ারূপের পার্থক্য বজায় ছিল। বর্তমানকালের জন্য উত্তমপুরুষে মি এবং অহম্ জাত হুঁ যোগ করা হইত; মধ্যম পুরুষে সি অথবা অনুজ্ঞায় -হ, -হু, -তু ইত্যাদি ব্যবহার করা হইত। প্রথম পুরুষে ক্রিয়া বিভক্তি ছিল -ই<-তি এবং গৌরবে বহুবচন হইলে -ন্তি<-অন্তি।

ভবিষ্যৎকালে উত্তম পুরুষে তব্য জাত -ইব, মধ্যমপুরুষে -স্যসি জাত -হসি (মারিহসি, হোহিসি) এবং প্রথম পুরুষে -স্যতি জাত -হই > -হ যুক্ত হইত।

শুধু 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত করিয়া অথবা ইহার সহিত -ইল যোগ করিয়াও অতীতকালের রূপ গঠিত হইত।

(vii) অসমাপিকার ব্যবহার ছিল তিন প্রকার—ই এবং ইঅ, ইআ-যুক্ত—করি, পুচ্ছি, চড়ি, লইআ, ধরিঅ, মারিআ ইত্যাদি ; ইলে-যুক্ত—চড়িলে, ভইলে, বুঝিলে ; এবং অন্তে-যুক্ত—পড়ন্তে, চাহন্তে ইত্যাদি।

(গ) বাক্যরূপ :

বাক্যের গঠন ও বাগ্‌বিধিগুলির ব্যবহারে আধুনিক বাঙলার ধারা চর্যাপদের রূপ হইতে আগত তাহা সহজেই অনুমান করা চলে। অবশ্য প্রাচীন কর্ম-ভাববাচ্যের প্রয়োগ ইত্যাদি কয়েকটি ক্ষেত্রে এই ধারা বজায় থাকে নাই, তবুও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পূর্বোক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য। অবশ্য চর্যাগুলি কবিতা সুতরাং তাহা হইতে বাক্য-রীতিটি স্পষ্টভাবে ধরা যায় না। কিন্তু যেটুকু অনুমান করা যায় তাহাতেই দেখা যায় বাক্য গঠন ভঙ্গিটি বাঙলারই। যেমন-হরিণা হরিণীর নিলয় ন জানী = হরিণ হরিণীর নিলয় না জানে (জানে না) ; ইত্যাদি।

ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চর্যাপদগুলির ভাষা বিচার প্রসঙ্গে—ভাষাতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া চর্যাগীতির ভাষাকে পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। এ অনুমান কতখানি যুক্তিসহ তাহা বিচার্য। প্রথমতঃ ভাষার দিকে পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের যতখানি পার্থক্য

আধুনিক কালে দেখা যায়—বাঙলা ভাষার সেই 'আঁতুড়অবস্থায়' ততখানি পার্থক্য ছিল না। সুতরাং পূর্ববঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার উপর চর্যাপদ প্রতিষ্ঠিত এ ধরণের অনুমান বোধহয় খুব প্রয়োজনীয় নহে। দ্বিতীয়তঃ প্রমাণ হিসাবে যে যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে —তাহাও বিশেষ জোরালো নহে। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন— 'গৌণ কর্ম্ম-সম্প্রদানের বিভক্তি হিসাবে 'রে' ব্যবহৃত না হইয়া 'কে' (বা ক) ব্যবহৃত হইযাছে। রে মাত্র দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে।' কিন্তু 'ক' কতবার ব্যবহৃত হইয়াছে?—সমস্ত পাঠগুলিকে নির্ভুল ধরিলেও তিনবার মাত্র! এই দুই অথবা তিনবার মাত্র—ইহাও আবার বিশেষ্য সম্পর্কে। সর্বনামের ক্ষেত্রে গৌন কর্ম্ম সম্প্রদানে বিভক্তি ক অথবা কে একবারও ব্যবহৃত না হইয়া সর্বত্রই 'রে' ব্যবহৃত হইযাছে। বিষযটি নিশ্চয়ই লক্ষ্যনীয। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ দিকটির উল্লেখ করেন নাই। যাহাই হউক তাঁহার যুক্তি অনুসরণ করিয়াই যদি রায় দিতে হয—তবে 'কে' অপেক্ষা 'রে'-এর পক্ষেই জোর বেশী। ইহা ছাড়া আধুনিককালে পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত বাক্যরীতির উল্লেখ চর্যাগীতিতে আছে—যেমন—ধরণ ণ জাই = ধরন যায়না।

চর্যাগীতিতে দুই স্থানে 'বাঙ্গাল'-দের সম্পর্কে কিছু উল্লেখ আছে (পদসংখ্যা ৩৯'৪৯)। আপাত দৃষ্টিতে উক্তিগুলি শ্রদ্ধেয নহে। সুতরাং মনে হয 'অবাঙ্গাল' অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গীয় কবিদ্বারা এগুলি রচিত। অবশ্য এই দুটি পদ পশ্চিমবঙ্গীয কোন কবি দ্বারা রচিত হওয়া অসম্ভব নহে। তবে এ যুক্তিটিও সন্দেহাতীত নহে। পদকর্তা সরহ ও ভুসুকু। তাঁহাদের বাড়ী কোথায় জানা যায় না। একটী 'বঙ্গালে'র পাঠান্তর 'দঙ্গালে' (৪৯।২) অন্যটি সম্পর্কে বলা যায় উক্তিটি ঠিক অশ্রদ্ধার নাও হইতে পারে। অন্যত্র

'বঙ্গাল'রাগ হিসাবে উল্লিখিত আছে (৪৩)। তাহা ছাড়া আপাত অর্থের অন্তরালে উদ্দিষ্ট অর্থ অন্য প্রকার হওয়াই চর্যাগীতির পক্ষে স্বাভাবিক। আর বিষয়-বস্তু বিচার করিয়া ভাষার স্বরূপ নির্ণয়ও খুব সমীচীন নহে। সেদিক দিয়া পূর্ববঙ্গের দাবীও খুবকম নহে। 'পউআ খালের' বিশেষ উল্লেখ, তাহাছাড়া খাল বিখাল নদীমাতৃকতা, আসাম সীমান্তের হাতী-ধরার বিষয়---ইত্যাদি পূর্ববঙ্গীয় জীবন যাত্রার নির্ভুল ইঙ্গিত। (দ্রঃ চর্যাগীতির সমাজ পরিবেশ—অধ্যায়)। ইহাছাড়া কয়েকজন পদ-কর্তাও নিশ্চিতভাবে পূর্ববঙ্গীয় বলিয়া জানা গিয়াছে। সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গে কম ছিলনা সুতরাং পদগুলি পূর্ববঙ্গের উপভাষার উপর গঠিত হইয়াছিল—এ সিদ্ধান্তেই বা বাধা কোথায় ?

চর্যাগীতিগুলির ভাষা সম্পর্কে আরও একটি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। পদকর্তারা এই ভাষাকে 'সন্ধ্যাভাষা' বলিয়াছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই সন্ধ্যাভাষার অর্থ করিয়াছেন আলো আঁধারি : "সন্ধ্যাভাষার মানে আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো কতক অন্ধকার ; খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না অর্থাৎ এই সকল উচু অঙ্গের ধর্ম কথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়।' (পৃঃ ৮, মুখবন্ধ, বৌদ্ধ গান ও দোহা)। তান্ত্রিক ধর্ম বিষয়ক সমস্ত পুস্তকের ভাষাই এরূপ অস্পষ্ট—কারণ ইহাদের ধর্মমত কেবল মাত্র দীক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য, সাধারণের জন্য নহে। সাধারণ হইতে গোপন করিবার জন্যই ভাষার এই অস্পষ্টতা, আপাত অর্থের অন্তরালে অন্য অর্থ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'সন্ধ্যার' অর্থ আলো আঁধারি অর্থাৎ দিবা

ও রাত্রির সন্ধিস্থল বলিয়া মনে করিলেও আসলে কিন্তু তাহা নহে। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন সন্ধ্যা অর্থে—(অভিপ্রায়িক বচন, নেযার্থ বচন)—অভীষ্ট অর্থ। অর্থাৎ ইহার অভীষ্ট অর্থ শুধু মর্মজ্ঞের নিকটই প্রকাশ্য অন্যের নিকট নহে। সম্—√ধা+ঙ এরূপভাবে ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়া তিনি অভিপ্রেত বা অভীষ্ট অর্থ বুঝাইতে—সন্ধ্যার পরিবর্তে 'সন্ধা' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। লক্ষ্য করিবার বিষয় তান্ত্রিক পুথিগুলিতে সর্বত্র সন্ধ্যা (সন্ধা নহে) বানানই ব্যবহৃত হইয়াছে।[১] অভীষ্ট শব্দটির মধ্যেও 'আপাত লক্ষ্য নহে' এরূপ একটি ইঙ্গিত আছে—তাহা হইতেই অস্পষ্টতার ভাবটি আসিয়াছে এবং তাহার প্রভাবে অর্থ-সাদৃশ্যে বানানটিও সন্ধা হইতে সন্ধ্যাতে পরিণত হইয়াছে—ইহাও অসম্ভব নহে। তাহা ছাড়া সন্ধ্যা শব্দের অর্থ তো শুধু দিবারাত্রির সন্ধিই নহে। 'সম্যক্ ধ্যায়তে অস্যাম—ইতি সন্ধ্যা।'—ইহা হইতে অনুধ্যান—অর্থাৎ যে অর্থ অনুধ্যান করিয়া বুঝিতে হয় তাহাই সন্ধ্যা অর্থ,—এরূপ হওয়াও বিচিত্র নহে।

(যাহা হউক, সন্ধ্যাই হউক বা সন্ধাই হউক, চর্যাগীতির ভাষার এই অস্পষ্ট হেঁয়ালি ভাব—শুধু এগুলিরই বৈশিষ্ট্য নহে। মধ্যযুগীয় সাধকদের সকলের কবিতাতেই ভাষার এই হেঁয়ালি ভাব। কবীর, দাদু, বাঙলার সহজিয়া বৈষ্ণব, বাউল, নাথপন্থী প্রভৃতি সকলের সঙ্গীতের ভাষাই কম বেশী একই প্রকার—উপমা উৎপ্রেক্ষাও এক—হেঁয়ালিপনাও এক।)

---

১ শব্দটি সন্ধ্যা না হইয়া হইবে সন্ধা—বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের এ মন্তব্য **Indian Historical Quarterly 1928**-এ দ্রষ্টব্য। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ও **Studies in the Tantras** গ্রন্থে এই মত সমর্থন করিয়াছেন এবং তান্ত্রিক পুথিগুলির 'সন্ধ্যা' শব্দটি লিপিকর প্রমাদ বলিয়া মত দিয়াছেন। (দ্র. Studies in the Tantras : Dr. Bagchi : P 27)

৪ ॥ আঙ্গিক : গঠনরীতি, ছন্দ, সুর ॥

'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়' প্রকাশ করিবার সময় শাস্ত্রী মহাশয় মুখবন্ধে বলিয়াছিলেন—পুথিখানির নাম 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' আর গানের নাম 'চর্য্যাপদ'। পরে কেহ কেহ সমগ্র গীতিটি বুঝাইতে 'চর্যাপদ' বা পদ শব্দটি ব্যবহারে আপত্তি জানাইয়াছেন। তাহাদের মতে 'পদ' বলিতে দুইটি চরণ বা 'Couplet'-কে বুঝায়। পুরাপুরি কবিতাকে বুঝায় না। চর্যা-টীকাকারও পদ বলিতে সমগ্র কবিতাটিকে না বুঝাইয়া দুইটি চরণকেই বুঝাইয়াছেন। এ বিষয়ে প্রথমে ইঙ্গিত করেন ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। চর্যাগীতির ছন্দ আলোচনা সম্পর্কে তিনি প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়াছিলেন—"Couplets in the vernacular or Apabhransa were known as<pada>in old Bengali, as we can see from the Sanskrit commentary to the Caryas." (O. D. B. L. p 288) পরে ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ও বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—চর্যাগুলি পদাকারে গঠিত গীতি।

সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের দিক দিয়া কথাটি ঠিক বটে—কিন্তু নাট্য ও সঙ্গীত শাস্ত্রের দিক দিয়া পদশব্দের অর্থ অন্যপ্রকার। নাট্যশাস্ত্রে পদবর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

গান্ধর্বং যন্ময়া প্রোক্তং স্বরতাল পদাত্মকম্।
পদং তস্য ভবেদ্বস্তু স্বর তালানুভাবকম্॥

যৎকিঞ্চিৎ অক্ষর কৃতম্ তৎ সর্বং পদসজ্ঞিতম্।
নিবদ্ধানিবদ্ধঞ্চ তৎপদং দ্বিবিধং স্মৃতম্॥ (৩২ অধ্যায়)

অর্থাৎ অক্ষরকৃত গানের বস্তুকেই পদ বলিত। ইহা ছাড়া সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পদের একটি বিশেষ অর্থ আছে। 'প্রবন্ধ-সঙ্গীতের' (সঙ্গীতের একটি শ্রেণী) উপাদান স্বরূপ ৬টি অঙ্গের মধ্যে পদ অন্যতম। সেখানে পদ শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সঙ্গীত রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ বলিয়াছেন 'অর্থপ্রকাশকং পদং'। ইহা হইতেই বুঝাযায় গানের 'বস্তু'ই পদ শব্দে উদ্দিষ্ট। আধুনিক সঙ্গীতের ভাষায় যাহাকে বলা যায় গানের 'বাণী', তাহাই পদ। নাট্য ও সঙ্গীত শাস্ত্রে পূর্ণাঙ্গ গীতিটি বুঝাইতে পদ শব্দ ব্যবহারের বিশেষ সার্থকতা আছে। সাধারণ কাব্যশাস্ত্রেও পদ বলিতে পূর্বে Couplet বুঝাইলেও পরে খণ্ড কবিতা অর্থাৎ অনিবদ্ধ বা মুক্তক কবিতাকেই বুঝাইত। ইহার প্রমাণ শুধু সাধারণ লোকেদের মুখেই নহে—বহু সুধীজনের লিখিত উক্তির মধ্যেও আছে। সুতরাং সে সকল বিচার করিয়া—পদ বলিতে পূর্ণাঙ্গ গীতিটি বুঝাইতে আমাদের আপত্তি নাই।

চর্যাগীতিকে পদাবলী অর্থাৎ Couplet সমষ্টি বলিলে ইহার গঠন রীতি সম্পর্কে আলোচনার বিশেষ কিছু থাকে না। কিন্তু চর্যাগীতি-গুলি তখনকার দিনে সঙ্গীত জগতেও যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া-ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত 'সঙ্গীত রত্নাকরে' একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর সঙ্গীত হিসাবে ইহার বিশিষ্ট উল্লেখ আছে—এবং সেখানে ইহার গঠন পদ্ধতি সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা আছে। পরবর্তী কালে সঙ্গীত রত্নাকরের টীকাকারেরাও চর্যা সম্পর্কে আলোচনা বাদ দেন নাই। এমনকি সপ্তদশ শতাব্দীতে

দক্ষিণভারতে রচিত বেঙ্কটমখির চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকাতেও চর্যাগীতির আলোচনা দেখিয়া মনে হয়—চর্যা পরবর্তীকালে একটি বিশিষ্ট সঙ্গীত-রীতি হিসাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল এবং তাহা হয়ত বঙ্গদেশ ছাড়িয়া অন্যত্রও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অবশ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য চর্যাপদগুলি চর্যাগীতরীতির উদাহরণ হিসাবে রচিত হয় নাই। অধ্যাত্ম সঙ্গীত হিসাবেই প্রথমে এগুলি রচিত হয় এবং পরে ইহার জনপ্রিয়তা দেখিয়া সঙ্গীত শাস্ত্ররচয়িতারা ইহার জন্য একটি বিশিষ্ট শ্রেণী নির্দেশ করিয়া ইহার গঠন পদ্ধতিও বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন।

সঙ্গীত শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া চর্যাগীতির গঠন পদ্ধতি সম্পর্কিত কিছুটা আলোচনা—এখানে অবান্তর নয়। আজকালকার সঙ্গীতে যেমন অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ, এই চারিটি কলি আছে' প্রাচীনকালে তেমনি ছিল—উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ। এই চারিটি ধাতু (কলি) যুক্ত সঙ্গীতকে বলিত প্রবন্ধ গীত। অবশ্য সমস্ত সঙ্গীতে যে এই চারিটি ধাতু থাকিত তাহা নহে। কদাচিৎ মেলাপক ও আভোগ কদাচিৎ শুধু মেলাপক বর্জিত হইত। ধাতুর সংখ্যা অনুসারে তখন নাম হইত—ত্রিধাতুক বা দ্বিধাতুক প্রবন্ধ। শাস্ত্র অনুসারে চর্যাগীতিগুলি ছিল মেলাপক বর্জিত ত্রিধাতুক প্রবন্ধ গীত।

প্রবন্ধগীতে আবার স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাটক এবং তাল এই ষড়ঙ্গ থাকিত। স্বর বলিতে স-র-গ-ম বোঝায়। বিরুদ অর্থ স্তুতিবাচক্। পদ গানের বস্তু। তেনক মঙ্গলবাচক। পাটক বোঝায় সঙ্গত যন্ত্রের বোল ইত্যাদিকে। সব প্রবন্ধ সঙ্গীতেই এই ষড়ঙ্গ থাকিত না। চর্যা-গীতিতে ছিল মাত্র দুইটি অঙ্গ, পদ ও তাল। তাই ইহার বিশেষ নাম 'তারাবলী'।

চর্যার দেহ গঠন সম্পর্কেও শার্ঙ্গদেব আলোচনা করিয়াছেন। পাদান্ত মিল যুক্ত, পদ্ধড়ি ছন্দে রচিত—গীতিগুলিই চর্যা। ইহার ছন্দ রীতিতে যথেষ্ট শৈথিল্য ছিল বলিয়া শার্ঙ্গদেব পূর্ণ ও অপূর্ণ এই দুই-ভাগে ইহাকে ভাগ করিয়াছেন। ছন্দোশৈথিল্য না থাকিলে পূর্ণ, অন্যথায় অপূর্ণ।

পূর্বোক্ত আলোচনার সাহায্যে চর্যাগীতিগুলির গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি যে এগুলি বিশিষ্ট একটি ছন্দের ভিত্তিতে অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত চরণে রচিত—মেলাপক বর্জিত ত্রিধাতুক—তারাবলী জাতীয় প্রবন্ধ সঙ্গীত।[১]

চর্যাগীতিগুলির ছন্দের মধ্যে স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও একথা বলা চলে যে এগুলি একটি বিশেষ ছন্দেই রচিত। পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি সেই ছন্দকে পদ্ধড়ি ছন্দ বলা হইয়াছে। অবশ্য অন্য ছন্দেরও যে ব্যবহার হইত তাহারও প্রমাণ আছে ঐ উক্তিটির মধ্যে—"পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দাঃ"। এই পদ্ধড়ী ছন্দই সংস্কৃত পজ্ঝটিকা ছন্দ। এই ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্য হইতেছে—ষোড়শ মাত্রার চরণ, ও চারি মাত্রার একটি পাদ। ইহা এক হিসাবে পাদাকুলক ছন্দেরও বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃত পৈঙ্গলে পাদাকুলকের লক্ষণ বলিতে—হ্রস্ব দীর্ঘ সম্বন্ধে নিয়মহীন ষোলো মাত্রার ছন্দকে বোঝান হইয়াছে। [লহু গুরু এক্ক ণিম্ম ণহি জেহা।...সোরহমত্তা পাআকুলঅং।] চর্যা-গীতির ছন্দকেও সেই হিসাবে পাদাকুলকই বলা উচিত—কারণ ইহার ছন্দে মাত্রাগণনা পদ্ধতিতে লঘুগুরু ভেদ নাই বলিলেই চলে। চর্যা-গীতির অধিকাংশই এই ছন্দে রচিত। ষোলো মাত্রার চরণকে চারি

১ দ্রঃ বাঙলার সঙ্গীত, ১ম খণ্ড : শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র।

মাত্রার চারিটি চালে (পাদে) বিভক্ত করিয়া, দ্বিতীয় পাদের পর যতি এবং শেষপাদের পর পূর্ণ যতি ব্যবহার করা হয়ঃ

কায়া—তরুবর— / পঞ্চবি—ডাল
চঞ্চল—চীএ— / পইঠো—কাল।
অথবা সসুরা—নিদগেল / বহুড়ী—জাগঅ।
কানেঠ—চোরে নিল / কা গই—মাগঅ। ইত্যাদি।

স্বভাবতই মাত্রাগণনা পদ্ধতিতে এখানে সুনির্ধারিত কোন রীতি নাই। অবশ্য তাহাতে বিশেষ ক্ষতি ছিল না—কারণ এগুলি ছিল গান। গানে সুরের টানে কমকে বেশী করিয়া লওয়া বিশেষ অসুবিধা জনক নহে। জয়দেবের গীত গোবিন্দও মূলতঃ এই ছন্দে ও চালে গঠিত—

মুহুরব—লোকিত— / মণ্ডন—লীলা।
মধুরিপু—রহমিতি— / ভাবন—শীলা।

লক্ষ্যণীয়, উভয় ক্ষেত্রেই যতি পাতন (৮ মাত্রার পর) ঠিক পয়ারেরই মত।

গীতগোবিন্দ এবং চর্যাপদ এই উভয়ের ছন্দই অপভ্রংশ হইতে আগত। এই ছন্দ ঠিক পয়ার নয় ;—ইহা হইতেই আধুনিক বাঙলার পয়ার এবং পাঞ্জাব-বিহার গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের চউপাই ছন্দ আগত। যদিও মাত্রা গণনা পদ্ধতিতে বিশেষ নিয়ম নাই—তবুও চর্যাগীতির এই ছন্দ মাত্রাবৃত্তরীতিতেই গঠিত। মাত্রা গণনা পদ্ধতির এই শৈথিল্যের সহিত আবার, অনেকে মনে করেন, লৌকিক কোন ১৫ মাত্রার ছন্দের প্রভাবও যুক্ত হইয়াছিল—এবং ১৫ মাত্রার সেই লৌকিক ছন্দের যতি পাতন ছিল ৮ এবং ৭ মাত্রার পর। অন্যদিকে আবার বেশির ভাগ চর্যাগীতির চরণের শেষ পাদটি দুই 'অক্ষরে' গঠিত হইত। ফলে ষোলো

মাত্রার হইলেও চর্যাগীতিগুলির বেশীব ভাগ চরণই ছিল ১৪ অক্ষরে গঠিত। এই সমস্ত কিছু অর্থাৎ প্রাচীন বাঙলার মাত্রাগণনা পদ্ধতিতে শৈথিল্য, প্রতি চরণে আট মাত্রার পর প্রথম যতি পাত, চরণগুলির চৌদ্দ অক্ষরে গঠন—ইত্যাদি মিলিয়া মাত্রাবৃত্ত জাতীয় অপভ্রংশ ছন্দ ক্রমে অক্ষরবৃত্ত জাতীয় পয়ারে বিবর্তিত হইয়া গেল। চর্যাগীতির এই ছন্দ তাই অপভ্রংশ এবং পয়ারের মাঝামাঝি পাদাকুলক ভিত্তিক একটি ছন্দ। ইহারই বিবর্তন পথে পয়ারের উদ্ভব।)

চর্যাপদগুলিতে 'পয়ারের পূর্বপুরুষ' জাতীয় ছন্দ ছাড়াও আরও দুই এক প্রকার ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পাদাকুলকের পরই ২৪ অথবা ২৬ মাত্রার ত্রিপদীর ব্যবহারই বেশী—

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী
হিএঁ কুবাড়ী। (৮+৮+৮)

অথবা সুনা পান্তর উহ ণ দীসই
ভান্তি ণ বাসসি জান্তে (৮+৮+১০)

এই ছন্দের উৎপত্তি দোহা ছন্দ হইতে। এই জাতীয় ছন্দের নানারূপ আছে। ইহার কোন কোনটিতে আবার ২৮ মাত্রাও আছে। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় ২৮ মাত্রার চরণের পাদবিন্যাস করিয়াছেন—৮+৮+৮ +৪ এবং এগুলিকে বলিয়াছেন মরহাট্টা ছন্দ। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়

কিন্তো মন্তে। কিন্তো তন্তে। কিন্তোরে ঝাণব। খাণে।

চর্যাপদের ছন্দোশৈথিল্য প্রাচীনকাল হইতেই লক্ষিত হইয়া ছিল। শার্ঙ্গদেবও তাই 'সঙ্গীত-রত্নাকরে' ছন্দের উপর ভিত্তি করিয়া চর্যাগীতি-গুলিকে পূর্ণ এবং অপূর্ণ এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। শিথিল-

ছন্দ গীতিগুলি অপূর্ণ। পূর্বেই বলিয়াছি ছন্দের এই অপূর্ণতা গানের ক্ষেত্রে অমার্জনীয় নহে। ইহা ছাড়াও আধুনিককালে যে ভাবে চর্যা-গীতগুলি আমাদের হাতে আসিয়াছে তাহাতেও ছন্দোশৈথিল্যের কারণ আছে। লিপিকর যিনি ছিলেন তাহার কতদূর ছন্দো-জ্ঞান ছিল বলা যায় না। না থাকিলেও ক্ষতি ছিল না। আবার অনুলিপি সমাধা হইয়াছিল নেপালে—বাঙলায় নহে। সুতরাং ছন্দো বিভ্রাট স্বাভাবিক।

পূর্বেই আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি চর্যাপদগুলি গীতি এবং বিশিষ্ট রীতির গীতির গঠন পদ্ধতিতেই ইহার দেহ গঠিত। এগুলি যে গীতের উদ্দেশ্য রচিত তাহার প্রকৃষ্ট প্রমান প্রতিটি গীতির পূর্বে রাগ রাগিনীর উল্লেখ। শাস্ত্রী মহাশয় ভূমিকায় এগুলিকে কীর্তন বলিয়া আখ্যা দিযাছিলেন। এগুলি ঠীক কি ভাবে গাওয়া হইত তাহা নির্ণয় করা যায় না। সুতরাং এগুলি ঠিক ঠিক কীর্তন কিনা তাহা শুধু মাত্র রাগ রাগিণীর সাদৃশ্য দেখিয়া বলা যায় না। তবে একথা নিশ্চিত সত্য যে বিশিষ্ট রীতির দিকে যত পার্থক্য থাকুক না কেন, অন্যদিক বাদ দিয়াও, শুধুমাত্র গায়েন রীতির দিকে পরবর্তী কালের কীর্তন বাউল ইত্যাদির সহিত ইহার ক্ষীণধারার যোগ থাকাই স্বাভাবিক।

চর্যাগীতিতে যে সমস্ত রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে তাহাদের মোট সংখ্যা—১৬; পটমঞ্জরী, গবড়া বা গউড়া, অরু, গুর্জরী, গুঞ্জরী বা কাহ্নগুর্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, কামোদ, ধনসী বা ধানশ্রী, রামক্রী, বলাড্ডী বা বরাড়ী, শাবরী, মল্লারী, মালসী, মালসী-গবুড়া, বঙ্গাল, ভৈরবী। ইহাদের মধ্যে পটমঞ্জরী রাগটিই সর্বাপেক্ষা বেশী জনপ্রিয় ছিল—ইহাতে পদ আছে ১২টি। অন্যান্য রাগগুলিতে গীত সংখ্যা এক হইতে কখনও বা চারি পাঁচ পর্য্যন্ত আছে। রাগগুলি বেশীর ভাগই

হিন্দুস্থানী মার্গ সঙ্গীতের ; কেবল মাত্র গবড়া, অরু, মালসী-গবুড়া কাহ্ন গুর্জরী ইত্যাদি ছাড়া। কতকগুলি রাগ আছে যেগুলি হিন্দুস্থানী মার্গসঙ্গীতের স্বল্প সংখ্যক রাগ রাগিণীর মধ্যে না পড়িলেও—সঙ্গীত শাস্ত্রে অহাদের উল্লেখ আছে। অপ্রচলিত বা নূতন যে রাগ রাগিণী-গুলির উল্লেখ আছে তাহাদের উৎপত্তি সম্পর্কে কেহ কেহ কিছু কিছু জল্পনা করিয়াছেন—কিন্তু কেহই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। পারা সম্ভবও নহে—কারণ রাগের নাম হিসাবে যে শব্দটির উল্লেখ আছে তাহা অভ্রান্ত কিনা কে জানে ? যেমন গবুড়া বা গউড়া। সম্ভবত 'গৌড়ী' নামক কোন রাগই এখানে উদ্দিষ্ট। লোচন পণ্ডিতের রাগ তরঙ্গিণীতে এক 'গৌরী' রাগের উল্লেখ আছে। এই গৌরী ও গৌড়ী কি এক ? অরু নামক কোন রাগের উল্লেখ কোন সঙ্গীত শাস্ত্রে নাই।

চর্যাগীতিগুলি যে কি ভাবে গাওয়া হইত তাহাও নিশ্চিত করিয়া জানিবার উপায় নাই। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র 'বাঙলার সঙ্গীত' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে সঙ্গীতরত্নাকরে চর্যার গায়েন রীতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা আছে। বস্তুত সে আলোচনা হইতে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। শার্ঙ্গদেব চর্যাগীতির তাল সম্পর্কে লিখিতেছেন—'দ্বিতীয়াদি-তালতঃ'। টীকাকার কল্লিনাথ দ্বিতীয় তাল বলিতে বলিয়াছেন—'দৌ লো দ্বিতীয়কঃ'। মিত্র মহাশয় ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—"দগণ বলতে দুই মাত্রা, এবং লগণ বলতে একটী লঘুবর্ণ অর্থাৎ এক মাত্রা বোঝায়। এই চতুর্মাত্রিক তালটিতে পরপর গুরুবর্ণ এবং লঘু বর্ণের সমাবেশ ছিল এটি উক্ত লক্ষণে বলে দেওয়া হয়েছে।" (দ্রঃ বাঙলার সঙ্গীত প্রথম খণ্ড—শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র)। —এ ব্যাখ্যা কি করিয়া সম্ভব

জানি না। তাঁহার নিজের হিসাব মতই দুই মাত্রা ও এক মাত্রা মিলিয়া তিন মাত্রাই হয়—অথচ তিনি লিখিতেছেন চতুর্মাত্রিক। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন—"এগুলি (চর্যাগীতিগুলি) প্রায় সমসাময়িক লোচন পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিনী বা কিছু পরবর্ত্তী কালের শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত রত্নাকরের (১২১০-৪৭) পদ্ধতি অনুযায়ী গাওয়া হইত কিনা বলা কঠিন"। (দ্রঃ বাঙ্গালীর ইতিহাস।) এ সন্দেহ সমীচীন। তবে চর্যাগীতির গায়েন পদ্ধতির একটি নির্ভুল ইঙ্গিত গানগুলির মধ্যেই আছে। সেটি ধ্রুব পদ সম্পর্কিত। আধুনিক গীত পদ্ধতিতে 'স্থায়ী' যেমন, চর্যাগীতির ধ্রুবপদ তেমনি। প্রত্যেকটি পদ গাহিবার পর ধ্রুবপদ গাওয়া হইত এবং এই ধ্রুব পদটি সম্ভবত সম্মেলক গাওয়া হইত। কোন কোন গীতে ধ্রুবপদটি সম্মেলক গাওয়া হইত—কোনকোনটিতে সমস্ত পদটিই সম্মেলক গাওয়া হইত। এই অনুসারে শার্ঙ্গদেব চর্যাগীতির দুইটি শ্রেণী নির্দেশ করিয়াছেন—যেখানে সমস্ত গীতিটি সম্মেলক গাওয়া হইত তাহাকে বলিত সমধ্রুবা আর যখন কেবল মাত্র ধ্রুব অংশ সম্মেলক গাওয়া হইত—তখন তাহাকে বলিত বিষমধ্রুবা।*

---

* এই অধ্যায়ের সঙ্গীত সম্পর্কিত তথ্যগুলির বেশীর ভাগই শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্রের 'বাঙলার সঙ্গীত' গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

৫ ॥ চর্যাপদের ধর্মমত ॥

॥ এক ॥

সাধারণ স্বরূপ ঃ ভূমিকা

বাঙলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন চর্যাপদগুলি—সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হইলেও বিশিষ্ট একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধন-সঙ্গীতও বটে। সুতরাং ধর্মতত্ত্বকে বাদ দিয়া ইহার আলোচনা, ব্যাখ্যা ইত্যাদি সম্ভব নহে। চর্যাপদগুলির ধর্মমত যে কি এবং সেই ধর্মমতের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য যে কি তাহা লইয়া বাঙলা ভাষায় এখনও পর্যন্ত বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। একদল সমালোচক আছেন যাঁহারা চর্যাপদগুলির আলোচনার সময়ে ইহার অন্তর্নিহিত ধর্মমত সম্পর্কিত তর্ক বিতর্ককে আলোচনা হইতে বাদ দিবার পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে চর্যাপদ সাহিত্যের নিদর্শন সুতরাং কেবলমাত্র ইহার সাহিত্যিক দিকই বিচার্য। এমনকি স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ও চর্যাপদের ধর্মের স্বরূপটি যে তান্ত্রিক বা সহজিয়া বৌদ্ধ একথা উল্লেখ করিয়াও মন্তব্য করিয়াছিলেন,—"যাঁহারা সাধন ভজন করেন তাঁহারাই সেই কথা (ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব) বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই। আমরা সাহিত্যের কথা কহিতে আসিয়াছি, সাহিত্যের কথাই কহিব।"[১] ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।[২] কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে বাঙ্গালীর

---

১ বৌদ্ধগান ও দোহা—পৃঃ ৮; মুখবন্ধ।

২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড।

সাহিত্যসাধনা, সঙ্গীতসাধনা, এবং ধর্মসাধনা চিরকাল একত্রেই চলিয়াছে। বাঙ্গালী ধর্মসাধনার জন্য সঙ্গীত রচনা করিয়াছে এবং সঙ্গীত রচনার মধ্য দিয়া সাহিত্যসাধনা করিয়াছে। পরবর্তীকালের মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবপদাবলী ইত্যাদির মধ্য দিয়া ধর্ম, সঙ্গীতও সাহিত্যের যে ত্রিবেনী ধারার ঐতিহ্য চলিয়া আসিয়াছে তাহার সূত্রপাত এই চর্যাপদগুলিতে। সুতরাং চর্যাপদগুলির আলোচনায় তাহাদের অন্তর্নিহিত ধর্মসাধনার আলোচনা অপরিহার্য।

অবশ্য চর্যাপদগুলির ধর্মমতের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনায় কিছু কিছু মতভেদ স্বাভাবিক। শুধুমাত্র ভাষা বিচারে কোন বিশিষ্ট ধর্মের স্বরূপ সহজে ধরা পড়ে না। অদ্বয়, নির্বান, অবিদ্যা ইত্যাদি শব্দ, ভারতীয় ধর্মদর্শনে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যায়। সুতরাং কেবলমাত্র কয়েকটি শব্দের বিচার নয়, মূল বিষয় বস্তুর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বাঙলা ভাষাতে চর্যাপদগুলির ধর্মমত লইয়া সেরূপ পুংখানুপুংখ কোন আলোচনা হয় নাই। শ্রদ্ধেয় মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় তাহার সম্পাদিত 'চর্য্যাপদ' গ্রন্থে—চর্যাপদের ধর্মমতের কোন বিশিষ্ট স্বরূপ নির্ধারণ করিবার চেষ্টা না করিয়া—বিভিন্ন ধর্মদর্শনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি ইহাকে ধর্ম বা সাধন পদ্ধতির দিক দিয়া বিচার না করিয়া—চর্যাপদগুলির মধ্য দিয়া দার্শনিক তত্ত্বই বেশী করিয়া পরিস্ফুট, এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।[১] দুঃখের বিষয় দার্শনিক সেই তত্ত্বকেও তিনি স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য-জাতি ইত্যাদির আলোচনায় সুসংবদ্ধ আকারে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। একমাত্র ডাঃ শশিভূষণ দাশ গুপ্ত মহাশয়ই

১ 'চর্য্যাপদ'—মণীন্দ্রমোহন বসু ; পৃঃ ৩৮/০

তাহার ইংরেজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলিতে, চর্যাপদের ধর্মমতের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। ডা. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী মহাশয়ও তাহার কতকগুলি ইংরেজী প্রবন্ধে অন্য প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে ধারাবাহিক না হইলেও—কিছু কিছু মূল্যবান আলোচনা করিয়াছেন।[২] সুতরাং বাঙলা ভাষাতে চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ আছে। পূর্ব সুরীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হইলাম।

ভারতীয় সাধনায় সমন্বয়ের সুর এবং বিশেষ করিয়া নানা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যকার ঐক্যের কথা[৩] স্মরণ রাখিয়াও একথা আমরা আজ নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে চর্যাপদগুলির ধর্মমত সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম। শব্দ এবং পারিভাষিকগুলি—বৌদ্ধ-ধর্মের—কিন্তু তাহার আবরণে এখানে তন্ত্রের তত্ত্ব ও সাধন প্রণালীই ব্যক্ত হইযাছে। এই তান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণে চর্যার কবি-সাধকদের যে মনোভাব প্রবলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 'সহজিয়া'[৪]। অন্যান্য সহজিয়া ধর্মের সহিত চর্যার ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি ও সাধন প্রণালীর সাদৃশ্যের কারণও এই মনোভাবের সাদৃশ্য। সুতরাং চর্যাপদের ধর্মমত প্রসঙ্গে তাই বলা যায়—বৌদ্ধধর্মের আবরণে এবং তাহার মূল ভিত্তির উপর সহজিয়া মনোভাব প্রসূত তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতিই এখানে বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম পরিবর্তনের বিশিষ্ট একটি

---

১ **Obscure Religious cults এবং Introduction to Tantric Buddhism.**

২ **Studies in the Tantras.**

৩ **বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য; ডাঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচী। পৃঃ ৫৪**

৪ **সহজিয়া সম্পর্কে আলোচনার জন্য পরে দ্রষ্টব্য।**

স্তরে—তান্ত্রিকতার প্রভাবে—তান্ত্রিকবৌদ্ধধর্মে পরিণত হয় এবং তাহারই একটি বিশিষ্ট পর্বের বিশিষ্ট ধর্মসাধনার নিদর্শন বহন করে চর্যাপদগুলি। চর্যাপদের ধর্মমত আলোচনা প্রসঙ্গে সুতরাং বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিকতায় পরিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা খুব অপ্রাসঙ্গিক নহে।

॥ দুই ॥

তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি ও বিবর্তন

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার ধর্ম দর্শনের মূল সূত্রগুলি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যদের মধ্যে রীতিমত মতভেদ দেখা দেয় এবং এই মতভেদ দূর করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকবার ধর্মসংঘও আহ্বান করা হয়। কথিত আছে বৈশালিতে আহূত দ্বিতীয় ধর্মসংঘে ইঁহাদের মতভেদ অত্যন্ত প্রবল হয় এবং প্রতিবাদীরা আর একটি মহাসংঘ আহ্বান করিয়া নিজেদের মহাসাংঘিক আখ্যা দেন। এইভাবে প্রাচীন থেরবাদী সম্প্রদায় এবং পরবর্তী প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ এত প্রবল হইয়া উঠে যে তাঁহারা দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যান এবং প্রাচীনেরা হীনযানী এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রতিবাদীরা মহাযানী নামে অভিহিত হন। মহাযান এই দিক দিয়া বৌদ্ধদর্শনের ক্রমোন্নতির একটি স্তর নির্দেশ করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।[১]

---

১ বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য; পৃঃ ৩। আধুনিক কালে পণ্ডিতেরা অবশ্য মহাযান এবং হীনযান মতের মধ্যে কালগত পার্থক্য স্বীকার করিতে চান না। মহাযানী মতবাদগুলি প্রাচীন পালিশাস্ত্রে ইতস্ততঃ ছড়ানো ছিল। কিন্তু তাহা সুসম্বদ্ধ রূপ পায় কিছু পরবর্তী কালে, সন্দেহ নাই।

হীনযান বা প্রাচীন পন্থী বৌদ্ধধর্ম এবং মহাযান বা আধুনিক পন্থী বৌদ্ধধর্মের [হীনযান ও মহাযান বলিতে অবশ্য আক্ষরিকভাবে—ছোট শকট ও বড় শকট বোঝায়] মধ্যে মূল পার্থক্য তাহাদের ধর্মের লক্ষ্য (আশয়) লইয়া। হীন যানীদের দৃষ্টি ছিল কিছুটা সংকীর্ণ; তাই বুদ্ধ প্রদর্শিত আচার আচরণ পালন করিয়া ধর্মের পথে পুণ্য অর্জনে তাঁহারা তৎপর হইতেন কিন্তু বুদ্ধত্বলাভের দুরাশা তাঁহারা পোষণ করিতেন না। তাঁহাদিগকে বলা হইত 'শ্রাবক যান'। হীনযানীদের মধ্যে অবশ্য একদল ছিলেন যাঁহারা বুদ্ধত্বলাভের উচ্চাশা পোষণ করিতেন বটে তবে তাহা কেবলমাত্র নিজের জন্য। তাঁহাদিগকে বলা হইত 'প্রত্যেক বুদ্ধ যান'। মহাযানীদের আদর্শ ছিল অপেক্ষাকৃত উদার। তাঁহারা শুধু নিজের জন্য বুদ্ধত্বলাভ করিবার চেষ্টাকে তুচ্ছ মনে করিতেন। বুদ্ধদেব যেমন সমস্ত বিশ্বের জন্য জন্ম জন্মান্তরে নিজেকে উৎসর্গিত করিয়াছেন ইঁহারাও সেইরূপ পরোপকারের (কুশলকর্ম—missionary activities) মধ্য দিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়া বোধিসত্ত্বাবস্থালাভ এবং তাহার ভিতর দিয়া বুদ্ধত্বলাভকেই আদর্শ মনে করিতেন। এ বুদ্ধত্ব লাভ আবার শুধু নিজের জন্য নহে—বিশ্বের সকলের জন্য এই বুদ্ধত্বলাভের চেষ্টা। অর্থাৎ হীনযানীদের অর্হত্ত্বের আদর্শের স্থানে মহাযানীরা বুদ্ধত্বের আদর্শ স্থাপন করেন। এই বুদ্ধত্বের আদর্শ স্থাপনের জন্য বোধিসত্ত্বাবস্থার কল্পনাটিও লক্ষণীয়। মহাযানীরা মনে করেন জগতের প্রতিটি জীবের মধ্যে সম্যক-সম্বুদ্ধত্বের সম্ভাবনা বর্তমান এবং শূন্যতা ও করুণার অভিন্নতায় প্রতিষ্ঠিত বোধিচিত্ত লাভের মধ্য দিয়া যে-বোধিসত্ত্বাবস্থা লাভ হয় তাহার ভিতর দিয়াই প্রত্যেকে ক্রমে বুদ্ধত্বলাভ করিতে পারেন। মহাযানীরা ব্যক্তিগত

জীবনের আদর্শ হিসাবে বোধিসত্ত্বাবস্থা লাভকেই কাম্য বলিয়া মনে করিতেন। বোধিচিত্ত লাভ করাই বোধিসত্ত্বাবস্থায় উন্নীত হওয়া। জগৎ সংসারের শূন্যতা স্বরূপের জ্ঞান (অর্থাৎ জাগতিক কোন বস্তুর নিজস্ব কোন ধর্ম বা স্বরূপ নাই,—প্রত্যেকেই তাহার বর্ত্তমান স্বরূপের জন্য অন্য কোন স্বরূপের উপর নির্ভরশীল সুতরাং অস্তিত্বহীন—এই জ্ঞানই শূন্যতাজ্ঞান) এবং বিশ্বব্যাপী করুণা (অর্থাৎ শুধু নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা নয়—পরোপকার এবং তাহার মধ্য দিয়া জাগতিক সকলের মুক্তির জন্য চেষ্টা)—এই দুইয়ের অভিন্নাবস্থাই বোধিচিত্ত। (শূন্যতা করুণাভিন্নম্ বোধিচিত্তম্)। এই অবস্থা লাভই বোধিসত্ত্বাবস্থালাভ—ইহার মধ্য দিয়াই ক্রমে বুদ্ধত্ব লাভ।

বুদ্ধদেবের ত্রিকায় পরিকল্পনাও মহাযানীদের আর একটি বৈশিষ্ট্য। মহাযানীরা ঐতিহাসিক বুদ্ধে বিশ্বাস করিতেন না। তাহাদের ত্রিকায় পরিকল্পনায় বুদ্ধ তিন প্রকার—ধর্মকায়, নির্মাণকায় ও সম্ভোগ-কায়। বুদ্ধ যখন পারমার্থিক সত্য অবলম্বন করেন তখন তিনি 'ধর্ম কায়ে (নির্গুণ ব্রহ্মের মত); যখন তিনি বোধিসত্ত্বদের নিকট গূঢ় ধর্মার্থ ব্যক্ত করেন তখন তিনি সম্ভোগকায়ে বিচরণ করেন, আর যখন তিনি সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য সূত্রাদি দান করেন তখন তিনি নির্মাণকায়ে বিচরণ করেন।

পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি—মহাযানীরা প্রত্যক জীবের বুদ্ধত্বের জন্য বোধিসত্ত্বাবস্থালাভকে কাম্য বলিয়া মনে করিতেন। বোধিসত্ত্বাবস্থাকে স্থায়ী করিবার জন্য মহাযান মতাবলম্বী প্রথম আচার্যেরা কতকগুলি 'পারমিতা' (পূর্ণতা প্রাপ্তি) অর্থাৎ করুণা, মৈত্রী ইত্যাদি পরম গুণের অনুশীলনকেই উপায় বলিয়া মনে করিতেন। সকল জীবের মধ্যে বুদ্ধত্ব

কল্পনা, সকল জীবের মুক্তির জন্য পরোপকার ও আত্মোৎসর্গ এবং পন্থা হিসাবে মৈত্রী করুণা ইত্যাদির অনুশীলন মহাযান সম্প্রদায়কে রীতিমত জনপ্রিয় করিয়া তোলে। এই জনপ্রিয়তার জন্যই মহাযান মতের মধ্যে ক্রমে নানা বিচিত্র উপাদান প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে এবং এই ভাবে তান্ত্রিকতাও প্রবেশ করে। অবশ্য মহাযান মতের জনপ্রিয়তাই তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের উৎপত্তির কারণ নহে। মহাযান মতের মধ্যেই পরবর্তীকালে, পূর্বেকার 'পারমিতানয়ের' মত একটি 'মন্ত্রনয়ের' উদ্ভব হয়। পূর্বেকার আচার্যেরা যেমন মনে করিতেন পারমিতার অনুশীলনই বুদ্ধত্বলাভের উপায় ইঁহারা তেমনি মনে করিতেন মন্ত্র উপাদানই বুদ্ধত্বলাভের উপায়। এই 'মন্ত্র নয়' বা মন্ত্রযানই পরবর্তীকালে বৌদ্ধতান্ত্রিক নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে এবং তখন হইতেই বৌদ্ধধর্মের মধ্যে প্রকৃষ্টভাবে তান্ত্রিকতার সূত্রপাত হয়।

বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কখন এবং কাহার দ্বারা-যে তান্ত্রিকতার প্রথম সূত্রপাত হয় তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। এইরূপ আর একটি মতভেদের বিষয় তন্ত্রের মূল, বৌদ্ধ কি হিন্দু, সেই প্রশ্ন লইয়া। চর্যাপদের আলোচনা প্রসঙ্গে এ আলোচনার বিশেষ কোন মূল্য নাই— কারণ প্রথমে যাহার দ্বারাই প্রচারিত হউক না কেন চর্যাপদগুলির মধ্যে তান্ত্রিকতার পরিচয় আছে কিনা তাহাই আমাদের বিচার্য।[১]

১ তন্ত্র মূলতঃ বৌদ্ধও নহে হিন্দুও নহে—ইহার মূল বক্তব্য সর্বত্রই এক। বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তনের বহু পূর্ব হইতেই দেশে তন্ত্রের প্রচলন ছিল, এমনকি অথর্ববেদেও তান্ত্রিক আচার লক্ষ্য করা যায়। (দ্রঃ তন্ত্রকথা : চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ; পৃঃ ৪) শৈব, বৈষ্ণব, ইত্যাদি নানা ধর্মমতের সহিত মিশিয়া শৈবতন্ত্র, বৈষ্ণবতন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ইহা নামাঙ্কিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে কে যে প্রথম তন্ত্রের প্রচলন করেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন। অনেকে স্বয়ং বুদ্ধদেবকেই বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তন্ত্রের প্রবর্তক বলিয়া মনে করেন। অন্য মতে অসঙ্গই (খৃঃ চতুর্থ শতক) বৌদ্ধতন্ত্রের প্রবর্তক। কেহ কেহ

বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে-মন্ত্র উপাদানের প্রবেশ হইতে তান্ত্রিকতার সূত্রপাত তাহা প্রথমে 'ধারণী' (অর্থাৎ ইহার দ্বারা ধারণ করা হয়) উপাদান রূপেই প্রবেশ লাভ করে। ধারণী হইতে মন্ত্র এবং তাহার পরই মুদ্রাউপাদান ইহার মধ্যে প্রবেশলাভ করে এবং ক্রমে ক্রমে তন্ত্রের অন্যান্য উপাদান—মণ্ডল, অভিক্ষেপ, এমনকি যৌনযৌগিক সাধন পদ্ধতিও প্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে পূর্ণ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিবর্তিত করে। তখন ইহার নাম হয় 'বজ্রযান'। এই বজ্রযান আবার নানা শাখায় বিভক্ত—ক্রিয়াতন্ত্র, চর্যাতন্ত্র, যোগতন্ত্র, অনুত্তরতন্ত্র। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মকে অবশ্য অন্য উপায়েও শ্রেণীবিভক্ত করা যায়—যথা বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান। বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত হইলেও এগুলি বস্তুত কোন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম নহে, ইহারা তন্ত্রযানেরই সামান্য-পৃথক ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ মাত্র।[১]

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস কেবল মাত্র বৌদ্ধধর্মের মধ্যেই অনুসন্ধান করিলে চলিবে না। তন্ত্রের বিভিন্ন উপাদান ইহার মধ্যে বিদ্যমান। তাই এ প্রসঙ্গে তন্ত্রের মূলসূত্রগুলি আলোচনা করিয়া বৌদ্ধ মহাযান মতটি, তাহার বিভিন্ন উপাদান সমেত,

---

আবার নাগার্জুনকে (দ্বিতীয় শতক) ইহার প্রবর্তক বলিয়া মনে করেন। অসঙ্গের মহাযান সূত্রালংকারে 'পরাবৃত্তি' বলিয়া যে তান্ত্রিক পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ আছে তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে অসঙ্গের সময় হইতেই তান্ত্রিকতার প্রথম সূত্রপাত। অসঙ্গ তাঁহার মতকে যোগাচারবাদ বলিয়া উল্লেখ করাতেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার ঝোঁক ছিল। সুতরাং বলা যাইতে পারে অসঙ্গই বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে প্রথম তান্ত্রিকতার বীজ বপন করেন। অবশ্য অসঙ্গের যোগাচার এবং পরবর্তী তন্ত্রযানগুলি কোন অর্থেই অভিন্ন নহে।

১ দ্রঃ Obscure Religious Cults : S. B. Dasgupta, পৃঃ ২৪-২৭ এবং বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য : প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, পৃঃ ৪৪-৪৯।

কিভাবে তান্ত্রিকতায় পরিবর্তিত হইয়া গেল তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

ঃ তন্ত্রের মূল বক্তব্য ঃ

ভারতীয় বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে পরমার্থ সত্যের স্বরূপ সম্পর্কে নানা প্রকার আলোচনা দৃষ্ট হয়—কিন্তু সেই পরমার্থ সত্যকে লাভ করিবার জন্য কোন কার্যকরী পন্থা কোন দর্শন নির্দেশ করে নাই। তন্ত্র দার্শনিকভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও পরমার্থ সত্যলাভের কার্যকরী পন্থা নির্দেশই তাহার লক্ষ্য। তন্ত্রে তাই বুদ্ধিগ্রাহ্য দার্শনিক অলোচনা অপেক্ষা কার্যকরী সাধন পদ্ধতিই অধিক। তন্ত্রের মতে পরমার্থ সত্যের দুইরূপ, নিবৃত্তিরূপ পুরুষ বা শিব, এবং প্রবৃত্তিরূপ প্রকৃতি বা শক্তি। পরমার্থ সত্য অদ্বয় স্বরূপে এই পুরুষ-প্রকৃতি, শিব-শক্তির মিলিত অবস্থা। এই মিথুন বা মিলিতাবস্থাই জীবের কাম্য। শিবের সহিত মিলিতাবস্থায় শক্তিই এই বিশ্বসৃষ্টি প্রবাহের কারণ। কিন্তু পরস্পর নিরপেক্ষভাবে ইহাদের কাহারও কোন প্রভাব নাই। সংসার প্রবৃত্তি-স্বরূপ শক্তির প্রভাবে ক্রমে প্রবৃত্তি অর্থাৎ পরিবর্ত্তনের পথে চলিয়াছে —তাহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া নিবৃত্তির পথে পরিচালিত করা এবং নিবৃত্তি-স্বরূপ শিবের সহিত অদ্বয়ভাবে যুক্ত করানোই মুক্তিকামী জীবের কাজ।

তান্ত্রিকদের মতে আমাদের দেহই সকল সত্যের আধার। আমাদের এই দেহ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্তি ; এই দেহের মধ্যেই চন্দ্র-সূর্য, পাহাড়-পর্বত, নদনদী, জীব-প্রবাহ, ইহার মধ্যেই শিবশক্তি। শিব শক্তির যে মিলন তান্ত্রিকদের কাম্য তাহারও অনুসন্ধান করিতে হইবে

এই দেহের মধ্যেই—এবং তাঁহাদের মিলন ঘটাইবার স্থানও এই দেহ। এই দেহকে যন্ত্র করিয়া ইহার মধ্যে শিবশক্তির মিলন ঘটাইতে পারিলে পরম সত্যলাভ সহজ হয়। তন্ত্রে আমাদের দেহস্থিত মেরুদণ্ডটিকে মেরু পর্বত বলা হইয়াছে। এই মেরুপর্বতের সর্বনিম্নে অবস্থিত দক্ষিণ মেরুতে মূলাধার চক্রে কুণ্ডলিনী অবস্থায় শক্তি (কুল কুণ্ডলিনী) নিদ্রিতা। ইহাকে জাগ্রত করিয়া উর্ধ্বমুখী করিয়া স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, ইত্যাদি ক্রমে, মেরুপর্বতের উপর অবস্থিত বিভিন্ন চক্রের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া সর্বোর্ধ্বে উত্তর মেরুতে সহস্রার পদ্মে অবস্থিত নিবৃত্তিরূপী শিবের সহিত মিলিত করিয়া দেওয়াই তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য। শক্তিকে যত উর্ধ্বগামিনী করা যাইবে তান্ত্রিক সাধকও ততই প্রজ্ঞা ও কল্যাণের আদর্শে উদ্ভাসিত হইবেন। এই ভাবে, দেহের মধ্যেই সকল সত্য এবং তাহা উপলব্ধির উপায়ও দেহেই অবস্থিত, ইত্যাদি বলিয়া তান্ত্রিকেরা দেহের প্রাধান্য এবং কায়সাধনা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তন্ত্রে কার্যকরী পন্থা হিসাবে দেহ সাধনা বা কায়সাধনার পদ্ধতিও বর্ণিত হইয়াছে। দেহের বামদিকে অবস্থিত ইড়া এবং দক্ষিণদিকে অবস্থিত পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়কে যথাক্রমে শক্তি ও শিব, নারী ও পুরুষ হিসাবে ধরিয়া ইহাদের মধ্যদিয়া প্রবাহিত প্রাণ ও অপান বায়ুকে দেহমধ্যস্থিত-নাড়ী সুষুম্না পথে পরিচালিত করিয়া সহস্রারে প্রেরণ করিতে পারিলেই অদ্বয় সত্য লাভ হয় বলিয়া হঠযোগে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাই কায়-সাধনার পদ্ধতি—এই পদ্ধতিই তান্ত্রিকদের মধ্যে প্রচলিত।

তান্ত্রিক সাধনার অবশ্য আর একটি দিক আছে। তন্ত্রের মতে প্রতি নারী ও পুরুষের মধ্যে শক্তি ও শিব বিদ্যমান থাকিলেও শিব-

প্রাধান্যে পুরুষই শিব এবং শক্তি-প্রধান্যে নারীই শক্তি। সুতরাং শিব শক্তির মিলিতাবস্থা বলিতে তান্ত্রিকেরা রক্তমাংসের দেহধারী নারী পুরুষের মিলনকেও বুঝাইয়াছেন। এই মিলন কিন্তু পার্থিব প্রবৃত্তির তাড়নায় বা কাম চরিতার্থ করিবার জন্য নহে। অবশ্য নারী পুরুষের মিলনের কথা বলিলেই ক্রমে তাহার মধ্যে অবনতি অবশ্যম্ভাবী এবং কাম প্রভাবিত নারীপুরুষের মিলনের ব্যাপারই ক্রমে তন্ত্রের আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়। এজন্য তন্ত্রের প্রতি শিক্ষিত জনসাধারণের অনেক ঘৃণাও আছে এবং প্রাচীন কাল হইতে তন্ত্রকে নিন্দা ও বিদ্রূপ করা হইয়াছে। তান্ত্রিক আচার বেদবিগর্হিত এবং নিন্দনীয়,—জনসাধারণকে প্রতারিত করিবার জন্য এবং বেদবহিষ্কৃত পতিত ব্যক্তিদিগের জন্য তন্ত্রশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল,—এইরূপ উক্তি বিভিন্ন পুরাণ সংহিতার মধ্যেই পাওয়া যায়।[১] তন্ত্রকারেরাও নারী-পুরুষ মিলনাদর্শের এরূপ বিকৃতির সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই খড়্গ ধারার উপর দিয়া গমন, ব্যাঘ্রের কণ্ঠালিঙ্গন, সাপ ধরিয়া রাখা, প্রভৃতি কার্য হইতেও দুষ্কর,[২] এই তান্ত্রিক আচার যাহারা পালন করিবেন তাহারা যদি কামুক উদ্দেশ্য লইয়া তাহা করেন তবে তাহার শাস্তি কি হইবে তাহাও তাঁহারা নির্দেশ করিয়াছিলেন।[৩]

১ কাপালং পাঞ্চরাত্রং যামলং বামমার্হতম্।
এবং বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু॥ কূর্ম, পূর্ব ১২।২৫৯ দ্রঃ তন্ত্রকথা পৃঃ ১০—১৩

২ কৃপাণ ধারা গমনাদ্ ব্যাঘ্র কণ্ঠাবলম্বনাৎ।
ভুজঙ্গ ধারণান্নূনমশক্যং কুলবর্ত্তনম্॥ কুলার্ণব ২

৩ অর্থাদ্ কামতোবাপি সৌখ্যাদপি চযোনরঃ।
লিঙ্গ যোনী রতো মন্ত্রী রৌরব নরকং ব্রজেৎ॥ তন্ত্রসার, কুলাচার প্রকরণ॥
(২ ও ৩ 'তন্ত্রকথা'য় উদ্ধৃত। বিস্তারিত আলোচনা উক্ত গ্রন্থে ১৮—২২ পৃঃ দ্রঃ)

যাহা হউক, নিজ দেহেই হউক বা নারী পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন দেহেই হউক শিব শক্তির মিলিতাবস্থা লাভই অদ্বয় সত্য লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা এবং—মিথুন, যুগনদ্ধ, যামল ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বিভিন্নতন্ত্রে পরিচিত—ঐ অদ্বয় লাভই তান্ত্রিকদের প্রধান লক্ষ্য।

ঃ মহাযানী ধ্যান ধারণাগুলির তান্ত্রিকতায় পরিবর্তন ঃ

মহাযান ধর্মসম্প্রদায় যখন তান্ত্রিকতার সংস্পর্শে আসিল অথবা অতিরিক্ত জনপ্রিয়তার জন্য যখন মহাযানের মধ্যে তান্ত্রিক ধ্যান ধারণা প্রবেশ করিল তখন ক্রমে মহাযানী ধ্যান ধারণাগুলিও তান্ত্রিকতায় রূপান্তরিত হইতে লাগিল। পরিবর্তনের প্রথম পাদক্ষেপেই মহাযান মতের শূন্যতার ধারণাটি 'বজ্রে' পরিণত হইল। ভবসংসারের শূন্যতা-স্বভাব যেন বজ্রের মতই ;—শূন্যতা তাই বজ্র। বজ্রযানে আচার-অনুষ্ঠান সমস্ত কিছুই বজ্র বা বজ্রচিহ্নিত—মূলদেবতা বজ্রসত্ত্ব। এই বজ্র-সত্ত্বের কল্পনা আবার বোধিচিত্তের কল্পনার সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছে। বোধিচিত্ত শূন্যতা ও করুণার মিলিতাবস্থা। সহজযানে শূন্যতা এবং করুণা যথাক্রমে প্রজ্ঞা ও উপায়ে (প্রকৃতি ও পুরুষে) পরিণত হইয়াছে এবং ইহাদের মিলিতাবস্থা অর্থাৎ বোধিচিত্তের বর্ণনা করিতে যাইয়া তাহাকে পরম সুখময় অদ্বয় অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে মহাযানীদের মতে শূন্যতা এবং করুণা তাহাদের তত্ত্ব ও সাধনার মূল কথা। জগৎ সংসারের শূন্যতা স্বভাব উপলব্ধিই পরমজ্ঞান বা প্রজ্ঞা এবং বোধিচিত্তলাভের পন্থা হিসাবে বিশ্ব-মৈত্রী বা করুণাই উপায়। এই প্রজ্ঞা (শূন্যতা) এবং উপায় (করুণা)

ক্রমে নারী ও পুরুষ রূপে কল্পিত হইলেন। অবশ্য এখানে সাধারণ তান্ত্রিক ধারণার সহিত বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ধারণার একটু পার্থক্য আছে। অন্যান্য তান্ত্রিক ধারণায় নারীই শক্তি আর বিশ্বসংসারের মূলে সেই প্রকৃতিই সক্রিয়, অন্য দিকে পুরুষ নিগু´ণ, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, নিবৃত্তি স্বরূপ। কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকতায় পুরুষ বা উপায়ই সক্রিয়, অন্যদিকে পরম জ্ঞান—প্রজ্ঞা, বা প্রকৃতি নিষ্ক্রিয়। সে যাহাই হউক, এই নারী এবং পুরুষ ধারণা প্রবেশ করাতেই তান্ত্রিকতাও অতি সহজে এবং সার্থক ভাবে প্রবেশ করিবার সুযোগ লাভ করিল। এই প্রজ্ঞা উপায়ের মিলিতাবস্থা বোধিচিত্তও তাই শিবশক্তির মিলিতাবস্থা অদ্বয় (যুগনদ্ধ) বলিয়া পরিকল্পিত হইল।

তান্ত্রিক সাধনার একটি বৈশিষ্ট্য কায়-সাধনার প্রাধান্য। ইড়া পিঙ্গলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত প্রাণ অপান বায়ুকে সুষুম্না পথে প্রবাহিত করিয়া মস্তিষ্কস্থ সহস্রার পদ্মে প্রেরণই তান্ত্রিক সাধকদের কাম্য। বৌদ্ধতন্ত্রেও প্রজ্ঞা ও উপায় ক্রমে ইড়া এবং পিঙ্গলার সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং ললনা-রসনা, চন্দ্র-সূর্য, রবি-শশী, ধমন-চমন ইত্যাদি বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত হইয়াছে। মধ্যনাড়ী সুষুম্না বৌদ্ধ-তান্ত্রিক মতে অবধূতিকা—এবং ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত বোধিচিত্ত, তান্ত্রিক চক্রের সাদৃশ্যে পরিকল্পিত নির্ম্মাণচক্র হইতে, উদ্ভূত হইয়া ধর্ম্মচক্র, সম্ভোগচক্র ইত্যাদির মধ্য দিয়া মস্তিষ্কস্থ মহাসুখ চক্রে (পদ্মে) উন্নীত হয়। এইভাবে তন্ত্রোক্ত দেহসাধনা কিঞ্চিৎ বিকৃতি বা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বৌদ্ধতন্ত্রেও প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

তন্ত্রের অদ্বয়ই বৌদ্ধতান্ত্রিকতার যুগনদ্ধ। প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলিত-রূপই যুগনদ্ধ। এই যুগনদ্ধকে মাঝে মাঝে আবার 'সমরস' বলিযাও

আখ্যাত করা হইয়াছে। অবশ্য সমরস বলিতে অদ্বয় অবস্থা উপলব্ধির ফল স্বরূপ যে অনুভূতি অর্থাৎ মহাসুখকেও বোঝান হইয়াছে।

বৌদ্ধদের লক্ষ্য নির্বাণ। দুঃখের ধারণা হইতেই তাহাদের ধর্ম-মতের উৎপত্তি। দুঃখ নিবৃত্তি তাহাদের শেষ কথা। সুতরাং তাহাদের লক্ষ্য নির্বাণ, স্বভাবতঃই, সুখময় হইবে ইহাই সাধারণের ধারণা। দার্শনিকভাবে নির্বাণ যে পরম অনুভূতি তাহার স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না, তাহা অনির্বচনীয়। কিন্তু সাধারণের নিকট এবং বহু পালি গ্রন্থকর্তার নিকট নির্বাণ সুখময় বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে। তন্ত্রের অদ্বয় অবস্থার অনুভূতিও মহাসুখের। পরবর্তীকালে এই দুই ধারণা এক হইয়া গিয়াছে। নির্বাণের সুখময় অনুভূতি, যুগনদ্ধের সমরসরূপ সুখৈকানুভূতির সহিত এক হইয়া গিয়া বৌদ্ধতন্ত্রের লক্ষ্য হিসাবে পরিচিতি লাভ করিয়াছে।

॥ তিন ॥

চর্যার ধর্মের সাধন পদ্ধতি

এতক্ষণ আমরা চর্যাপদগুলির মধ্যে যে ধর্মমত আছে তাহার সাধারণ স্বরূপ এবং তাহার উৎপত্তি ও বিবর্তনের ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়াছি। এবং ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি বৌদ্ধ কাঠামোর উপর তান্ত্রিক ধ্যান ধারণা ও পদ্ধতিগুলি নানাভাবে প্রকাশিত হইয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি করিয়াছে। চর্যাপদগুলি বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যাইবে—তন্ত্রের সেই—কায়সাধনা, ত্রিনাড়ী ও

দেহের মধ্যকার নানাবিধ চক্র ও পদ্ম পরিকল্পনা, দেহের মধ্যেই শিব শক্তির মিলিত অদ্বয় অবস্থা অথবা দেহের বাহিরে সাধন সঙ্গিনীর সহিত মিলন পরিকল্পনার মধ্য দিয়া মহাসুখ লাভ—ইত্যাদি তান্ত্রিক ধ্যান ধারণা ও সাধন পদ্ধতিগুলি—বৌদ্ধ কাঠামো ও পারিভাষিকের আবরণীতে অতি স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে।

চর্যাপদগুলিতে এই কায়সাধনা, দেহপ্রাধান্য, ত্রিনাড়ীতত্ত্বটি কখনও বা স্পষ্ট ভাষায় কখনও বা অন্যকোন রূপক ইত্যাদির মাধ্যমে হেঁয়ালি ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কখনও নৌকা বাহিবার বর্ণনা, কখনও ইঁদুরের রূপক, কখনও মত্তহস্তী, কখনও বা বাদ্যযন্ত্রের রূপকের মধ্য দিয়া ইহা বর্ণিত হইয়াছে। এগুলি বিশ্লেষণ করিলে সর্বত্রই যৌগিক সাধন পদ্ধতির বর্ণনাই পাওয়া যাইবে। প্রতি চিত্রই গুহ্য তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতির ইঙ্গিত বহন করে।[১] প্রথম চর্যাতেই উক্ত হইয়াছে—'ধমণ-চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা'—ধমন ও চমন এই যুক্ত পিড়ির উপর বসিয়া। এই ধমন চমন—বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ভাষান্তরিত ইড়া পিঙ্গলা ছাড়া অন্য কিছুই নহে। ইড়া পিঙ্গলা এবং সুষুম্না চর্যাপদগুলির মধ্যে বারবার ভিন্ন ভিন্ন নামে উক্ত হইয়াছে। তন্ত্রের পিঙ্গলা—মাহাযানী বৌদ্ধদের 'উপায়ই' বৌদ্ধতন্ত্রে—রসনা, সূর্য, রবি, প্রাণ, চমন, কালি, বিন্দু, যমুনা, গ্রাহ্য, এবং 'বং'—ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে। অন্যদিকে তন্ত্রের ইড়া, মহাযানী বৌদ্ধদের 'প্রজ্ঞা'—বৌদ্ধতন্ত্রে আসিয়া ললনা, চন্দ্র, শশী, অপান, ধমন, আলি, নাদ, গঙ্গা গ্রাহক, এবং 'এ' ইত্যাদি নাম গ্রহণ করিয়াছে। মধ্যনাড়ী সুষুম্না

১ "These images imply certain yogic processes." Studies in the Tantras : Dr. P. C. Bagchi p 80

বৌদ্ধতন্ত্রে অবধূতী, অবধূতিকা ;—ইনিই শুণ্ডিনী, ডোম্বী, চণ্ডালী, নৈরামণি, সহজ সুন্দরী ইত্যাদি নামেও অভিহিত হইয়াছেন।[১] পূর্ব উদ্ধৃত পংক্তিটীতেও ধমন চমন যুক্ত পিড়ির উপর উপবেশন—ইড়া পিঙ্গলার প্রাণ অপান বায়ুকে সুষুম্না পথে পরিচালিত করিবার ইঙ্গিতই বহন করিতেছে। অনুরূপ প্রক্রিয়ার উল্লেখ পাই ঃ

এক সে শুণ্ডিণি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ॥
সহজে থির করি বারুণী সান্ধ।
জেঁ অজরামর হোই দিঢ় কান্ধ॥ (৩)

এক শুণ্ডিণী (অবধূতিকা) দুইকে (বাম ও দক্ষিণ নাড়ী দ্বয়কে ; চন্দ্রসূর্য্যৌ বাম-দক্ষিণৌ···দ্বৌ—টীকা) ঘরে (মধ্যমায়, মধ্যনাড়ীতে) প্রবেশ করান। চিকণ (অবিদ্যামল শূন্য) বাকল দ্বারা (সুখ প্রমোদ স্বরূপ) বোধিচিত্তকে বন্ধন করেন। (বোধিচিত্তরূপ) বারুণী সহজানন্দে প্রবেশ করে—যাহার দ্বারা অজরামর হইয়া দৃঢ়স্কন্ধ লাভ করে। এখানেও অবধূতিকা কর্ত্তৃক বাম দক্ষিণ দুই নাড়ীকে মধ্য পথে পরিচালনা এবং পরে চিত্তের মহাসুখরূপ সহজানন্দলাভের ইঙ্গিত অতি সুস্পষ্ট।

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পার গামী লোঅ নিভর তরই॥

* * *

১ এই নামগুলির বিস্তারিত তাৎপর্যের জন্য ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের Introduction to Tantric Buddhism দ্রষ্টব্য।

সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিয়ড্ডি বোহি দূর মা জাহি॥ (৫)

ভবনদী গহন গম্ভীর বেগে প্রবাহিত হইতেছে। নদীর দুই তীর কর্দমাক্ত—মাঝখানে ঠাই নাই। ধর্মার্থে চাটিল সাঁকো গঠন করিল। পারগামী লোকে নির্ভরে তরিয়া গেল। সাঁকোতে চড়িলে বাম দক্ষিণ হইওনা। বোধি নিকটেই আছে দূরে যাইও না। আপাত দৃষ্টিতে এখানে ভব সংসারকে নদী স্রোতের সহিত তুলনা—(স্রোত সৌঘবৎ) এবং মধ্য পথ অবলম্বনের নির্দেশ (মধ্যমা প্রতিপদ)—ইত্যাদিতে বৌদ্ধ দর্শনের তত্ত্ববর্ণনাই কবিতাটির উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। বস্তুত পদটির পরিকল্পনায় বৌদ্ধদর্শনের কাঠামোটি সার্থকভাবে কার্যকরী।[১] কিন্তু ইহাকে ছাপাইয়াও ইহার মধ্যকার তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতির ইঙ্গিত অতি সুস্পষ্ট। ভবনদী এখানে দেহ মধ্যস্থিত নাড়ীগুলি সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে। ভবনদীর দুইতীর কর্দমাক্ত অর্থাৎ বাম দক্ষিণের দুইতীর বিষয়াসক্তির দিকে লইয়া যায়। মধ্যপথ গভীর—অর্থাৎ পরম সত্য গভীর। সাঁকো সংবৃতি ও পারমার্থিক বোধিচিত্তের মিলন বুঝাইতেছে। যখন কেহ সাঁকোতে চড়ে অর্থাৎ সংবৃতি বোধিচিত্তকে পারমার্থিক বোধিচিত্তে পরিণত করিবার সাধনায় নিযুক্ত হয় তখন যেন সে বাম দক্ষিণে না যায়—অর্থাৎ মধ্যনাড়ীর মধ্য দিয়াই পরমসত্য লাভে তৎপর থাকে।

অন্য একটি পদেও কাহ্নুপাদ বলিয়াছেন—আলি এবং কালি (ইড়া, পিঙ্গলা) পথ (মধ্যপথ—সুষুম্না—অবধূতি মার্গ) রুদ্ধ করিল ; তাহা দেখিয়া কাহ্ন বিমন হইলেন—"আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।

১ দ্রঃ চর্যাপদের দার্শনিক পটভূমি।

তা দেখি কাহ্ন বিমণ ভইলা ॥'' (৭) অনুরূপ আর একটি পদেও পাই—

বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা।
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা ॥ (৮)

বাম দক্ষিণকে চাপিয়া পথের সহিত মিলিয়া মিলিয়া (বিরমানন্দের পথে যখন) চলিলাম তখন পথেই মহাসুখের সঙ্গ মিলিল। পরবর্তী পদেও আছে—

এবং কার দৃঢ় বাখোড় মোড়িউ।
বিবিহ বিআপক বান্ধন তোড়িউ ॥
কাহ্নু বিলসঅ আসব মাতা।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা ॥ (৯)

'এ' এবং 'বং' (চন্দ্র এবং সূর্য নাড়ী) দৃঢ় স্তম্ভ দুইটিকে মর্দিত করিয়া এবং বিবিধ বিপাকের বন্ধন ছিন্ন করিয়া কাহ্নু সহজানন্দ রূপ পদ্মবনে প্রবেশ করিয়া আসবমত্ত হইল। অর্থাৎ আলি কালি বা বাম দক্ষিণ নাড়ীদ্বয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে প্রকৃতি দোষ-মুক্ত করিয়া আয়ত্বে আনিয়া কৃষ্ণাচার্য মহাসুখকমলবনে প্রবেশ করিলেন। কাহ্নুপাদ আর একটি পদেও বলিয়াছেন—

আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
রবি শশী কুণ্ডল কিউ আভরণে ॥ (১১)

এখানে আলিকালি, রবিশশী অর্থাৎ দুই দিকের দুই নাড়ীর উপর পরিপূর্ণ প্রভাবের কথা বলা হইয়াছে। আলি কালিকে চরণের নুপূর এবং রবিশশীকে কুণ্ডল আভরণে পরিণত করা অর্থাৎ তাহাদের উপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার এখানে উদ্দিষ্ট।

ডোম্বীপাদ তাঁহার একটি পদের মধ্যেও এই নাড়ীদ্বয় এবং মধ্য-পথে তাহাদের প্রবেশ করানোর বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন—

গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ।
তহিঁ বুড়িলি মাতঙ্গি পোইআ লীলেঁ পার করেই॥

*　　*　　*

চান্দ সূজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিন্দা।
বাম দাহিণ দুই মাগ ন রেবই বাহতু ছন্দা॥ (১৪)

গঙ্গা যমুনার মধ্যে (মধ্য পথে) নৌকা প্রবাহিত হয়। সেখানে নিমজ্জিত সহজানন্দ প্রমত্তাঙ্গী ডোম্বী, সন্তানকে অন্যপারে লইয়া যায়। চন্দ্র সূর্য দুই চাকা; সৃষ্টি সংহারের অদ্বয় অবস্থা পুলিন্দ (মাস্তল)। বাম দক্ষিণ দুই পথ দেখা যাইতেছেনা—আনন্দে বাহিয়া যাও। এখানে চন্দ্র সূর্য, গঙ্গা যমুনা, বাম দক্ষিণের নাড়ীদ্বয়কেই বুঝাইতেছে। শান্তিপাদও একটি পদে বলিতেছেন—বাম দক্ষিণ দুই পথ ছাড়িয়া শান্তি ঘুরিয়া বেড়ান—"বাম দাহিণ দো বাট চ্ছাড়ী সান্তি বুলেথেউ সংকেলিউ। (১৫)

বীণাপাদের একটি পদেও আমরা পাই—

সুজ লাউ শশি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী একি কিঅত অবধূতী॥

*　　*　　*

আলি কালি বেণি সারি সুণিআ।
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ॥ (১৭)

সূর্যকে লাউ এবং শশীকে তন্ত্রী করিয়া এবং অবধূতীকে দণ্ড করিয়া

১ ডোম্বীর ব্যাখ্যা পরে দ্রষ্টব্য।

(বীণাপাদ একটি বীণা করিয়াছেন)। আলি কালির যুক্ত সুর শুনিয়া গজবর (চিত্ত) সমরসে প্রবিষ্ট হইল। এখানে সূর্য এবং চন্দ্র স্পষ্টতই বাম দক্ষিণের দুই নাড়ি। সরহ পাদও বলিয়াছেন—"বাম দাহিণ জো খাল বিখলা। সরহ ভণই বাপা উজুবাট। ভইলা॥" (৩২) বাম দক্ষিণে খাল বিখাল; সহজ পথই নিরাপদ পথ।

এইরূপ বহু পদেই কায়সাধনার তত্ত্বটি অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। চর্যার বহু পদে দেহ প্রাধান্যের কথাও আছে। তন্ত্রে দেহকে যেমন সকল সত্যের আধার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—চর্যাপদগুলিতেও অনুরূপ উক্তি লক্ষ্য করা যায়। কাহ্নুপাদ একটি পদে বলিতেছেন—

কাহ্ন কপালী যোগী পইঠ অচারে।
দেহ নঅরী বিহরই একাকারেঁ॥ (১১)

কাহ্নুপাদ কাপালিক যোগী হইয়াছেন, এবং যোগাচারে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি অদ্বয়ভাবে দেহনগরীর মধ্যেই বিহার করিতেছেন। চর্যাপদগুলির অনেক স্থানেই দেহকে নৌকা করিয়া সাধনার কথা বলা হইয়াছে। জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ এই দেহনৌকাকে জগৎ-সংসারে বাহিয়া চলিবার কথা চর্যাকারেরা বলিয়াছেন—

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মন কেডুআল।
সদ্‌গুরু বঅণে ধর পতবাল॥
চীঅ থির করি ধরহুরে নাই।
আণ উপায় পার ণ জাই॥ (৩৮)

ভবসমুদ্রের মধ্যে কায়া হইতেছে নৌকা, খাঁটি মন দাঁড়। সদ্‌গুরুর বচনে হাল ধরিতে হইবে। চিত্ত স্থির করিয়া নৌকা ধরিতে হইবে—

অন্য কোন উপায়ে পারে যাওয়া যাইবে না। অন্যত্রও আছে

তিশরণ ণাবী কিঅ অঠক মারী।

ণিঅ দেহ করুণা শূণমে হেরী॥ (১৩)

ত্রিশরণ দেহকে নৌকা করিয়া আটকে (অষ্ট মহাসিদ্ধি) মারিয়া দেহ নৌকাকে শূন্য করুণার অদ্বয় অবস্থার ভিতর ভাসমান দেখিতেছে।[১]

বৌদ্ধতান্ত্রিক মতে পরম সত্য দেহের মধ্যেই আছেন। তিনি দেহের কোথায় কি ভাবে আছেন—কি উপায়েই বা তাহার উপলব্ধি

---

১ এই দেহের ভিতরই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড—এই দেহেই সাধনা, এখানেই পরমসিদ্ধি—এই তত্ত্বটি তান্ত্রিক। মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনার ধারায় এই তত্ত্বটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বৌদ্ধ দোহাগুলিতেও এই তত্ত্বটি অতি সুন্দর ভাবে স্থান পাইয়াছে—

এথু সে সুরসরি জমুণা এথু সে গঙ্গা সাঅরু।
এথু পআগ বণারসি এথু সে চন্দ দিবাঅরু॥
ক্খেত্তু পীঠ উপপীঠ এথু মই ভমই পরিঠ্ঠও।
দেহা সরিসঅ তিথ মই সুহ অণ্ণ ণ দীঠ্ঠও॥

এই দেহেই সুরেশ্বরী (গঙ্গা) ও যমুনা, এখানেই গঙ্গাসাগর; এখানেই প্রয়াগ, বারাণসী এখানেই চন্দ্র, সূর্য, ক্ষেত্র, পীঠ, উপপীঠ; ইহার চারিদিকে আমি ভ্রমন করি। এই দেহ সদৃশ তীর্থে যে সুখলাভ হয় এমন আমি কোথাও দেখি নাই।

ঘরে অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই।
পই দেক্খই পড়ি বেশী পুচ্ছই॥

অর্থাৎ পরম সত্য ঘরেই আছে, তাহাকে বাহিরে দেখিতেছ? পতিকে দেখিতেছ অথচ প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করিতেছ?

পণ্ডিঅ সঅল সত্থ বক্খাণই।
দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই॥

পণ্ডিতেরা সত্য ব্যাখ্যা করে কিন্তু দেহের মধ্যেই যে বুদ্ধ বসন্ত তাহা জানে না। কবির দাদু ইত্যাদির মধ্যেও অনুরূপ দেহতত্ত্বের সুন্দর সুন্দর পদ লক্ষ্য করা যায়।

[দ্রঃ Obscure Religious Cults p 412—416; ভারতের সংস্কৃতি, ক্ষিতিমোহন সেন—পৃঃ ৪০—৪১; ভারতীয় সাধনার ঐক্য—শশিভূষণ দাশগুপ্ত পৃঃ ৩০]

হয় তাহার আলোচনাও তাঁহারা করিয়াছেন। পূর্বেই দেখিয়াছি মহাযানীরা বুদ্ধদেবের ঐতিহাসিক অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহারা ত্রিকায় পরিকল্পনা করিয়া বুদ্ধের তিনটি স্তরভেদ স্বীকার করিয়াছেন। মহাযানী বৌদ্ধদের এই ত্রিকায় কল্পনা তন্ত্রের ষট্‌চক্রের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। তন্ত্রে দেহের মধ্যে ছয়টি চক্রের কল্পনা করা হইয়াছে—যথা মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা। মূলাধার চক্রে অবস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া চক্রষটকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিয়া মস্তিষ্কস্থিত সহস্রার পদ্মে শিবের সহিত মিলিত করাই তান্ত্রিকদের কাম্য। বৌদ্ধতন্ত্রেও দেখা যায় বোধিচিত্ত প্রথম উৎপন্ন হয়—নাভিদেশে নির্মাণচক্রে (নির্মাণ কায়ে); সেখান হইতে তাহাকে ঊর্ধ্বমুখী করিয়া হৃদয়ে অবস্থিত ধর্ম চক্রে (ধর্ম কায়ে) উন্নীত করিতে হয় এবং তৎপরে কণ্ঠে অবস্থিত সম্ভোগ চক্রে (সম্ভোগ কায়ে) তাহা উপনীত হয়। অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিকায় পরিকল্পনা বৌদ্ধ তন্ত্রে আসিয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়াছে—কারণ নির্মাণ, সম্ভোগ, ধর্ম এই ক্রম অনুসারে হৃদয়স্থিত চক্র হওয়া উচিত ছিল সম্ভোগ-চক্র এবং কণ্ঠস্থিত চক্র হওয়া উচিত ছিল ধর্ম-চক্র। তাহা না হইয়া হৃদয়ে ধর্ম এবং কণ্ঠে সম্ভোগ হইয়াছে। যাহাহউক, এই তিনটি চক্রের সহিত তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা সহস্রারের অনুকরণে আর একটী কায় কল্পনা করিয়া মহাসুখকায় বা মহাসুখচক্র (মহাসুখকমল) ইহার সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধদের এই চারিটী কায় পরিকল্পনার সহিত মিশিয়াছে শূন্যতার চারিটী বিভাগ।[১] পরম সত্য

১ চর্যাপদের দার্শনিক পটভূমি দ্রষ্টব্য।

শূন্য স্বরূপ; সেই শূন্যের চারিটি বিভাগ। পরম সত্যের অবস্থানের চারিটি স্তর বা চক্র পরে তাই চারি শূন্যের সহিত এক হইয়া গিয়াছে।

বোধিচিত্তের দুইটিরূপ—সংবৃতি ও পারমার্থিক। সংবৃতি বোধি-চিত্তের স্বরূপ—চঞ্চল ও নিম্নগ। ইহাকে ঊর্ধ্বগ করাই সাধনা। অবধূতিকার পথে প্রজ্ঞা ও উপায়কে মিলিত করিয়া বোধিচিত্তকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে ক্রমে বিভিন্ন চক্রের মধ্য দিয়া সহজ চক্রে উন্নীত করিলে সেই বোধিচিত্তই হয় পারমার্থিক বোধিচিত্ত। তখন তাহা হয় পরমানন্দের কারণ, মহাসুখ স্বরূপ। এই মহাসুখই সহজ সুন্দরী, নৈরামণি, নৈরাত্মা। নাভিদেশে নির্মাণ চক্রে তিনি চণ্ডালী, শবরী, ডোম্বী (ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করা যায় না বলিয়া তিনি 'অস্পর্শা,' তাই ডোম্বী)।

খেপহুঁ জোইনি লেপ ন জাঅ।
মণিকূলে বহিআ ওড়িআণে সমাঅ॥ (৪)

যোগিনী স্বস্থান যোগ বশতঃ মণিমূলে লিপ্ত হইতে পারে না। মণিমূল বহিয়া ঊর্ধ্বদিকে গমন করে। অর্থাৎ বোধিচিত্তের স্বস্থান—মহাসুখ চক্র। এই হেতু প্রথম উৎপত্তি যদিও তাহার মণিমূলে তবুও তাহা ঊর্ধ্বগ হইতেছে এবং মহাসুখ কমলে প্রবেশ করিতেছে।

অধরাতিভোর কমল বিকসিউ।
বতিস জোইনী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ॥

*   *   *

চলিঅ ষমহর গউ নিবাণেঁ।
কমলিনি কমল বহই পণালেঁ॥ (২৭)

অর্ধরাত্রি ভোর কমল বিকশিত হইল; বত্রিশ যোগিনী তাহাতে

অঙ্গ উল্লসিত করিতেছে। শশধর নির্বাণে গিয়া চলিল ; কমলিনী কমল-প্রণালে প্রবাহিত হইল। কমল অর্থাৎ উষ্ণীষ কমল প্রজ্ঞা জ্ঞানাদি অভিষেক সময়ে বিকশিত হইল ; বত্রিশ যোগিনী (ললনা রসনা ইত্যাদি বত্রিশ নাড়ী) আনন্দে উল্লসিত হইতেছে। শশধর অর্থাৎ চিত্ত শশধর নির্বাণে অর্থাৎ বজ্রশিখরাগ্রে, বজ্রকায়ে প্রবিষ্ট হইল। কমলিনী, পরিশুদ্ধাবধূতিকা নৈরাত্মা কমলপ্রণালে (মহাসুখের পথে) প্রবাহিত হইল।

শবরী আমাদের দেহের মধ্যেই উচু উচু পর্বতে বাস করেন। 'উঁচা উঁচা পাবত তহি বসহি সবরী বালী'। দেহ মধ্যস্থিত এই উচু পর্বতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে টীকাতে তাই বলা হইয়াছে—'যোগীন্দ্রস্যস্বকায়কঙ্কাল-দণ্ডমুন্নতং সুমেরু শিখরাগ্রে মহাসুখচক্রে'। আর একটি চর্যাতেও আছে—

এক সো পদমা চৌষঠ্ঠ পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥ (১০)

এক সে পদ্ম চৌষট্টি পাপড়ি ; তাহাতে চড়িয়া নাচে ডোম্বী ও বাপুড়ী। পদ্ম এখানে নির্মাণ চক্র। এখানে মহারাগআনন্দসুন্দর (কৃষ্ণাচার্য) ডোম্বীর সহিত নৃত্য করিতেছেন। চর্যার অনেক স্থানেই এই দেহমধ্যস্থ বিভিন্ন চক্রের (পদ্মের) কথার উল্লেখ আছে। 'সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই।' শূন্যস্বরূপ নৈরাত্মাকে কণ্ঠে অর্থাৎ কণ্ঠস্থ সম্ভোগচক্রে লইয়া রাত্রি পোহাই। কিম্বা 'বিতুজন লোঅ তোরে কণ্ঠ ন মেলই'। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তোমাকে কণ্ঠ (সম্ভোগ চক্র) হইতে বিচ্ছিন্ন করেন না। অনুরূপ 'কণ্ঠে নৈরামণি বালি জগন্তে উপাড়ি'।—ইত্যাদি।

চর্যাপদগুলির মধ্যেকার এই শবরী, ডোম্বিনী, ডোম্বী, চণ্ডালী, যোগিনী, নৈরামণি-ই তন্ত্রোক্ত শক্তি। বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থগুলির মধ্যে এই শক্তির উদ্ভব ও উর্ধ্বে গমন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। বিভিন্ন আলোচনা হইতে এই কথাই প্রতীয়মান হয় যে অন্তত তত্ত্বের দিক দিয়া এই চণ্ডালী বা ডোম্বী, শবরী ইত্যাদি দেহধারী সাধন সঙ্গিনী নহেন—ইঁহারা দেহমধ্যস্থ শক্তিরই বিভিন্ন নাম মাত্র। প্রজ্ঞা ও উপায়কে অবধূতী মার্গে প্রথম মিলিত করিবার মুহূর্তে মণিমূলে জাগ্রত এই শক্তিই চণ্ডালী, ডোম্বী ইত্যাদি নামে অভিহিত। ইনিই আবার যখন সম্ভোগ চক্রে অবস্থিত হন তখন বেশীর ভাগ চর্যাতেই নৈরামণি বা নৈরাত্মা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। আবার মহাসুখ চক্রে উন্নীত হইয়া ইনিই হইয়াছেন—সহজ সুন্দরী। এই শক্তি তন্ত্রমতে শিবের গৃহিনী এবং বৌদ্ধতন্ত্রে এই সহজ-সুন্দরী-নৈরামণি বজ্রসত্ত্বের গৃহিনী হইলেও কাব্যের মধ্যে ইনি অনেক স্থানেই সিদ্ধিকামী তান্ত্রিকের প্রেমিকা বা সাধন সঙ্গিনী হিসাবে কল্পিত হইয়াছেন। অবশ্য তত্ত্বের দিক দিয়া তন্ত্রের মধ্যে এরূপ প্রেমের পরিকল্পনা না থাকিলেও পরবর্তীকালে ইহার আগমন অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু প্রেমের রূপক এবং চিত্রাদির বর্ণনা হইতে অনেকে মনে করেন তন্ত্রোক্ত শক্তি 'চণ্ডালী' ক্রমে বাস্তবের সাধন সঙ্গিনীতে পরিণত হইয়া গিয়াছিলেন।[১] বৌদ্ধ তন্ত্রে (হেবজ্রতন্ত্র) মন্ত্র উপাদান প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—অধিকারী ভেদে মন্ত্র বিভিন্ন; সুতরাং মন্ত্র নিরূপণের জন্য কুল নির্ণয়ের প্রয়োজন। বৌদ্ধতন্ত্রের পঞ্চ কুল—বজ্র, পৃথ, কর্ম, তথাগত ও রত্ন। ইহাদের আবার অন্য

১ দ্রঃ চর্যাপদের ধর্মমত : ডাঃ সুকুমার সেন। ভারত সংস্কৃতি—পৃঃ ২৯৬

নামও ছিল—ডোম্বি, নটী, রজকী, ব্রাহ্মণী, চণ্ডালী। কুলের এই বিভিন্ন নামকরণ সাধন-সঙ্গিনীর পর্যায়ভেদ হইতেও হওয়া অসম্ভব নহে—অথবা হয়ত এই নামগুলি কুল ভেদে সাধন সঙ্গিনী ভেদের কথাই সূচিত করে।[১] সে যাহাই হউক, পূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি—তন্ত্রের শক্তি পরিকল্পনা বিকৃত হইয়া রক্ত মাংসের দেহধারী সাধন সঙ্গিনীতে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা অসম্ভব নাও হইতে পারে যে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ক্ষেত্রেও অনেকের বাস্তব সাধন সঙ্গিনী ছিল—এবং যে সমস্ত পদের মধ্য দিয়া এই প্রেম, সুরত ইত্যাদির কথা উল্লিখিত হইয়াছে—(১৮, ১৯, ২০ ইত্যাদি) সেগুলি তাহারই ছায়া বহন করে। অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে—ইহা তত্ত্বের দিক দিয়া সমর্থিত ছিলনা।

চর্যাপদগুলির মধ্যে—'মহাসুখের'ও সুন্দর বর্ণনা আছে। মহাসুখ আনন্দময় অবস্থা। প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলিতাবস্থাতেই মহাসুখের উদ্ভব। বোধিচিত্ত যখন নির্মান চক্রে অবস্থান করে তখন যে আনন্দলাভ হয় তাহা শুধু আনন্দ।[২] বোধিচিত্তের ধর্মচক্রে উপস্থিতিতে যে আনন্দ তাহার নাম পরমানন্দ, সম্ভোগচক্রে উপস্থিতিতে বিরমানন্দ এবং মহাসুখ চক্রে সহজানন্দ।[৩] এই মহাসুখ বা সহজানন্দে যোগীর

---

১ চণ্ডীদাসের রজকিনী—সাধনসঙ্গিনী এবং সম্ভবত সাধনার কুল জ্ঞাপকও বটে।—বাঙ্গালীর ইতিহাস, ডাঃ নীহার রঞ্জন রায় পৃঃ ৬৩৯

২ ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচি মহাশয় প্রথম আনন্দকে 'প্রথমানন্দ' বলিয়াছেন।

৩ ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় ইহাকে বিচিত্রানন্দ, বিপাকানন্দ, বিরমানন্দ, সহজানন্দ এই ভাবে ভাগ করিয়াছেন। বোধিচিত্তের উৎপত্তির পর চিত্তের বিভিন্নাবস্থার মধ্য দিয়া গমনের জন্য চারিটি মুদ্রা আছে—কর্মমুদ্রা, ধর্মমুদ্রা, মহামুদ্রা, সময়মুদ্রা। ইহার সহিত চারিটি মানসিক অবস্থা বা ক্ষণের ও বর্ণনা আছে—বিচিত্র, বিপাক, বিমর্দ এবং বিলক্ষণ। ডাঃ সেন মহাশয় সম্ভবতঃ ইহার সহিত যুক্ত করিয়া আনন্দের শ্রেণীবিভাগে উক্ত নামকরণ

কিরূপ অবস্থা হয় তাহার দীর্ঘ বর্ণনা বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে ; এই মহাসুখের অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি যেন ঘুমাইয়া পড়ে, মন যেন অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সমস্ত চেষ্টা নষ্ট হয়, দেহ যেন মহাসুখে মূর্চ্ছিত হয়।[১] এই অবস্থায় উপনীত হইলে সমস্ত মায়িক জগতের উপলব্ধি নষ্ট হয়, আত্মপর ভেদ থাকেনা, ভবমোহ বিলুপ্ত হয়, শূন্যতা জ্ঞান লাভ হয়। সাধক তখন প্রমত্তের মত অবস্থান করেন। চর্যার মধ্যেও আমরা পাই—

ঘুমই ন চেবই স পর বিভাগা।
সহজ নিদালু কাহ্নিল লাঙ্গা॥
চেঅণ ণ বেঅণ ভর নিদ গেলা।
সঅল মুকল করি সুহে সুতেলা॥' (৩৬)

কাহ্নু সহজ নিদ্রায় অভিভূত—তিনি আত্মপর বিভাগ করিতেছেন না। তাহার চেতন বেদন কিছুই নাই ; সমস্ত হইতে মুক্ত হইয়া তিনি সুখে নিদ্রাভিভূত আছেন।

চিঅ সহজে সুন সংপুন্না
কান্ধ বিয়োএ মা হোহি বিসন্না॥ (৪২)

চিত্ত সহজ দ্বারা শূন্য সম্পূর্ণ, স্কন্ধ বিয়োগ দ্বারা আর বিষণ্ণ হইও না।

কাহ্নু বিলাসঅ আসব মাতা।
সহজ নলিনি বণ পইসি নিবিতা॥ (৯)

করিয়াছেন। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'শ্রীকালচক্রতন্ত্র,' 'হেবজ্রতন্ত্র' ইত্যাদি হইতে নজির তুলিয়া আনন্দ, পরমানন্দ,বিরমানন্দ এবং সহজানন্দ, এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন।

১ ইন্দ্রিয়ানি স্বপন্তীব মনোঽন্তর্বিশতীবচ।
নষ্ট চেষ্ট ইবাভাতি সৎসুখ মূর্চ্ছিতঃ। (ব্যক্তভাবানুগত তত্ত্বসিদ্ধি) Obscure Religious Cults পৃঃ ১২৭ এ উদ্ধৃত।

কাহ্নু সহজরূপ নলিনী বনে প্রবেশ করিয়া আসব মত্তের মত বিলাস করিতেছেন।

মহারসপানে মাতেলরে তিহুঅণ সএল উএখী।
পঞ্চ বিসঅ নায়করে বিপখ কোবি ন দেখি॥ (১৬)

মহারস (সহজানন্দ) পানে মত্ত চিত্ত, ত্রিভুবনে সকল উপেক্ষা করে; পঞ্চ বিষয়ের নায়ক হইয়া অর্থাৎ নিজেই বজ্রসত্ত্ব হইয়া কাহাকেও শত্রু দেখে না।

উইএ গঅণ মাঝেঁ অদভূআ।
পেখরে ভুসুকু সহজ সরুআ॥
জাসু সুণস্তে তুটই ইন্দিআল।
নিহুরে নিঅমন দে উলাস॥ (৩০)

গগনে আশ্চর্য সহজানন্দ উদিত হইয়াছে, দেখ ভুসুকু সহজ স্বরূপ। ইহা দেখিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়জাল ছিন্ন হয়, মন আনন্দে মত্ত হয়।—এরূপ উদাহরণ চর্যাপদে প্রচুর পাওয়া যায়।

গোপনীয়তা সমস্ত তান্ত্রিকতত্ত্ব ও সাধন পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ এবং বৈশিষ্ট্য। তান্ত্রিকদের তত্ত্ব অতিগুহ্য; বাহিরের অদীক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট ইহা অপ্রকাশ্য এবং দুর্বোধ্য। কেবল মাত্র দীক্ষিত সাধকই প্রতি পদে সদ্ গুরুর প্রসাদে এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। তন্ত্রে তাই গুরু বাদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এমনকি গুরুর বচনই ইহাদের নিকট তত্ত্ব। এই গুরুবাদ প্রাধান্যের কথা চর্যাপদগুলির সর্বত্র। তত্ত্বের কথা, পদ্ধতির কথা সবই আছে কিন্তু সর্বোপরি আছে, গুরুর উপর নির্ভর করিবার কথা। 'লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান'—লুই বলিতেছে গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জান। 'জই

তুম্হে লোঅ হোইব পারগামী। পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তর সামী ॥ (৫)' যদি তোমরা কেহ পারগামী হও অনুত্তর স্বামী চাটিলকে জিজ্ঞাসা কর। এই গুরু আবার বজ্রযানের প্রভাবে—বজ্রগুরু হইয়াছেন—'বাজুলে দিল মো লক্‌খ ভণিআ' (৩৫)—বজ্রগুরু আমাকে লক্ষ্য বলিয়া দিয়াছেন। এরূপ গুরু প্রাধান্যের কথা চর্যাপদে এত প্রচুর পরিমাণে আছে যে—বিস্তারিত উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন।

॥ চার ॥

চর্যার সাধক কবিদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

এতক্ষণ আমরা চর্যার ধর্মমত অর্থাৎ তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব —বিবর্তন—ও তাহার সাধন পদ্ধতি ইত্যাদির আলোচনা করিয়াছি। চর্যার ধর্মমত স্বরূপে যাহাই হউক এবং ইহার সাধন পদ্ধতি তান্ত্রিকই হউক আর যাই হউক—ইহাদের ধর্মের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি'ও ছিল। মধ্যযুগের সাধনায় সমন্বয়ের কথা স্মরণ রাখিয়া অনুসন্ধান করিলে এই তান্ত্রিক মতের সহিত অন্যান্য মতের কিছু সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যাইবে—এবং অন্যান্য কিছু কিছু ধর্মের প্রভাবও যে ইহার উপর না পড়িয়াছিল তাহা নহে। এই সমন্বয় ও সাদৃশ্যের মূল কারণ চর্যার সাধকদের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে চর্যার সাধকেরা ছিলেন 'সহজিয়া'। সহজিয়াকে কোন ধর্মসম্প্রদায় না বলিয়া ধর্মসম্পর্কে একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিই বলা উচিত। আনুমানিক অষ্টম নবম

শতাব্দী হইতে সমস্ত মধ্যযুগ ধরিয়া বাঙলা দেশের বিবর্তিত—বৌদ্ধ ধর্ম, কৌলধর্ম, নাথ পন্থ, সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম ইত্যাদি সকল মত ও পথের মধ্যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে যেমন সাদৃশ্য ছিল তেমনি সাদৃশ্য ছিল ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। সকলেই ছিলেন অল্প বিস্তর সহজিয়া। যদিও সহজিয়া বলিতে সাধারণ প্রচলিত অর্থে অনেক সময়ই কেবল মাত্র বৈষ্ণব সহজিয়াদিগকেই বোঝায়।

অন্যান্য সহজিয়াদের মত বৌদ্ধ সহজিয়াদের দৃষ্টি ভঙ্গিরও প্রধান বৈশিষ্ট্য—ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান রীতি নীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী মনোভাব। তাঁহাদের মতে পরমসত্য লাভ আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি পালন অথবা জপতপ-ধ্যান-ধারণা—জ্ঞান চর্চা ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, পরমসত্য কেবল মাত্র সহজ তত্ত্বে দীক্ষা ও যোগাভ্যাসের মধ্য দিয়া অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। যোগ্যভ্যাসই মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সহজ-পন্থা কারণ কঠিন সংযম পালনের মধ্যে যে অস্বাভাবিকতা আছে তাহা মানুষকে রোগগ্রস্ত করিয়া তোলে। সহজিয়ারা মানুষের সহজ স্বভাবকে পীড়িত না করিয়া স্বভাব সম্মত পন্থাতেই সত্যোপলব্ধির নির্দেশ দান করিয়াছেন। অবশ্য তাই বলিয়া ইহাদের মধ্যে যে নৈতিকতার অভাব ছিল একথা মনে করিবার কারণ নাই। সহজিয়ারা মানবিক বৃত্তির উপরই ধর্মসাধনার পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন, এ কথার অর্থ এই যে তাঁহারা স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে অবদমিত করিয়া ধ্বংস না করিয়া তাহাদের রূপান্তর ও উদ্‌গতির (Sublimation) কথা বলিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহারা 'সহজিয়া'। তাঁহাদের ধর্মমত একদিকে যেমন সহজ অর্থাৎ সরল অন্য দিকে জীবনের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত তাই সহ-জ

অর্থাৎ জন্মগত। চর্যাপদগুলির মধ্যেও এই প্রতিবাদের মনোভাব, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে বিতৃষ্ণা এবং সহজ পথের প্রতি আসক্তি লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তোরে ঝাণ বাখাণে।
অপইঠাণ মহাসুহলীলে দুলক্‌খ পরম নির্বাণে॥ (৩৪)

মন্ত্রে তন্ত্রে ধ্যান ব্যাখ্যানে কিছুই হয় না। মহাসুখলীলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে পরম নির্বাণ লাভ হয় না।

সঅল সমাহিঅ কাহি করি অই।
সুখ দুখেতে নিচিত মরি আই॥ (১)

সকল সমাধি দ্বারা কি হইবে—সুখ দুঃখেতে নিশ্চিত মরিবে।—এই সমস্ত জপতপ তন্ত্র, মন্ত্র, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি নানা প্রকার অনুষ্ঠানের বক্র পথের প্রয়োজন নাই—সহজ ঋজুপথ গ্রহণ কর। বোধি নিকটেই আছে; তাহার জন্য আবর্তিত পথেরও প্রয়োজন নাই—দূরে যাইবারও প্রয়োজন নাই।—যাহারাই এই সহজ পথে গিয়াছেন তাহারাই মুক্তির পরপারে গিয়াছেন। 'উজুরে উজু ছাড়ি মা লেহুরে বাঙ্ক।' 'জে জে উজুবাটে গেলা, অনাবাটা ভইলা সোই।' সহজ পথই যখন ইহাদের কাম্য এবং আচার অনুষ্ঠানে বিতৃষ্ণাই যখন ইহাদের স্বভাব তখন জ্ঞান চর্চার পথও ইহাদের পথ নহে। বস্তুত সহজ স্বরূপ স্ব-সম্বেদ্য; আগমবেদ পুথি পাঠ ইত্যাদির মধ্য দিয়া তাহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না তাই তাহার কোন সার্থকতাও নাই।

জাহের বাণ চিহ্ন রূব ণ জাণী।
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী॥ (২৯)

যাহার (সহজের) বর্ণ চিহ্ন রূপ জানা যায় না তাহার কথা আগমবেদ

ইত্যাদিতে ব্যাখ্যা করে কি করিয়া? অথবা—

জো মণ গোঅর আলজালা।
আগম পোথী ইষ্ট মালা॥
ভণ কইসে সহজ বোল বা জাঅ।
কাআ বাক চিঅ জসু ণ সামাঅ॥ (৪০)

আগম পুথি ইষ্টমালা এবং সকল মনগোচর অর্থাৎ ইন্দ্রিয় স্পষ্ট বিষয়াদি ইন্দ্রজালতুল্য। সহজের ব্যাখ্যা করা যায় না। কায় বাক্ চিত্ত কিছুই তাহাতে প্রবেশ করে না।

সহজিয়াদের আচার-অনুষ্ঠান-বিরূপতা ও প্রতিবাদের মনোভাব অবশ্য বাঙলা দেশের একটি বিশিষ্ট যুগেই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে—ইহা কোন বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের নিজস্ব মনোভাব নহে। ইহা তৎকালীন নানা ধর্মসম্প্রদায়ের সাধারণ মনোভাব। শুধু বাঙলা দেশেই নহে বাঙলার বাহিরেও এই মনোভাব জৈনদের পাহুড় দোহা, কবীর ইত্যাদির পদাবলীর মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। এক হিসাবে দেখিতে গেলে ইহা ভারতীয় মনোভাবেরই বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় ধর্ম্মান্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিলে বিবর্তনের কারণ হিসাবে এই প্রতিবাদের মনোভাবই দৃষ্ট হইবে। সংহিতা ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগের সহজযানের উৎপত্তি পর্যন্ত সর্বত্রই সেই প্রতিবাদের মনোভাব।

অবশ্য 'সহজ' সম্পর্কে এই নেতিমূলক দিক ছাড়াও সহজিয়াদের সহজ সম্পর্কে একটি ইতিমূলক মনোভাবও ছিল। সহজিয়াদের মতে পরম সত্যের স্বরূপই—'সহজ'। এই সহজের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রায় উপনিষদের ব্রহ্মের ধারণার তুল্য। কিন্তু

তাহার সহিত মিলিয়া গিয়াছে আরও অনেক রূপ ও স্বরূপ। সহজ স্ব-সম্বেদ্য, অবর্ণনীয়, অনির্বচনীয়; ইনিই নির্বাণ, তথতা; ইনিই চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত পরম সত্য—ইনিই যাবার বিজ্ঞপ্তি মাত্রতা। ইনি একদিকে বজ্রসত্ত্ব অন্যদিকে আবার শূন্যতা করুণার মিলিত অবস্থা—মহাসুখ। সহজের পরিকল্পনায়—এইরূপ বহুযুগের ধ্যান ধারণার সম্মিলন লক্ষ্য করা যায়। এই সহজই সাধকদের মতে—সমস্ত কিছুর কর্তা, ধাতা, চরম সত্য, পরম লক্ষ্য—শেষ সিদ্ধি।

৬ ॥ চর্যাপদের দার্শনিক পটভূমি ॥

॥ এক ॥

ভূমিকা : মূল দার্শনিক ভিত্তি

চর্যাপদগুলি আবিষ্কৃত হইবার পর একদিকে যেমন ইহার ভাষার-স্বরূপ এবং রচনা কাল লইয়া নানা মতভেদের উদ্ভব হয় অন্যদিকে তেমনি ইহার ধর্মমত এবং দার্শনিক পটভূমিকা সম্পর্কে নানা আলোচনার সূত্রপাত হয়। আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমেই ইহার বৌদ্ধ স্বরূপটির কথা উল্লেখ করেন এবং প্রথম প্রকাশের সময় হইতেই "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা" এই নাম দিয়া অন্য তিনটি গ্রন্থের সহিত চর্যাপদকেও প্রকাশ করেন। ইহার পর হইতে চর্যাপদ সম্পর্কে যত আলোচনা হইয়াছে তাহাতে চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব ও দার্শনিক ভিত্তিভূমি সম্পর্কে ধারণাটি স্পষ্ট হইয়াছে এবং সকলেই প্রায় ইহার মূল কাঠামোটির বৌদ্ধ-স্বরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।[১] ভাষার দুর্বোধ্যতার জন্য ইহার মূল তত্ত্বটি সহজ

---

১ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চর্যাপদগুলির ভাষার দিকে মূলতঃ আলোচনা করিলেও ইহাদের ধর্মীয় দার্শনিক দিক সম্পর্কেও মন্তব্য করিয়াছেন—"These specimens consist of 47 songs, called 'Carya-padas' or 'Caryas' composed by teachers, Siddhas of the Sahajiya sect, which was an off shoot of the Tantrika or late Mahayana Buddhism. [O. D. B.L. p. 110] ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচি মহাশয় ও তাঁহার "বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য", "Studies in the Tantras" ইত্যাদি গ্রন্থেও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছে। ডাঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিও অনুরূপ

বোধ্য না হইলেও—ইহার মধ্যে কোন দার্শনিক মতবাদ নাই অথবা তাহা একেবারে দুর্বোধ্য একথা বলা চলে না। ১অবশ্য একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে—এই সহজিয়া সাধকেরা বৌদ্ধই হউন আর হিন্দুই হউন—তাঁহারা তান্ত্রিক সাধক। তাই তন্ত্রের সাধারণ রীতি অনুযায়ী তাহাদের সাধনায় ধর্মের লক্ষ্যে পৌছিবার কার্যকরী পন্থাগুলির দিকে বেশী করিয়া নজর দেওয়া হইয়াছে—কোন দার্শনিক মতবাদে পৌছিবার ঝোঁক বিশেষ ইঁহাদের নাই। কিন্তু তন্ত্রেও যেমন এখানেও তেমনি দার্শনিক মতবাদে পৌছিবার ঝোঁক বিশেষ না থাকিলেও একেবারে নাই একথা বলা চলে না। চর্যাপদগুলির মধ্যে যে দার্শনিক তত্ত্ব আছে তাহা অনতিলক্ষ্য হইলেও দুর্লক্ষ্য নহে এবং বিশ্লেষণ করিয়া তাহা আলোচনা করিবার সময় স্মরণ রাখা কর্তব্য তাহার মূল কাঠামোটি বৌদ্ধ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত।' এই কথাটি স্মরণ রাখিয়াই আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে এবং প্রসঙ্গ ক্রমে আলোচনা করিতে হইবে অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের সহিত ইহার সাদৃশ্যই বা কতখানি এবং সে সাদৃশ্যের কারণই বা কি?

ভারতীয় সাধনায় সর্বত্রই ঐক্য ও সমন্বয়ের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধ, জৈন, বেদান্ত, সাংখ্য ইত্যাদি সমস্ত দার্শনিক মতবাদগুলিতেই ইহাদের মূলগত ঐক্যের ভাবটি সহজেই ধরা পড়ে। ভারতীয় সমস্ত দার্শনিক মতবাদগুলিই দার্শনিকতাকে শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবী-আনন্দের উপাদান হিসাবে গ্রহণ না করিয়া জীবনচর্যায়

মতাবলম্বী। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় কিন্তু চর্যার দার্শনিক স্বরূপটি সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ নহেন। (দ্রঃ চর্যাপদের ধর্মমত, ভারত সংস্কৃতি) । ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া সমস্ত সন্দেহ নিরসন করিয়াছেন।

উন্নতির প্রধান উপায় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমস্ত দার্শনিক মতবাদেই জগৎ দুঃখময় ও অশান্তিজনক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই দুঃখবাদ হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমস্ত দার্শনিক মতগুলির উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু দুঃখবাদ হইতে উদ্ভূত হইলেও সকলেই পরিণতিতে একটি সনাতন ন্যায়নীতি (Eternal moral order) এবং ধর্মে বিশ্বাসী, তাই শেষ পর্যন্ত সকলেই চরম সুখের পরিকল্পনাতেই তাহাদের মতের পরিণতি নির্দেশ করিয়াছেন।[১] এই দিক দিয়া ভারতীয় সমস্ত দার্শনিক মতগুলিই যেন বৌদ্ধ ছাঁচে ঢালা। বুদ্ধদেবের—দুঃখ—দুঃখসমুদয়— দুঃখনিবৃত্তি— দুঃখ নিবৃত্তির উপায়— এই চারিটি আর্যসত্য যেন নানা প্রকারে বিভিন্ন দর্শনের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত দার্শনিক মতবাদেই আবার ভবদুঃখের কারণ হিসাবে অজ্ঞান (বা অবিদ্যা, বা মায়া) ইত্যাদিকে নির্দেশ করা হইয়াছে এবং এই ভবদুঃখের নিবৃত্তির উপায় হিসাবে—জ্ঞান, ধ্যান, সংযম ইত্যাদি পন্থার নির্দেশ করা হইয়াছে এবং এই উপায়গুলির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত মুক্তির আশাও করা হইয়াছে। শুধু যে দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যেই মূলগত ঐক্য বিদ্যমান তাহা নহে—বরং বলা চলে দার্শনিক মতবাদগুলির মূলগত ঐক্য থাকিলেও বাহ্যিক পার্থক্য আছে—কিন্তু ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে এই ঐক্যের মনোভাবটি ভিতরে বাহিরে সর্বত্র সুস্পষ্ট। সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে যতই মতবিরোধ এবং তর্কযুদ্ধ থাক না কেন, সাধনার ক্ষেত্রে সর্বত্র একটি আশ্চর্য মিল রহিয়াছে। দেশকালের ব্যবধান বা কোন সম্প্রদায়গত ভেদ এই মৌলিক ঐক্যকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের

১ দ্রষ্টব্য রাধাকৃষ্ণণের 'Indian Philosophy' Vol I pp 49-50.

সাধনপদ্ধতি সমগ্রভাবে আলোচনা করিলে মনে হয়, স্বরূপ উপলব্ধির একটি প্রয়াসই যেন কালে কালে সমগ্র ভারতবর্ষের গণমানসের ভিতর দিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন মতের সহিত মিশ্রিত হইয়া এই সাধনার পথগুলি আপাত দৃষ্টিতে যতই পৃথক পৃথক বলিয়া মনে হউক, একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলেই ইহাদের মৌলিক ঐক্য স্পষ্ট হইয়া উঠে। তাই উপনিষদের সাধনা, গীতার সাধনা, বেদান্তের সাধনা, বৈষ্ণবের সাধনা, তন্ত্রের সাধনা, সহজিয়াদের সাধনা, নাথযোগী, বাউল, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাধনা সকলের ভিতর রহিয়াছে একটি গভীর ঐক্য।[১]

ভারতীয় দর্শনের এবং সাধনার এই মূলগত ঐক্য কোন বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের কাব্য সাধনার পশ্চাতে মূল দার্শনিক ভিত্তি ভূমিটি আবিষ্কারের পথে একটি প্রধান বাধা। বিশেষত এই ধর্মসাধনা যখন সাধারণ লৌকিক ধর্মসাধনা তখন তাহাতে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সংমিশ্রন ও সমন্বয় আরও স্বাভাবিক। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যেমন ধর্মসাধনা বিষয়ে শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ইত্যাদির চুলচেরা বিভাগ নাই, দার্শনিক বা তাত্ত্বিক দিকেও তেমনি যুক্তির পার্থক্য থাকিলেও একটি মতবাদ অন্যটির দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হইয়াছে। তাই দেখি নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বৌদ্ধধর্ম যত পতনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল তত বেশী করিয়া ইহা হিন্দু মতবাদগুলির দ্বারা প্রভাবিত হইতেছিল। অবশ্য এই প্রভাব উভয় পাক্ষিক, হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—বৌদ্ধেরাও

১ 'ভারতীয় সাধনার ঐক্য'—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের—'ভারতের সাধনা'।

বিষ্ণুকে বোধিসত্ত্ব-পদ্মপাণি-অবলোকিতেশ্বর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই একাকারের পথে অনেক স্থানেই বুদ্ধমূর্তি শিব, জগন্নাথ ইত্যাদিতে পরিণত হইয়া হিন্দু হইয়া গিয়াছেন।[১] মূললক্ষ্য এবং উৎপত্তিস্থান যখন সকলেরই প্রায় এক তখন এই পারস্পরিক প্রভাব খুবই স্বাভাবিক। সত্যোপলব্ধির কেন্দ্র হইতে যখন ইহা সাধনার অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে চলিয়া আসিয়াছে—তখন এই একাকার তো আরও স্বাভাবিক।

এই ঐক্য ও সমন্বয়ের সুরই—চর্যাপদগুলির দার্শনিক পটভূমিটির স্বরূপ নির্ণয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। অন্যদিকে চর্যাপদগুলি আবার গুহ্য-যোগী তান্ত্রিক সাধকদিগের সাধনার ধারা বহন করে। তন্ত্র হিন্দুই হোক আর বৌদ্ধই হউক ইহার বক্তব্য সর্বত্রই এক। সুতরাং এই দিক দিয়াও চর্যাপদের দার্শনিকতার স্বরূপ হিন্দু কি বৌদ্ধ তাহা নির্ণয় করা কষ্টকর। এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে চর্যা যে-যুগে রচিত হইয়াছিল তাহা বাংলা দেশের ধর্মসাধনায় সমন্বয়ের যুগ—পালযুগ। আবার অন্য দিকে চর্যাপদগুলি যাহাদের জন্য রচিত হইয়াছিল তাহাদের কথা বিচার করিয়াও ইহার মধ্যে তত্ত্বের দিকে সমন্বয় ও সংমিশ্রণের একটি উদ্দেশ্য খুজিয়া পাওয়া যায়।[২] অতি সাধারণ জনসম্প্রদায়ের জন্য রচিত এই চর্যাপদগুলিকে জনসাধারণের বোধগম্য সহজ, সরল করিবার জন্য চর্যায় কোন বিশিষ্ট

১ রাধাকৃষ্ণণ Indian philosophy Vol I p 607 দ্রষ্টব্য।

২ দ্রঃ 'মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ' (পৃঃ ১৬—১৯): ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দার; এবং 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' ১ম খণ্ড—শ্রীগোপাল হালদার।

মতবাদের কড়াকড়ি না থাকাই স্বাভাবিক। একটি বিশিষ্ট মতবাদের কাঠামোর উপর বিভিন্ন মতবাদের পলেস্তারা চাপাইয়া একটি সহজ-বোধ্য সমন্বিত মতবাদ সৃষ্টিও চর্যাকারদের পক্ষে স্বাভাবিক। চর্যার দার্শনিক মতবাদের স্বরূপ সম্পর্কে সুতরাং এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে হয় যে বৌদ্ধ দর্শনের কাঠামোর উপরই কাল, পারিপার্শ্বিক, উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনে অন্য মতবাদের কিঞ্চিৎ আবরণ বা সাদৃশ্যের ছাপ লইয়া ইহা গঠিত।

(চর্যাপদে বর্ণিত দার্শনিক মতবাদের মূল কাঠামোটি যে বৌদ্ধ দর্শনের তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কতকগুলি চর্যায় সাধারণ বৌদ্ধ ধ্যানধারণার প্রকাশ হইতে। প্রথম চর্যাতেই কায়াকে তরুবর বলিয়া তাহার পাঁচটি শাখার কল্পনা করা হইয়াছে। এই পাঁচটি শাখা বৌদ্ধ পঞ্চস্কন্ধ [রূপাদয়ঃ পঞ্চ স্কন্ধাঃ—টীকা]। এই অংশটিতে বৌদ্ধদর্শনের নৈরাত্মবাদের আভাস পাওয়া যায়। বৌদ্ধ দর্শনে আত্মা মানা হয় না বলিয়া তাহাকে নৈরাত্ম দর্শন বলা হয়। যেমন পদ্ম বলিতে দল, ডাঁটা মৃণাল ইত্যাদির সমাবেশ বোঝায় অন্য কিছুই বোঝায় না, তেমনি আত্মা বলিতে কোন স্বতন্ত্র বস্তুকে বোঝায় না। কতকগুলি চিত্তবৃত্তির একত্র সমাবেশই আত্মা বা আমির ভ্রম জন্মায়। ইহা হইতেই বৌদ্ধদের স্কন্ধ বাদের উৎপত্তি। সমস্ত শারীরিক ও মানসিক অবস্থা,—রূপ [শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় প্রভৃতি একত্রে] বেদনা, [সুখ, দুঃখ, অসুখ দুঃখ], সংজ্ঞা [জাতিরূপে বুঝিবার প্রণালী], সংস্কার [পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতা ইত্যাদি হইতে জাত মানসিক বৃত্তি] এবং বিজ্ঞান [বোধ],—এই স্কন্ধগুলির সমন্বয়। আবার দেহ এবং তাহা হইতে জাত আমিত্ব বোধও মূলত এই পঞ্চ স্কন্ধের সমবায় ছাড়া অন্য কিছুই নহে।

প্রথম চর্যাটিতেও বৌদ্ধধর্মের এই সত্যেরই স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। পঞ্চম চর্যাতেও

ভবনই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝে ণ থাহী॥

ইত্যাদি বলিয়া ভবসংসারকে নদীর সহিত যে তুলনা করা হইয়াছে তাহাতেও বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষণভঙ্গবাদের আভাস পাওয়া যায়। বৌদ্ধ দর্শন কোন কিছুর স্থায়ী অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সমস্ত কিছুই প্রতি মুহূর্তে প্রতি অংশে পরিবর্তিত হইতেছে। নদীর প্রবাহে প্রতিটি জলকণা প্রত্যেকে একে অন্য হইতে পৃথক—এবং প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল ; তবুও নিয়ত পরিবর্তনশীল সেই স্বতন্ত্র জলকণা সমূহের প্রবাহে যেমন নদীর ধারণার উৎপত্তি সেইরূপ—নিয়ত পরিবর্তনশীল স্বতন্ত্র ধর্ম ও সংস্কারের প্রবাহেই ভবের অস্তিত্ববোধ। দ্বিতীয় পংক্তিতেও বৌদ্ধ দর্শনের 'মধ্যমা প্রতিপদে'র পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব দুই চরম পন্থা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—অর্থাৎ চরম ভোগ বা পরম কৃচ্ছ্রসাধন কোনটিকে গ্রহণ না করিয়া—মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এখানে অবশ্য যে মধ্যপথের কথা বলা হইয়াছে তাহা ঠিক অনুরূপ মধ্য পথ নহে—তবে তাহা হইতেই জাত। শূন্যতা ও করুণার মিলিত মধ্য পথ এখানে উদ্দিষ্ট। "জে জে আইলা তে তে গেলা"—ইত্যাদি পদেও—বৌদ্ধ দর্শনের নিয়ত পরিবর্তনবাদের ইঙ্গিত। ইহা ছাড়াও প্রায় প্রতি পদেই—বোধি, সংবোধি, দশবল, তথাগত, শূন্য, করুণা, তথতা, স্কন্ধ, বুদ্ধ, হেরুক ইত্যাদি বৌদ্ধর্শনের স্বকীয় পারিভাষিক শব্দের এত প্রচুর ও অর্থপূর্ণ ব্যবহার পাওয়া যায় যে চর্যাপদের দার্শনিকতার মূল ভিত্তিটি যে বৌদ্ধ তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না।

॥ ২ ॥

চর্যাপদের মূল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি 'মায়াবাদী'

চর্যাগীতিগুলির মূল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিটি 'মায়াবাদী'। ইঁহাদের ধারণায় জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা—ইহার কোন সত্যকার অস্তিত্ব নাই। মায়া বা অবিদ্যা দ্বারা আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন বলিয়াই এই জগৎসংসারকে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই অজ্ঞান বা অবিদ্যা দূরীভূত হইলে, মায়ার প্রভাব তিরোহিত হইলে জগৎসংসারের মিথ্যাত্ব সম্পর্কে ধারণাটি সুস্পষ্ট হয়। জগৎ সংসারের স্বরূপ সম্পর্কে এই ধারণাটি বৌদ্ধদর্শনের মহাযানী সম্প্রদায়ের শূন্যবাদী ও বিজ্ঞানবাদীদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর যখন বৌদ্ধধর্ম নানা বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত হইয়া যাইতেছিল তখন বস্তুর স্বরূপ ও তাহা জানিবার উপায় এই দুই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করিয়া মূলতঃ চারিটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ইহার মধ্যে নাগার্জুন [১] প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমিক বা শূন্যবাদী এবং মৈত্রেয়-অসঙ্গ-বসুবন্ধু [২] প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানবাদী বা যোগাচারবাদীরাই মহাযান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। হীনযানী সৌত্রান্তিক

---

১ নাগার্জুন—খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের লোক ছিলেন বলিয়া প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অবশ্য ইঁহাকে প্রথম শতকের লোক বলিয়া মনে করেন দ্রঃ ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা (পৃঃ ১৩০)। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণও ইহাকে দ্বিতীয় শতকের লোক বলিয়া মনে করেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামতের জন্য ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের Indian Philosoply Vol 1 pp 643-644 পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২ মৈত্রেয় অসঙ্গ বসুবন্ধু—বিজ্ঞানবাদী দর্শনের উদ্গাতা হিসাবে এই তিনটি নাম একত্রে উক্ত হইলেও মৈত্রেয় সম্পর্কে মত বিরোধ আছে। "মৈত্রেয় নাথের ঐতিহাসিকতা এখনও নিঃসন্দেহে স্থির করা যায়নি।" (বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য—ডাঃ বাগচী পৃঃ ৩৭)। অসঙ্গ ও বসুবন্ধু দুই ভ্রাতা ছিলেন। ইহারা চতুর্থ পঞ্চম শতকের লোক।

ও বৈভাষিকেরা ঠিক মায়াবাদী নহেন বরং বলা চলে (যদিও পুরাপুরি আধুনিক অর্থে নহে) বাস্তববাদী। মহাযানীদের শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ মত দুইটিতে অনেক পার্থক্য থাকিলেও মূলে তাহারা উভয়েই মায়াবাদী।

শূন্যবাদীরা জাগতিক সত্তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ইহার কোন পারমার্থিক সত্তা নাই। বুদ্ধদেবের 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' (Theory of Dependent Causation) মতবাদকে গ্রহণ করিয়া ইঁহারা বস্তুর সত্তা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাহাকে ধর্ম্মনৈরাত্ম্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ কোনবস্তুর কোন নিজস্ব স্বরূপ বা ধর্ম্ম নাই। সকলেই অন্য কোন কিছুর উপর তাহার বর্তমান বাহ্যিক স্বরূপের জন্য নির্ভরশীল; এই দ্বিতীয় কোন বস্তুটি আবার অপর আর কোন বস্তুর উপর নির্ভরশীল। যাহার নিজস্ব স্বরূপই অন্যের উপর নির্ভরশীল তাহাকে আর সত্য বলা যায় না। কিন্তু ইহাকে আবার অসত্যও বলা যায় না, কারণ যাহা অসত্য তাহার কোন বাহ্যিক পরিদৃশ্যমান অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। আবার ইহাকে সত্য ও অসত্য উভয় কিম্বা সত্যও নহে অসত্যও নহে এই অনুভয়ও বলা চলে না—ইহাতে শুধু বাগ্‌জালই বিস্তৃত হয়। এইভাবে নেতি বাচক যুক্তির মধ্য দিয়া, চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত করিয়া নাগার্জুন সত্তার শূন্যতা প্রমাণ করিলেন। বস্তুর অসারত্ব অর্থাৎ ধর্ম নৈরাত্ম্য এবং আত্মার অসারত্ব অর্থাৎ পুদ্গল নৈরাত্ম্য—এই উভয়বিধ নৈরাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত থাকাই শূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত থাকা। সত্তার এই নৈরাত্ম্য সত্ত্বেও বহির্বস্তুর যে উপলব্ধি হয় তাহার কারণ তাহা অবিদ্যা বিক্ষুব্ধ চিত্ত চৈতসিকের সৃষ্টি (অর্থাৎ অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনের সৃষ্টি), তাহা কোন পরমার্থ সত্য নহে, তাহা সংবৃতি সত্যমাত্র।

বিভিন্ন উপায়ের মধ্য দিয়া নির্বাণ লাভ করিতে পারিলে পরমার্থ সত্য লাভ হয়। অবশ্য এই লোকোত্তর ইন্দ্রিয়াতীত পরমার্থ সত্য অবর্ণনীয়ও বটে।

বিজ্ঞানবাদীরা চিত্তকে অসৎ না বলিলেও বস্তু সত্তার অসারত্ব প্রসঙ্গে শূন্যবাদীদের সহিত এক মত। তাহাদের মতেও বাহ্যিক বস্তুজগতের কোন সত্যকার অস্তিত্ব নাই। বিজ্ঞানের পরিণামেই ত্রিজগতের উদ্ভব। যেমন স্বপ্নে অথবা মোহে মানুষ অস্তিত্বহীন বস্তু নিচয়ের কল্পনা করে ইহাও সেইরূপ। শূন্যতত্ত্বকে বিজ্ঞানবাদীরা কোন নেতিবাচক যুক্তির মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকেই তাহারা শূন্যতত্ত্ব বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ব্যক্তির নিকট বস্তুবিশ্বের ধ্যান ধারণা তাহার ব্যক্তিবিজ্ঞান হইতে উদ্ভূত হয়। এই ব্যক্তিবিজ্ঞান আবার বিধৃত আছে একটি সমষ্টি বিজ্ঞানে, বিজ্ঞানবাদীদের মতে তাহার নাম 'আলয় বিজ্ঞান'। এই আলয় বিজ্ঞানের মধ্যেই সমস্ত বস্তুজ্ঞান নিহিত আছে। (সর্বসাং ক্লেশিক ধর্মবীজ স্থানত্বাদ্ আলয়—সমস্ত সংক্লেশিক ধর্ম্ম, যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি, তাহার বীজ এখানে নিহিত থাকে বলিয়া ইহাকে আলয় বলা হয়।) মূলতঃ বস্তুজগৎ অসার কিন্তু ব্যক্তি বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত আলয় বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির ধারার সন্ততি বোধ জাত কালজ্ঞান, দেশজ্ঞান হইতেই বস্তু জ্ঞানের উদ্ভব। বিজ্ঞান অবিদ্যা বিক্ষুব্ধ হইলেই চিত্ত চৈতসিকরূপে নিজেকে ছড়াইয়া দেয় এবং সেই চঞ্চল চিত্তবৃত্তিই বস্তুজ্ঞান সম্ভব করিয়া তোলে। "অবিদ্যাজনিত বাসনা বিক্ষোভ নিরুদ্ধ হইলেই চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়।—চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে কাল নিরুদ্ধ হয় —কাল নিরুদ্ধ হইলে বস্তুজ্ঞান নিরুদ্ধ হয় এবং ধর্ম্ম নৈরাত্ম্যে ও পুদ্গল

নৈরাত্মে প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হয়।" [১] অর্থাৎ অনুশীলন ও সংযমের মধ্য দিয়া বাহ্য জগতের মিথ্যা অস্তিত্ব বোধের মোহ এবং ইহার প্রতি আসক্তি নষ্ট হয়।

শঙ্কর যদিও বিজ্ঞানবাদীদের মতবাদ (Subjective Idealism) এর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তবুও জগৎ সম্পর্কে শঙ্করের মতবাদ ও বিজ্ঞানবাদীদের মতবাদে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। উভয়েই জাগতিক সমস্ত সত্তাকে অসার প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদীরা সমস্ত সত্তাকে স্বপ্ন বা মোহের মত মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। —শঙ্কর সত্তাকে প্রাতিভাসিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক এই ত্রিবিধ ভাগে (সত্তা ত্রৈবিধ্য) বিভক্ত করিয়াছেন এবং সত্তার অস্তিত্ব-জ্ঞান রজ্জুতে সর্প ভ্রমের মত সর্বদা অলীক বা তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া না দিলেও প্রকৃত সত্য বলিয়াও স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক সত্তা যে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহার কারণ তাহারা প্রকৃত সত্য বলিয়া নহে,—তাহার কারণ অবিদ্যাই 'অধিষ্ঠান' (অর্থাৎ মূলস্বরূপ) সম্পর্কে অজ্ঞানতার ফলে 'আবরণ' ও 'বিক্ষেপের' দ্বারা রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় তাহাদিগকে প্রতিভাত করায় অর্থাৎ মায়ার প্রভাবেই বস্তুত অসার সত্তাও সার বা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই খানেই স্পষ্টতঃ শূন্যবাদ বিজ্ঞানবাদের সহিত বেদান্তের সাদৃশ্য। সকলেই জগৎ সংসারের অস্তিত্ব মায়া বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। [অবশ্য বেদান্তের অন্য দিকও আছে। ব্রহ্মসত্য

১ 'চর্যাপদে বর্ণিত দার্শনিকতত্ত্ব'—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। (জগজ্জ্যোতিঃ ৬ষ্ঠ বর্ষ ; ১ম সংখ্যা)

জগৎ মিথ্যা এই ধারণা ছাড়াও ঈশা দ্বারা বিধৃত বলিয়া জগৎ সত্য এই মতবাদও উপনিষদে আছে। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের এই দিকটিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় জনসাধারণ বেদান্তের মায়াবাদের দিকটিকেই গ্রহণ করিয়াছে। ঔপনিষদিক তত্ত্বের আনন্দবাদী দিকটিতে দৃষ্টি তেমনভাবে পড়ে নাই।]

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের সহিত বেদান্তের অন্য মিলের কথাও আলোচনা করা যাইতে পারে। শূন্যবাদ জগৎ সংসারের অস্তিত্ব অর্থাৎ সংবৃতি সত্যের অসারত্ব এবং পরামার্থ সত্যের অনির্বচনীয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বেদান্তেও অনুরূপভাবে প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক সত্যের অলীকত্ব তুচ্ছত্ব, এবং পরমার্থ সত্যের অনির্বচনীয়ত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে। শূন্যবাদীদের নির্বাণ পরিকল্পনাও বেদান্তের ব্রহ্মোপোলব্ধির সহিত তুলনীয়। বিজ্ঞান বাদীদের সহিতও বেদান্তের বস্তুর অসারত্ব বিষয়ক মত ছাড়াও অন্য দিকে সূক্ষ্ম মিল রহিয়াছে। বিজ্ঞান বাদীদের 'আলয় বিজ্ঞান'—সমস্ত বস্তুজ্ঞানের মূল। আবার অনির্বচনীয় স্বরূপে আলয়বিজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান স্বরূপ। পরমার্থ সত্যই যেমন এক হিসাবে প্রাতিভসিক ও ব্যবহারিক সত্যের আশ্রয়—আলয় বিজ্ঞানও সেইরূপ। শুধু তাহাই নহে, ''অনেকে সেই স্থায়ী আলয় বিজ্ঞানকে চিৎ স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপও বলিয়াছেন। বসুবন্ধুর বিংশিকা ও ত্রিংশিকা ইহার দৃষ্টান্তস্থল''।[১] "এইরূপ সচ্চিদানন্দ বস্তুগুলিকে যদি যদি মানিতে হয় তবে অদ্বৈত বেদান্তের সহিত ইহার পার্থক্য অতি অল্পই ঘটে। পরবর্তী কালে শঙ্করাচার্য যে অদ্বৈত বেদান্ত ব্যাখ্যা

১ দ্রঃ ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা : ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত পৃঃ ১৩৫।

করিয়াছেন মূলত: তাহা বসুবন্ধুর মতেরই একটা নূতন সংস্কর বলিয়া মনে হয়।"[১]

চর্যাপদের দার্শনিক তত্ত্বের মায়াবাদী স্বরূপটি বিভিন্ন উদ্ধৃতি সহযোগে উদাহৃত করিবার পূর্বে একটি বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। মায়াবাদ বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় দর্শনেই বিদ্যমান, সুতরাং পুনরায় প্রশ্ন ওঠে—চর্যাপদের দার্শনিক স্বরূপ, বিশেষ করিয়া ইহার মায়াবাদ—হিন্দু না বৌদ্ধমূল? এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বাধাগুলি ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। সেগুলিকে স্মরণ রাখিয়াও পূর্বের যুক্তি অনুসরন করিয়া বলা চলে এই মায়াবাদকে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পদকর্তারা যে সকল পারিভাষিক শব্দ ও সংজ্ঞা এবং যে উপমা রূপকল্পাদির ব্যবহার করিয়াছেন তাহা প্রায়শঃ বৌদ্ধদর্শনের সুতরাং সেই দিক দিয়া বলিতে হয় চর্যার মায়াবাদ বৌদ্ধ দর্শনের কাঠামোর উপরই প্রতিষ্ঠিত।

প্রথম চর্যাটি হইতেই আমরা চর্যা-দর্শনের মায়াবাদী স্বরূপটির পরিচয় পাই। 'চঞ্চল চীএ পইঠো কাল' বলিয়া চর্যাকারেরা জাগতিক সত্তার উৎপত্তির জন্য আমাদের চিত্তকেই দায়ী করিয়াছেন। অবিদ্যা বিক্ষুব্ধ চিত্তই কালজ্ঞান সৃষ্টি করে—এবং কালজ্ঞানই বস্তুজ্ঞান সম্ভব করিয়া তোলে। অর্থাৎ জগৎ সংসার মূলত মিথ্যা হওয়া সত্ত্বেও

১ দ্রঃ ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা: পৃঃ ১৪৭।

বিজ্ঞানবাদী, শূন্যবাদী ও বেদান্ত মতের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের Introduction to Tantric Buddhism এবং ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের Indian Philosophy Vol I pp 607, 641 এবং 702 দ্রষ্টব্য।

অবিদ্যা বিক্ষুব্ধ চিত্তে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। ৭ম চর্যাতেও অনুরূপ তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

তে তিনি তে তিনি তিণি হো ভিণ্ণা।
ভণই কাহ্ন ভব পরিচ্ছিন্না॥
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবনা গবণে কাহ্নু বিমণ ভইলা॥

তাহারা তিন, তাহারা তিন, তিনই ভিন্ন; কাহ্নু কহে সকলই ভব পরিচ্ছিন্ন। যাহারা যাহারা আসিল তাহারা তাহারা গেল, গতাগতিতে কাহ্নু বিমন হইল। অর্থাৎ তিন বা বহুরূপে যাহা পৃথক বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে তাহারা বস্তুত পৃথক বা স্বয়ং সম্পূর্ণ বস্তু নহে। একটি মিথ্যা অস্তিত্ব বোধের দ্বারা আমরা সকল কিছুকে পৃথক বা পরিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতেছি। এই ভবসংসারের অস্তিত্ব সংবৃতি সত্য মাত্র—কোন কিছুই এখানে স্থায়ী নহে, যাহারা আসে তাহারাই যায় —সকলই ক্ষণপরিবর্তনশীল—মূলত কিছুই সত্য নহে—আসাটাও নহে যাওয়াটাও নহে।

অষ্টম চর্যাতেও আমরা মায়াবাদের আভাস পাই—

সোণে ভরিতি করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥

(শূন্যতা স্বরূপ) সোনা দ্বারা করুণা-রূপ (চিত্ত-) নৌকাকে ভরিয়া লইয়াছে—তাই (রূপজগতের অস্তিত্ববোধের) রূপা রাখিবার ঠাঁই নাই। এখানেও পরোক্ষভাবে রূপজগতের অস্তিত্ব বোধের ধারণার অসারত্বই প্রতিপন্ন হইয়াছে। দশম চর্যাতেও সংসারকে নটপেটিকা (নড়পেড়া) অর্থাৎ মিথ্যা নাটকাভিনয়ের সাজ সজ্জার আধার অর্থাৎ

মূলতঃ অসার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পরবর্তী -আর একটি চর্যাতেও উক্ত হইয়াছে—

মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিতা।
অবশ করিআ ভব বল জিতা॥ (১২)

মতিদ্বারা ঠাকুরকে পরিনিবৃত্ত করিয়া, অচঞ্চল করিয়া, ভবের শক্তিকে জয় করা গেল। অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা দ্বারা ভবের অস্তিত্ব বোধরূপ মিথ্যা ধারণাকে জয় করা হইল। এই জগৎসংসার যে অনাদি অবিদ্যা জনিত মায়ার স্বপ্ন; নিদ্রাহীন (জাগ্রৎ) স্বপ্নের মত,—এই তত্ত্বটির স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি আছে ত্রয়োদশ সংখ্যক চর্যাতে—"নিংদ বিহণে সুইণা জইসো।" ২১ সংখ্যক চর্যাতে চঞ্চল চিত্ত পবনকে মূষিকের সহিত এবং রাত্রির অন্ধকারকে অজ্ঞানতার সহিত তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে যে এই মূষিকই ভবের অস্তিত্ব বোধ জাগায়, এই মূষিকই কালস্বরূপ (কালমুসা); এই মূষিককে হত্যা করিতে পারিলে ভব বন্ধন ছিন্ন করা সম্ভব। (জবে মুসাএর·আচার তুটঅ। ভুসুকু ভণএ তবে বান্ধন ফিটঅ ।। (২১))

ভব এবং নির্বাণ সম্পর্কে ধারণা যে মানুষ নিজেই করিয়া লয়, ইহাদের সত্যকার স্বরূপ যে মিথ্যা, তাহার অতি চমৎকার উল্লেখ আছে ২২ সংখ্যক চর্যাতে—

অপণে রচি রচি ভব নিববাণা।
মিছে লোঅ বন্ধাব এ অপণা॥
অম্হে ণ জানহুঁ অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥

জইসো জাম মরণবি তইসো।
জীবন্তে মইলে নাহি বিশেসো॥ (২২)

ভব এবং নির্বাণ সম্পর্কে ধারণা নিজেই সৃষ্টি করিয়া মিথ্যাই লোকে নিজেকে ভবসংসারে বদ্ধ করে। আমরা অচিন্ত্য যোগীরা জানিনা (জানিতে চাহিনা) জন্ম মরণ কিরূপে হয়। জন্মও যেমন মরণও সেইরূপ, জীবন্তে ও মৃতে কোন ইতর বিশেষ নাই। এই পদটির সাথে অনুরূপ আর একটি পদও লক্ষ্যণীয়—

ভাব ণ হোই অভাব ণ জাই।
অইস সংবোহে কো পতি আই;
লুই ভণই বট দুলক্‌খ বিণাণা।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ লাগে ণা।
জাহের বাণ চিহ্ন রূব ণ জানী।
সো কইসো আগম বেএঁ বখানী॥ (২৯)

তত্ত্বের দিক দিয়া পদটি পূর্ববর্তী পদটির অনুরূপ হইলেও ইহাতে বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় বিজ্ঞানবাদীদের স্পষ্ট প্রভাব। ভাব এবং অভাব অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব ইহার কিছুই সত্যও নহে অসত্যও নহে। সত্য একমাত্র এক দুর্লক্ষ্য 'বিজ্ঞান'। এখানে জগৎ সংসারের প্রাতিভাসিক রূপের পশ্চাতে দুর্লক্ষ্য বিজ্ঞান সত্যকে স্বীকার করা হইয়াছে। সাধারণ ভাবে বিভিন্ন পদের মধ্যে মায়াবাদ প্রকাশিত হইলেও পূর্বোক্ত পদটির মধ্যে বিজ্ঞানবাদী দর্শনের প্রভাব যেমন সুস্পষ্ট তেমনি আবার এরূপ পদও আছে যাহার মধ্যে শূন্যবাদীদের মতের প্রভাব বেশী করিয়া প্রকট।

আইএ অণু অণাএ জগরে ভাংতিএঁ সো পড়িহাই।
রাজসাপ দেখি জো চমকই সাঁচে কি তা বোড়ো খাই।
অকট জোইআরে মা কর হথা লোহ্যা।
অইস সভাবে যদি জগ বুঝসি তুটই বাসনা তোরা॥
মরুমরীচি গন্ধর্ব নঅরী দাপণ পড়ি বিম্বু জইসা।
বাতাবত্তে সো দিঢ় ভইআ অপে পাথর জইসা॥
বান্ধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেলা।
বালুআ তেঁলে সসর সিংগে আকাশ ফুলিলা॥
রাউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা অইসা সহাব।(৪১)

আদিতেই অনুৎপন্ন এই জগৎ কেবল ভ্রান্তি বশতঃই প্রতিভাত হইতেছে। যে রজ্জুসর্প দেখিয়া চমকিত হয় তাহাকে কি সত্যই বোড়া সাপে খায়? অকাট (মূর্খ) যোগী হস্ত লোণা করিও না (সংসারে জড়াইয়া পড়িও না)। জগৎকে যদি এই (নিম্নবর্ণিত) স্বভাবে জানিতে পার তবেই তোমার সকল বাসনা টুটিবে। মরু মরীচিকা, গন্ধর্ব নগরী, দর্পণ প্রতিবিম্ব যেমন ভ্রান্তি বশতঃ মনে প্রতিভাত হয় বাতাবর্তে দৃঢ় হইয়া জলে যেমন প্রস্তর প্রতিভাত হয় (জলস্তম্ভাদি), বন্ধ্যাসুতের ক্রীড়া যেমন, বালু-তৈল, শশশৃঙ্গ, আকাশ কুসুম—সকলই যেমন অস্তিত্বহীন অলীক মাত্র, এই ভব সংসারও সেইরূপ অলীক। জগৎ সংসারের অস্তিত্ব সম্পর্কে এই পদটিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা স্পষ্টতই শূন্যবাদীদের প্রভাব পুষ্ট। জগৎসংসারেব অস্তিত্বের পশ্চাতে কোনরূপ কোন প্রকৃত সত্যের অস্তিত্বের কথা আভাসে ইঙ্গিতেও এখানে উল্লেখ করা হয় নাই। ইহাই শূন্য বাদীদিগের বৈশিষ্ট্য।

এই পদটির পাশাপাশি আবার উল্লেখ করা যায় বেদান্তের অখণ্ড

আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন শাশ্বত-বিজ্ঞানের কথা যেখানে উক্ত হইয়াছে—

চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না।
কান্ধ বিয়োএঁ মা হোহি বিসন্না॥
ভণ কইসে কাহ্ন ণাহি।
ফরই অণুদিন তৈলোএ পমাই॥
মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।
ভাগ তরঙ্গ কি সোসই সাঅর॥
মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ন পেখই।
দুধমাঝে লড় অচ্ছন্তে ন দেখই॥ (৪২)

চিত্ত শূন্য সম্পূর্ণ (শূন্য হইয়া সম্পূর্ণ)। স্কন্ধ বিয়োগে বিষণ্ণ হইও না। বল কি করিয়া কাহ্নু নাই? অনুদিন সে ত্রিলোকে পরিব্যপ্ত হইয়া বিহার করিতেছে। মূঢ়গণই দৃষ্টকে নষ্ট দেখিয়া কাতর, তরঙ্গ ভঙ্গে কি সাগর শোষণ করে? যে লোক আছে মূঢ়েরা তাহাকে দেখিতে পায় না, যেমন দুধের মধ্যে স্নেহ পদার্থ দেখা যায় না। অর্থাৎ শূন্যতা যেন পূর্ণতারই নামান্তর। মৃত্যুতেও জীবনের শেষ নহে। মৃত্যুর পরও আনন্দময় সহজ স্বরূপের অস্তিত্ব থাকে। সর্ব্বব্যাপী আনন্দময় শাশ্বত অস্তিত্বশীল সেই সহজ-স্বরূপ যেন একটি সাগরের মত। তাহাতে অবিদ্যা-বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিজীবনের জন্মমৃত্যুরূপ তরঙ্গ ভঙ্গে কোন পরিবর্তনই সূচিত হয় না। স্থূল দৃষ্টিতে সেই আনন্দ স্বরূপকে দেখা যায় না—প্রজ্ঞাদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই সেই আনন্দ স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে পারেন। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পরমার্থ সত্য এখানে চিন্ময়, আনন্দরূপ, ব্রহ্ম—সদৃশ হইয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। অবশ্য বেদান্তের প্রভাবকে স্বীকার করিলেও

ইহার বৌদ্ধ আবরণটিও স্পষ্ট—শূন্য, স্কন্ধ বিয়োগ ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দগুলি ইহার নিশ্চিত প্রমাণ।

॥ তিন ॥

চর্যাপদের দার্শনিকতা ভাববাদী

এই মায়াবাদের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবেই চর্যাপদগুলির মধ্যে আরএকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় ইহার দার্শনিকতার ভাববাদী Idealistic স্বরূপ বা চিত্ত প্রাধান্যবাদ। চার্যাগীতিগুলিতে মায়াবাদী দর্শনের যে তিনটি সম্প্রদায়ের সম্ভাব্য প্রভাবের কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে তাহারা সকলেই ভাব ব'দী। শূন্যবাদী বিজ্ঞানবাদী এবং অন্যদিকে সৌত্রান্তিক বৈভাষিকদের মধ্যে পার্থক্যের একটি মূল কারণই এখানে। চর্যাপদগুলির মধ্যেও আমরা তাই লক্ষ্য করি—নানা রূপকের মধ্য দিয়া বিশ্ব সংসারকে চিত্তের খেলা বলিয়া এবং মুক্তির উপায় হিসাবে চিত্ত নিরোধের উপায়ের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। বৌদ্ধ দর্শন অনুসারে চিত্তের দুটি রূপ,—একটি অবিদ্যাগ্রস্ত অপরিশুদ্ধরূপ—সংবৃতি বোধিচিত্ত, অপরটি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানরূপ, প্রজ্ঞালোকদীপ্ত, প্রকৃতি প্রভাস্বর রূপ। এই সংবৃতি বোধি চিত্তকে নিরুদ্ধ করিয়া প্রকৃতি প্রভাস্বর প্রজ্ঞালোকদীপ্ত চিত্তকে লাভ করাই চর্যার কবি সাধক দিগের লক্ষ্য।

পূর্ব অনুচ্ছেদে মায়াবাদী দর্শনের নিদর্শন হিসাবে যে পদগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেই লক্ষ্য করা যায় বিশ্বসংসারের অস্তিত্বকে

সর্বত্রই চিত্তের খেলা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সাথে সাথে এই অবিদ্যা বিক্ষুব্ধ চিত্তকেও জয় করিবার উপায়ও নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রথম চর্যাটিতেই আমরা লক্ষ্য করি অবিদ্যা বিক্ষুব্ধ চঞ্চল চিত্তে কাল-জ্ঞান উৎপত্তির ফলে যে দুঃখ বিপর্যয় তাহার ইঙ্গিত এবং তাহা হইতে মুক্তির স্পষ্ট নির্দেশ হিসাবে "গুরু পুচ্ছিঅজাণ" "সুণু পাখ ভিতি লেহুরে পাস"—ইত্যাদির উল্লেখ। দ্বাদশ চর্যাতেও অবিশুদ্ধ চিত্তকে শুদ্ধজ্ঞান দ্বারা পরিনিবৃত্ত করিয়া মিথ্যা ভবের শক্তিকে পরাজিত করিবার ইঙ্গিত আছে। কতকগুলি চর্যাতে চঞ্চল চিত্তকে হরিণ, মূষিক ইত্যাদির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ৬ষ্ঠ চর্যাতে—

কাহেরে ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস ॥
অপণা মাংসে হরিণা বৈরী।
খণহ ণ ছাড়অ ভুসুকু অহেরি ॥
তিণ ণ চ্ছুপই হরিণা পিবই ণ পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলঅ ণ জাণী ॥

এখানে চঞ্চল চিত্তকে হরিণ এবং প্রকৃতি প্রভাস্বর চিত্তকে হরিণী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। চঞ্চল হরিণ সর্বদা শিকারী পরিবেষ্টিত। নিজের মাংসেই হরিণ নিজের বৈরী—অর্থাৎ চিত্ত সর্বদা অবিদ্যাচ্ছন্ন বলিয়া নানা দুঃখ বিপর্যয়ের দ্বারা বেষ্টিত এবং সে অবিদ্যার জন্য চিত্ত নিজেই দায়ী। এই বিপদের সময়ই প্রকৃতি প্রভাস্বর শূন্য স্বরূপ চিত্ত হরিণীর বানী শোনা যায়—এবং চঞ্চল চিত্ত-হরিণও মুক্তির পথ পায়। অন্য আর একটি চর্যাতেও—

নিশি অন্ধেরী মুসা অচারা।
অমিঅ ভখঅ মুসা করঅ অহারা ॥

মারয়ে জোইআ মুসা পবণা।
জেণ তুটঅ অবণা গবণা ॥ (২১)

মূষিক এখানে অবিদ্যাবিক্ষুদ্ধ চঞ্চলচিত্ত—রাত্রির অন্ধকার অবিদ্যার অন্ধকার। চিত্ত মূষিককে হত্যা করিলেই ভব সংসারের গতাগতি বন্ধ হয়। এই মূষিকই কাল। সদগুরুউপদেশের পূর্বপর্যন্ত ইহা চঞ্চল থাকে—কিন্তু ইহাই আবার গুরুর উপদেশে শূন্যতা অভিমুখে ঊর্ধ্বে উঠিয়া চিদমৃত পান করিয়া প্রকৃতিপ্রভাস্বর চিত্তে পরিণত হয়।

আর একটি চর্যাতে আমরা দেখি চিত্তকে উপমিত করা হইয়াছে বৃক্ষের সাথে। মন-তরু, পঞ্চইন্দ্রিয় তাহার শাখা; বহুল আশাই পত্র ফল বাহক। জল সিঞ্চনে বৃক্ষের যেমন বৃদ্ধি শুভাশুভের কল্পনা দ্বারা সেই রূপ মন তরুর বৃদ্ধি। গুরুবচনরূপ প্রজ্ঞা কুঠারে সেই মনতরুকে মূলডাল-সমেত ছেদন করিতে হয়। বাসনা বিক্ষুব্ধ অবিদ্যাতরুকে ছেদন করিলে প্রকৃতি প্রভাস্বর মনের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়:—

মনতরু পঞ্চইন্দি তসু সাহা।
আসা বহল পাতা ফল বাহা ॥
বরগুরু বঅণ কুঠারেঁ ছিজঅ।
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ণ উইজঅ ॥
বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পাণী।
ছেবই বিদুজন গুরু পরি মাণী ॥
জো তরু ছেব ভেবউ ণ জাণই।
সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মাণই ॥
সুণ তরুবর গঅণ কুঠার।
ছেবহ সো তরু মূল ণ ডাল ॥ (৪৫)

অবিদ্যাচ্ছন্ন এবং প্রকৃতি প্রভাস্বর ভেদে চিত্তের দুইটি অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায় অন্য একটি চর্যাতেও :

পেখু সুইণে অদশ জইসা।
অন্তরালে মোহ তইসা॥
মোহ বিমুক্কা জই মণা।
তবেঁ টুটই অবণা গমণা॥
নউ দাঢ়ই নউ তিমই ণ চ্ছিজই।
পেখ লোঅ মোহে বলিবলি বাঝই॥
ছাআ মাআ কাআ সমাণা।
বেণি পাখেঁ সোই বিণাণা॥
চিঅ তথতা সহাবে ষোহিঅ।
ভণই জঅনন্দি ফুড় অণ ণ হোই॥ (৪৬)

দেখ স্বপ্নে এবং আদর্শে যেরূপ অন্তরালে মোহও সেইরূপ। মন মোহ-বিমুক্ত হইলে সংসারে গমনাগমন বন্ধ হয়। (মোহশূন্য) মন দগ্ধ হয় না, ভেজে না, ছিন্ন হয় না, তবু দেখ লোক মোহে বদ্ধ হয়। ছায়া মায়া কায়া সমান, দুই পক্ষেই সেই বিজ্ঞান। চিত্ত তথতা স্বভাবে শুদ্ধ হয়,—জয়নন্দী বলেন তখন সবই স্ফুট, অন্য কিছুই নাই। অর্থাৎ মনের অন্তরালবর্তী মোহের কাজই হইতেছে যাহা বস্তুত নাই তাহাকে সত্য বলিয়া প্রতিভাত করান যেমন হয় স্বপ্নে কিম্বা দর্পণ প্রতিবিম্বে। এই মোহগ্রস্ত মনই পরিশুদ্ধ হইলে ভবসংসারে গমনা-গমন বন্ধ হয়। মোহহীন সেই মনের অবস্থা—অদাহ্য, অক্লেদ্য, অচ্ছেদ্য। এই মন যখন অদ্বয় স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত নহে অর্থাৎ ইহাতে গ্রাহ্য-গ্রাহক জ্ঞাতা-জ্ঞাতৃত্ব ভাব বিদ্যমান থাকে তখন ইহা হইতে

ছায়া মায়া কায়ার উৎপত্তি। এই মনই যখন আবার প্রকৃতি প্রভাস্বর বিশুদ্ধ বিজ্ঞান স্বরূপ অর্থাৎ বাসনা বিক্ষোভহীন অবিদ্যামুক্ত হয় তখন জ্ঞাতা জ্ঞাতৃত্ব গ্রাহ্য গাহক ভাব না থাকায় অদ্বয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তথতা স্বভাবে শোভা পায়।

চিত্তকে অবিদ্যামুক্ত করিয়া প্রকৃতি প্রভাস্বরতায় উন্নীত করিবার উপায়ের কথাও (যৌগিক পন্থাও) চর্যাকারেরা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এক হিসাবে চর্যার মধ্যে এই আলোচনাই বেশী কারণ চর্যা সাধন সঙ্গীত, তত্ত্ববিদ্যা নহে। তবুও চর্যার ভাববাদ ও চিত্ত-প্রাধান্য আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ধ্যান ধারণা ও যোগসাধনার সাহায্যেই সাধকগণ অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্তকে বিনাশ করিয়া শূন্যতা জ্ঞান লাভ করিতেন। প্রথম চর্যাটিতেই উল্লিখিত আছে—লুইপাদ বলিতেছেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন ধ্যানের মধ্য দিয়া, "ভণই লুই আহ্মে ঝাণে দিঠা"। চিত্তকে অবিদ্যামুক্ত করিবার উপায় হিসাবে আর একটি পদেও বলা হইয়াছে—চিত্ত হইল তুলার মত—তাহাকে ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ করিয়া নিরবয়ব কর। এইরূপ করিলেই অর্থাৎ ধ্যান ধারণা বিচার বিশ্লেষণের মধ্যদিয়া বিশুদ্ধ করিয়া লইলেই বোঝা যায় চিত্তের স্বরূপ কি। এই ভাবে চিত্ত নিরবয়ব অর্থাৎ অবিদ্যা বিমুক্ত হইলে শূন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। চর্যাপদের ভাষায়—

তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু।
আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু॥

তউসে হেরুঅ ণ পাবিঅই।
সান্তি ভণই কিণ স ভাবিঅই ॥
তুলা ধুণি ধুণি সুণে অহারিউ।
শূণ লইআঁ অপণা চটারিউ॥ (২৬)

চিত্তের অবিদ্যা বিমুক্তি সম্পর্কে অন্য আর একটি চর্যাতেও পাওয়া যায়—

এতকাল হাঁউ অচ্ছিলোঁ স্বমোহে।
এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরু বোঁহে॥
এবে চিঅরাঅ মকু ণঠা।
গঅণ সমুদে টলিঅ পইঠা॥ (৩৫)

এতকাল আমি স্বমোহে ছিলাম এবার আমি সদ্‌গুরুর বোধে বুঝিলাম। এখন আমার (অবিশুদ্ধ) চিত্তরাজ নষ্ট হইল (নিঃস্বভাবীকৃত হইল) এবং গগন সমুদ্রে (শূন্যতাজ্ঞানে) প্রবিষ্ট হইল।

অনুরূপ অনেক পদেই চর্যার চিত্ত প্রাধান্য ও ভাববাদের পরিচয় পাওয়া যায়। চর্যাপদের সাধক-কবিরা ছিলেন তান্ত্রিক এবং তন্ত্র এক হিসাবে সাধনার কার্যকরী পন্থা (Practical methods) মাত্র। কিন্তু তবুও ইঁহারা যে তত্ত্ব নির্দেশ করিয়াছেন তাহা অনির্বচনীয়, হৃদয়-বেদ্য, অনুভূতিগম্য (Subjective)। চর্যাকারদের মতে সহজতত্ত্ব—"সঅ সম্বেঅণ সরুঅ বিআরে অলক্খলক্খণ ণ জাই"—এই দিক দিয়াও ইহার দার্শনিক স্বরূপ ভাববাদী (Idealistic)। এখানে অবশ্য বিজ্ঞান বাদীদের প্রভাবই বেশী। শূন্যবাদী ও বেদান্ত বাদীরাও ভাববাদী কিন্তু বিজ্ঞান বাদীরাই বেশী করিয়া চিত্তপ্রাধান্যকে স্বীকার করিয়াছেন। চর্যাপদগুলির মধ্যে শূন্যবাদ বিজ্ঞানবাদ

একাকার হইয়া গেলেও মূল চিত্তের অস্তিত্ব 'স্বীকার প্রসঙ্গে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। চিত্তের অবিশুদ্ধ স্বরূপে গ্রাহ্য-গ্রাহক জ্ঞাতা-জ্ঞাতৃত্ব দ্বৈতভাব থাকে কিন্তু বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান স্বরূপে তাহা দ্বৈত বিমুক্ত অদ্বয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত—ইত্যাদি মত বিজ্ঞান বাদীদের Subjective Idealism এর প্রত্যক্ষফল। এই অদ্বয় জ্ঞানের কথা বহু চর্যাতেই উক্ত হইয়াছে—'অদয় দিড় টাঙ্গী নিবাণে করিঅ' (৫), 'ভাদে ভণই অভাগে লইআ' (৩৫), 'অদয় বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ' (৪৯) কিম্বা 'বিন্দুণাদ ণ হিএঁ পইঠা। আণ চাহন্তে আণ বিণঠা॥' (৪৪) অথবা 'ণাদ ণ বিন্দু রবি ণ শশি মণ্ডল। চিঅরাঅ সহাবে মূকল।' (৩৭)

॥ চার ॥

শূন্যতা ও করুণার তত্ত্ব

চিত্তের আলোচনা প্রসঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রে আলোচিত চিত্তের চারিটি স্তরের আলোচনাও এখানে আসিয়া পড়ে। নাগার্জুনপাদের নামে প্রচলিত পঞ্চক্রম নামক গ্রন্থে চিত্তকে স্তরভেদে—শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য ও সর্বশূন্য' এই চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম

১ শূন্যঞ্চাতিশূন্যঞ্চ মহাশূন্যং তৃতীয়কম্।
চতুর্থং সর্বশূন্যঞ্চ ফলহেতু প্রভেদতঃ। পঞ্চক্রম পুথি
[Obscure Religious Cults এ উদ্ধৃত পৃঃ ৫১]

স্তর শূন্যে চিত্ত প্রজ্ঞা বা আলোকমুখী। কিন্তু এই স্তরে চিত্তের সহিত শোক, ভয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বেদনা ইত্যাদি তেত্রিশ প্রকার চিত্ত-অবিশুদ্ধিকর প্রকৃতি দোষ জড়িত আছে. এই স্তরকে পরতন্ত্র, বাম, ও সর্বমায়ার প্রধান—স্ত্রীমায়া বলিয়া অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয় স্তরের অতিশূন্য প্রথম স্তরের 'আলোকাভাস' হইতে উদ্ভূত 'আলোকজ্ঞান'। ইহাকে দক্ষিণ, সূর্যমণ্ডল ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এই স্তরের সহিতও কাম, সন্তোষ, সুখ, বিস্ময়, ধৈর্য, গর্ব ইত্যাদি ৪০ প্রকার প্রকৃতি দোষ জড়িত আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মিলিতাবস্থা হইতে তৃতীয় স্তর—মহাশূন্যের উদ্ভব। এই স্তর আলোকোপলব্ধি—এবং পরিনিষ্পন্ন (absolute) বলিয়া খ্যাত, (অর্থাৎ ইহা প্রথম স্তরের মত 'পরতন্ত্র' ও দ্বিতীয়স্তরের মত 'পরিকল্পিত' নহে।) কিন্তু তবুও এই তৃতীয় স্তরও অবিদ্যা এবং ইহাতে সাতটি প্রকৃতি দোষ জড়িত আছে যথা—বিস্মৃতি, ভ্রান্তি, আলস্য ইত্যাদি। এই মোট আশীটি প্রকৃতি দোষ আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত প্রবাহিত এবং দিবারাত্র ভেদে দ্বিগুণ হইয়া একশত ষাটটিতে পরিণত হয়। প্রাণবায়ু এই প্রকৃতি দোষগুলির বাহন এবং যেখানেই এই প্রাণবায়ুর ক্রিয়া সেইখানেই এই প্রকৃতি দোষগুলির অস্তিত্ব বিদ্যমান। চিত্তের চতুর্থ স্তর সর্বশূন্য সর্বপ্রকার প্রকৃতি দোষ বিমুক্ত, প্রকৃতি প্রভাস্বর—ইহাই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, পরম সত্য, চরম জ্ঞান, ইহা অস্তি নাস্তি আদি মধ্য অন্ত ইত্যাদি সকলের উর্ধ্বে। [হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রে অন্যত্রও শূন্যের স্তর বিভাগ আলোচিত হইয়াছে। কোথাও এই শূন্য—সপ্ত শূন্য, কোথাও বা ইহা ষোড়শ বা অষ্টাদশ। বিজ্ঞানবাদীদের—পরিকল্পিত, পরতন্ত্র, পরিনিষ্পন্ন

ভেদে জ্ঞানের তিনটি প্রকার এবং ভাবঅভাব—ভেদহীন পরমজ্ঞান তথতা এই চারিটি পরিকল্পনা হইতেই বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের শূন্যতার এই চারিটি বিভাগের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।]

এই চারি শূন্যের তত্ত্ব চর্যাপদগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবেই গৃহীত হইয়াছে। 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী' (৩৩) ইত্যাদি বিখ্যাত পদটিতে এই চারিশূন্যের উল্লেখ আছে। "টিলার উপর আমার ঘর, প্রতিবেশী নাই, হাড়িতে ভাত নাই······বলদ প্রসব করিল, গাভী বন্ধ্যা, ত্রিসন্ধ্যা পিঠ দোহা হয়···ইত্যাদি।" হাড়ির ভাত এখানে পূর্বোক্ত প্রকৃতি দোষ সমূহ (ষষ্ট্যুত্তরশত প্রকৃতিদোষং—টীকা)। এই প্রকৃতি দোষ সমূহ যেখানে নাই—উষ্ণীষ কমলের সেই মহাসুখচক্রে আমার ঘর। প্রতিবেশীকে টীকায় বলা হইয়াছে—পার্শ্বস্থ চন্দ্রসূর্যৌ··· তত্রৈবান্তর্লীনৌ—অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য বা গ্রাহ্যগ্রাহক ভাব এখানে নাই। আভাসত্রয় যুক্ত মন যাহা ভবের অস্তিত্ব বোধের জন্য দায়ী তাহাকে বলদ বলা হইয়াছে। বলদ প্রসব করিল—অর্থাৎ মনরূপ বলদ ভবের অস্তিত্বের ধারণা উৎপত্তির জন্য দায়ী। যোগীরা ত্রিসন্ধ্যা পিঠ (আভাস দোষগুলিকে) দোহন (নিঃস্বভাবীকরণ) করেন। অন্য একটি পদেও দারিক পাদ যখন বলে 'বিলসই দারিক গঅণত পারিম কুলেঁ'—তখন গগনের অপরকূল বলিতে তিনশূন্যের পরপারবর্তী চতুর্থ-শূন্যস্তরকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। শূন্য অর্থাৎ প্রথম তিন শূন্য হইল মোহভাণ্ডার এবং চতুর্থস্তর সর্বশূন্য হইল 'তথতা'। এই তথতা বা চতুর্থ শূন্য দ্বারা আঘাত করিতে পারিলে প্রথম শূন্যত্রয়কে হত্যা করা যায় এবং তাহা হইলেই সকল প্রকার প্রকৃতিদোষ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কাহ্নুপাদের ভাষায়—

স্থুণ বাহ তথতা পহারী।
মোহ ভাণ্ডার লই সঅলা অহারী॥ (৩৬)

অন্য আর একটি পদে দাবা খেলার রূপকের মধ্য দিয়া এই শূন্য ও প্রকৃতি দোষের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 'প্রথমে দুটিকে (প্রথম দুই শূন্যকে) হত্যা করিতে পারিলে—ঠাকুর (তৃতীয় শূন্য)ও মৃত হয়। প্রথমে তোড়িয়া বোড়িয়া (দাবার বড়ে—টীকার মতে ষষ্ট্যুত্তর শত প্রকৃতি দোষ) কে মারিলাম, পরে গজবর (প্রকৃতি দোষমুক্ত সর্বশূন্য তথতা) দ্বারা পঞ্চস্কন্ধকে হত্যা করিলাম:

ফীটউ দুআ মাদেসিরে ঠাকুর।
উআরি উএসে কাহ্ন নিঅড় জিন উর॥
পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মারিউ।
গঅবর তোড়িআ পাঞ্চজনা ঘালিউ॥ (১২)

মহাযান বৌদ্ধদের মতে বোধিসত্ত্বাবস্থা লাভই পরম লক্ষ্য। বোধিচিত্ত লাভই বোধিসত্ত্বাবস্থায় উপনীত হইবার উপায়। বোধিচিত্ত অর্থাৎ প্রকৃতি প্রভাস্বর মুক্তচিত্ত আবার শূন্যতা ও করুণার মিলিতাবস্থা (শূন্যতাকরুণাভিন্নংবোধিচিত্তমিতিস্মৃতম্)। সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম মহাযানীমত হইতে উদ্ভূত—চর্যাপদেও তাই শূন্যতা ধারণার সাথে সাথে করুণার উল্লেখ ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান।[২] পূর্বেই আমরা একটি চর্যাতে লক্ষ্য করিয়াছি—

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥ (৮)

করুণা নৌকা সোনায় পরিপূর্ণ, রূপা রাখিবার স্থান নাই। এখানে

২ বিস্তারিত আলোচনার জন্যে 'চর্যাপদের ধর্মমত' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সোনা ও রূপা শব্দ দুইটিতে শ্লেষ আছে—সোনা = স্বর্ণ ও শূন্যতা, রূপা = রৌপ্য ও রূপ; শূন্যতা দ্বারা করুণা নৌকা পরিপূর্ণ, (শূন্যতা করুণার মিলিতাবস্থা) এখন রূপের আর স্থান নাই অর্থাৎ রূপজগতের অস্তিত্বের আর উপলব্ধি নাই। আর একটি পদেও আমরা দেখি দাবা খেলার রূপকে তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দাবার ছককে 'করুণা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কাহ্ন পাদ। 'করুণা পিহাড়ি খেলহু নঅবল' (১২) অন্যত্রও তিনি বলিয়াছেন—'ণিঅদেহ করুণা সুণমে হেরি'—নিজদেহ অর্থাৎ অস্তিত্ব শূন্যতা এবং করুণার অদ্বয় অবস্থায় দেখি। অন্যান্য কয়েকটি পদেও করুণার উল্লেখ আছে—'করুণমেহ নিরন্তর ফরিঅ' (৩০) অকট করুণা ডমরুলি বাজঅ' (৩১), 'সুণ করুণার অভিণাচারে কাঅ বাক চিঅ' (৩৪) ইত্যাদি।

॥ পাঁচ ॥

চর্যার দার্শনিকতার 'অনীশ্বরতা'

চর্যাপদগুলির দার্শনিকতার আর একটি বৈশিষ্ট্য ইহার অনীশ্বরতা। এই 'অনীশ্বরতা' শব্দটিকে ঠিক কি অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে—তাহার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। নাস্তিক্যবাদ বলিতে প্রচলিত অর্থে ধর্ম্ম-ঈশ্বর ইত্যাদি কোন কিছুকেই না মানা বোঝায়। চর্যাপদ গুলি এই অর্থে নাস্তিক্যবাদী নহে। তবে দর্শনের শ্রেণী বিভাগ প্রসঙ্গে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার অস্বীকার প্রশ্নে আস্তিক ও নাস্তিক যে

দুই শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে সেদিক দিয়া চর্যাপদের দর্শনকে নাস্তিক দর্শন বলা চলে। কারণ চর্যার ধর্মে বেদের ব্যর্থতা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—

যাহের বাণ চিহ্নরূব ণ জাণী।
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী॥ (২৯)

বৌদ্ধধর্ম বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না সেই দিক দিয়া বৌদ্ধ ধর্ম নাস্তিক। বৌদ্ধদর্শন শুধু যে নাস্তিক তাহাই নহে, তাহা অনীশ্বরও বটে। কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনস্তিত্ব প্রশ্নে বৌদ্ধদর্শন নীরব। বৌদ্ধ-দর্শন তাই বিশেষ অর্থে যেমন নাস্তিক—তেমনি অনীশ্বরও বটে। [প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে সাংখ্য দর্শন বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে বলিয়া আস্তিক—কিন্তু তাঁহাদের মতে প্রমাণাভাব হেতু ঈশ্বর অসিদ্ধ তাই তাঁহারা অনীশ্বরবাদী।]

চর্যাপদের অনীশ্বরতা বৌদ্ধমতানুগ বলা চলে। অবশ্য বৌদ্ধ-ধর্ম ক্রমঅবনতির পথে নানা দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে থাকে এবং যখন ইহা সহজযানে পরিণত হয় (সহজযানের ধর্ম মতকে অবলম্বন করিয়াই চর্যাপদগুলি রচিত[১])—তখন তাহাতে বজ্রদেবতার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সহজযান বজ্রযানে দেবতার অস্তিত্ব থাকিলেও প্রাধান্য নাই। এই সহজযান বজ্রযানের প্রধান দেবতা বজ্রসত্ত্ব। ইনি দেবতা হইলেও দোহা ও চর্যাপদগুলির মধ্যে ইহার দেবত্ব প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা ইহাকে একটি মানসিক অবস্থা বলিয়াই বেশী করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। উপনিষদের ব্রহ্ম যেমন জ্ঞানগম্য সাধনলব্ধ একটি মানসিক অবস্থা—বজ্র সত্ত্বও সেই

১ 'চর্যাপদের ধর্মমত' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

রূপ। বজ্রসত্ত্বই শূন্যতা করুণার অদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত গ্রাহ্য গ্রাহক ভাবমুক্ত প্রকৃতি প্রভাস্বর 'বোধিচিত্ত'—তাহাই সহজ, তাহাই মহাসুখ। এই সহজ বোধিচিত্ত লাভই যেমন বজ্রসত্ত্বকে লাভ করা তেমনি মহাসুখ লাভও বটে। বেদান্তের ব্রহ্মোপলব্ধিতে যেমন অলৌকিক আনন্দলাভ—এই সহজের উপলব্ধিতেও তেমনি মহাসুখ লাভ। চর্যাপদগুলির অনীশ্বরতা এই দিক দিয়াই লক্ষ্যণীয়। বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম যেমন প্রচলিত অর্থে ঈশ্বর নহেন—চর্যাপদগুলির সহজও সেইরূপ।

চর্যাপদগুলির এই অনীশ্বরতা শুধু বৌদ্ধদর্শন বা বেদান্তের প্রভাবের ফল নহে। এখানে বেশী করিয়া কার্যকরী তন্ত্রের প্রভাব। তন্ত্র ধর্ম বিষয়ক সাধন-পদ্ধতি। এই সাধন-পদ্ধতি অনুসরণের সিদ্ধি হিসাবে যে অবস্থার বর্ণনা করা হইয়াছে শিবশক্তির মিলিত যুগনদ্ধ-রূপই তাহার আদর্শ বটে, কিন্তু সেই মিলিত রূপ অপেক্ষা তাহার অন্তর্নিহিত আনন্দময় তত্ত্বরূপটি বেশী করিয়া বর্ণিত। তন্ত্রে তাই সিদ্ধি হিসাবে সেই প্রকৃতিপুরুষের মিলিত রূপের আনন্দকেই ব্যক্তিগত জীবনে সাধনার মধ্য দিয়া লাভ করার কথা বলা হইয়াছে। বৌদ্ধ-ধর্মের নির্বাণ, বেদান্তের আনন্দ, এবং তান্ত্রিকদের মহাসুখ,—বৌদ্ধতান্ত্রিকদের ধারণার মধ্যে মিলিয়া গিয়াছে। দুঃখবাদ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি। দুঃখ নিবৃত্তির উপায় বৌদ্ধধর্মের চারিটি আর্য সত্যের শেষটি। নির্বাণ তাহাদের সিদ্ধি—তাই নির্বাণই দুঃখ-নিবৃত্তি, সুতরাং নির্বাণই সুখ। 'চর্যায় তাই দেখি কোন বিশেষ দেবতার সাযুজ্য সামীপ্যলাভ কবি-সাধকদিগের লক্ষ্য নহে—নিজের মধ্যেই তান্ত্রিক উপায়ে সহজের

উপলব্ধি ও মহাসুখ লাভই তাহাদের লক্ষ্য। কোন চর্যাতেই তাই ঈশ্বরের দৈবী মহিমার বর্ণনা নাই বরং বার বার উল্লেখ আছে—পরম উপলব্ধি 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা', 'স্বসংবেদ্য', 'অলক্ষ্যলক্ষণ', আগমবেদ পুরাণ পুঁথিতে মিথ্যাই তাঁহার স্বরূপ বর্ণনার চেষ্টা। অবশ্য সহজিয়া বৌদ্ধেরা তাই বলিয়া সহজকে দেহজ কোন আনন্দ বলিয়াও বর্ণনা করেন নাই। ইনি দেহস্থ হইয়াও দেহজ নহেন (দেহস্থোঽপি ন দেহজ)। ইনি উপলব্ধি গ্রাহ্য তবুও অতীন্দ্রিয়। চর্যার মূললক্ষ্যের এই অনীশ্বরতা বা অবাঙ মনোগোচর আনন্দ স্বরূপতার জন্য চর্যার দার্শনিক স্বরূপকে mystic ও বলা চলে।

৭ ॥ চর্যাগীতির সমাজ-পরিবেশ ॥

॥ এক ॥

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাগীতিগুলি আধ্যাত্মিক সাধন সঙ্গীত। কিন্তু বিষয় বস্তুতে পূরাপূরি আধ্যাত্মিক হওয়া সত্ত্বেও চর্যাগীতিগুলির মধ্যে সে যুগের জীবন যাত্রা ও বাস্তব সমাজ ব্যবস্থার যে পুংখানুপুংখ চিত্র পাওয়া যায় তাহা আধ্যাত্মিক সাহিত্যে তো বটেই, সম্ভবত প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙলা সাহিত্যের খুব কম নিদর্শনেই পাওয়া যায়। এই দিক দিয়া চর্যাগীতিগুলি বাঙলা সাহিত্যে প্রায় একক বলা চলে। অবশ্য একথা ঠিক-যে সমস্ত প্রকার সাহিত্যের মধ্যেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সমাজের প্রতিফলন থাকে—এবং কোন বিশেষ যুগের সাহিত্য সৃষ্টি হইতে সে যুগের সমাজ পরিবেশ ও গণমানসের একটি চিত্র নির্ণয় করা অসম্ভব নাও হইতে পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধন সঙ্গীতে—যেখানে তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও বিন্যাসই কবিদের উদ্দেশ্য সেখানেও—কবিদের দৃষ্টি এত বেশী করিয়া বাস্তবমুখীন ছিল একথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। চর্যার সাধকেরা অবশ্য সহজ-সাধক ছিলেন, সে হিসাবে জীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-গুলি সম্পর্কে তাঁহারা যে মতবাদ পোষণ করিতেন তাহা ঠিক নিরোধের নহে। তবুও একথা স্বীকার্য যে সহজ সাধনার ভিত্তিটি সাধারণতঃ 'মায়াবাদী'ই হয়—এবং চর্যাগীতিগুলিরও দার্শনিক ভিত্তিটি মায়াবাদী।

এ অবস্থায় নিজেদের ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে চর্যাগীতির কবিরা তৎকালীন সমাজের বাস্তব জীবন যাত্রার যে সমস্ত রূপ-কল্প ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বিস্ময়েরই বটে।

যাহা হউক, চর্যাগীতিগুলির সমাজ পরিবেশ আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই ইহার ঐতিহাসিক পটভূমিকাটি আলোচনা করিয়া লওয়া প্রয়োজন। আলোচ্যগীতিগুলির রচনা কাল সঠিকভাবে নির্ণীত না হইলেও নানা আলোচনা হইতে বিশেষজ্ঞগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে এগুলি দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। ঐতিহাসিক মতে এসময়ের মধ্যে বঙ্গদেশে পাল রাজাদের পতন ও সেন রাজাদের রাজত্বকাল। ধর্মের দিকে পাল-কম্বোজ-সেন-বর্মন-রাজাদের মধ্যে বিশ্বাসের পার্থক্য ছিল কিন্তু সামাজিক দিকে, অন্তত একটি বিষয়ে, ইহারা সকলেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে একটি বিশেষ ব্যবস্থাকে স্থায়ী করিয়া গিয়াছেন—তাহা বাঙলার বর্ণবিন্যাস অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বর্ণের প্রতিষ্ঠা ও হাড়ী ডোম শবর ইত্যাদি অন্ত্যজ জাতিগুলের সামাজিক অবনত অবস্থায় পতন। ব্যাপারটি অবশ্য ঠিক একদিনে সংঘটিত হয় নাই—দীর্ঘ দিনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের ফলে এই ব্যবস্থা পাকা হইয়াছে—সুতরাং এ সম্পর্কে একটু দীর্ঘ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নহে।

আর্যদের আগমনের পূর্বে বাঙলা দেশে যে বিভিন্ন জাতি বাস করিত তাহারা অর্থাৎ দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়, আদি অষ্ট্রেলীয়, নিগ্রোটো ইত্যাদি জাতিগুলি—কেহই সংস্কৃতির দিক দিয়া আর্য ছিলেন না এবং উত্তর ভারতে উপনিবিষ্ট আর্যদের মনে ইহাদের সম্পর্কে যে 'দর্পিত উন্নাষিকতা' ছিল ঐতরেয় আরণ্যকে ইহাদের প্রতি প্রযুক্ত

'বয়াংসি' ইত্যাদি শব্দেই তাহার প্রমাণ সুস্পষ্ট। আর্যীকরণের চেষ্টারও বিরাম ছিল না। বাঙলা দেশে আর্যীকরণের প্রথম সূত্রপাত ধরা যাইতে পারে গুপ্ত আমল্ হইতে। গুপ্ত হইতে পাল-রাজগণ পর্যন্ত রাজারা ধর্মমতে ছিলেন বৌদ্ধ। অবশ্য সংস্কৃতির দিকে আর্যীকরণের চেষ্টায় তাহাদের অবদানও নিতান্ত কম নহে। বৌদ্ধেরা অবশ্য বেদ বিরোধী ছিলেন কিন্তু তাহারা বৈদিক সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন একথার প্রমাণ কোথাও নাই। বরং তাঁহাদের রাজত্ব কালেই ব্রাহ্মণ্যস্মৃতির প্রসার ও সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণের প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক স্থান নির্দেশ ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইতে থাকে। এই সময়কার প্রাপ্ত বহু লিপি ইত্যাদিতে ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। দেবপাল দেবের মুঙ্গের লিপিতে ধর্মপাল সম্পর্কে বলা হইয়াছে —তিনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সমূহকে স্ব স্ব শাস্ত্র নির্দিষ্ট ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। অন্যদিকে আমগাছি লিপিতে বিগ্রহ পালকে 'চাতুর্বর্ণ্য সমাশ্রয়' অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের আশ্রয়স্থল বলা হইয়াছে। পরমসৌগত এই পাল রাজাদের ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের বিবরণও প্রচুর পাওয়া যায়। (দ্রঃ বাঙ্গালীর ইতিহাস : পৃঃ ২৮৭)। এই গুপ্ত ও পাল রাজারা বিশেষ করিয়া পাল রাজারা ধর্ম মতে ছিলেন বিশেষ উদার। ফলে তখনকার সমাজে এই উদারতাও কিছুটা পরিমাণে প্রতিফলিত ছিল। অন্যদিকে আবার তন্ত্রের প্রভাবে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অত্যন্ত কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল। ফলে এক দিকে যেমন একীকরণের চেষ্টা ছিল অন্যদিকে ছিল তেমনি বর্ণবিন্যাস দৃঢ়ী করণের চেষ্টা। এই চেষ্টা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল বর্মন-সেন আমলে। বর্মন রাজারা ছিলেন কলিঙ্গাগত, সেন রাজারা কর্ণাট আগত। বহিরাগত এই দুই রাজ

বংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী এবং সমাজের আর্যীকরণ ও বর্ণবিন্যাস প্রতিষ্ঠার রীতিমত পৃষ্ঠপোষক। বিশেষ করিয়া সেন বংশের শেষ দুই রাজা বল্লাল সেন এবং লক্ষ্মণ সেন নিজেরাইতো ছিলেন স্মৃতি রচয়িতা ;—সুতরাং সেন আমলে আসিয়া স্মার্ত-বর্ণবিন্যস্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা বেশ দৃঢ় হইয়া গেল।

রাজত্বের 'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায়' সমাজের এই পরিবর্তনও দীর্ঘ এক ইতিহাস। এই ইতিহাসের গতিও সর্বদা সরলরেখায় নহে। আর্যপূর্ব বিভিন্ন শ্রেণী এক একবার এক এক বর্ণে গৃহীত হইয়াছে, একভাবে তাহাদের জাতি নির্ণীত হইয়া এক গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। আবার হয়তো রাজরোষ কিম্বা অন্যকোন কারণে তাহাদের বর্ণ জাতি সবই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, অন্য গ্রন্থে তাহাদের বিবরণ অন্যভাবে লিখিত হইয়াছে। রাজারাজড়াদের মধ্যেও এই রীতির প্রাদুর্ভাব ছিল। সেন বংশ প্রথমে ছিলেন ব্রাহ্মণ পরে হন ক্ষত্রিয় এবং তখন তাহাদের পরিচয় হয় 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়।' প্রথমতঃ বর্ণ বিন্যাসের ধারা ছিল না-জন্মগত, না-'গুণকর্ম বিভাগশঃ'—রীতিমত খেয়ালী। কিন্তু উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত বর্ণবিন্যাস সম্পর্কে বাঙ্গালীর শ্রদ্ধাপূর্ণ সংস্কার ছিল বহুদিনকার—এবং বাঙলা দেশে আর্যসংস্কৃতির প্রসারে তাহার বৃদ্ধিই হয়। ক্রমে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্যশ্রেণীর সামাজিক প্রতিষ্ঠাও নির্দিষ্ট হইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও স্মরণ রাখা উচিত। সামাজিক পরিবর্তন কখনও অর্থনৈতিক পরিবর্তন নিরপেক্ষ নহে। বাঙলার অর্থনৈতিক জীবনে ইতিমধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে ;—বাণিজ্যপ্রধান বাঙলা দেশ কৃষিপ্রধান বাঙলা দেশে পরিণত হইয়াছে।

বাণিজ্য প্রাধান্যের যুগে বিভিন্ন বণিক ও ধনোৎপাদক জাতিগুলির, ঠিক স্মৃতি শাস্ত্র সম্মত না হইলেও, কিছু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্মান যে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষি প্রাধান্যের যুগে তাহাদের সম্মান নষ্ট হইল এবং বিশেষ করিয়া অবহেলিত হইল সমাজ-শ্রমিক-শ্রেণীরা। ব্রাহ্মণ্য একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এমনি করিয়া অর্থ-নৈতিক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্ত দিকেই সাফল্য লাভ করিল। (দ্রঃ বাঙ্গালীর ইতিহাস : পৃঃ ৩১০)

বর্ণবিন্যস্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, সাধারণ অর্থে অবশ্য,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি সমস্ত বর্ণগুলিরই প্রতিষ্ঠা বুঝায়। কিন্তু বস্তুত ইহার ফলে ব্রাহ্মণ, শূদ্র এবং অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য এই তিনটি শ্রেণীরই উদ্ভব হয়। বৃহদ্ধর্ম পুরাণের মতে ব্রাহ্মণ বাদে অন্য সমস্তজাতিই 'শূদ্র'। ব্যাপকভাবে এই শূদ্রপদবীর ব্যবহার সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengal গ্রন্থে (পৃঃ ৫৭৮) ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে যে, পুরাণাদিতে শূদ্র বলিতে "not only the members of the fourth Caste, but also those members of the three higher Castes who accepted any of the heretical religions or influenced by Tantric rites"—বুঝাইত। বৃহদ্ধর্ম পুরাণের ব্যাপক অর্থে 'শূদ্র' পদবীর ব্যবহারের কারণ এখানে জানা গেল। কারণ যাহাই হউক—একটি তথ্য এখানে বেশ স্পষ্ট হইয়া যাইতেছে যে বাঙলা দেশে বর্ণ বিন্যস্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবার পরও ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইত্যাদি বর্ণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বর্ণগতভাবে বিশেষ কিছুই ছিল না। সকলেই শূদ্র পর্যায়ে গৃহীত হইত ; এবং দুইটি (অথবা চারিটি) বর্ণছাড়াও অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য বলিয়া শূদ্রের

নিম্নেও আর একটি শ্রেণীর অস্তিত্ব তখন ছিল,—বিভিন্ন স্মৃতি গ্রন্থেও ইহার প্রমাণ আছে। মনে হয় ধর্মের দিকে ইহারা ছিল প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ এবং আর্থিক পর্যায়ে তাহারা ছিল সমাজশ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্গত। এযুগের ডোম-শবর-চণ্ডাল শ্রেণীই সেই অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য পঞ্চম (?) বর্ণ। চর্যাগীতিতে ইহাদের যে চিত্র পাওয়া যায়—তাহা একদিকে যেমন ধর্মক্ষেত্রে ইহাদের বৌদ্ধত্ব অন্যদিকে আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাহাদের অবহেলিত বিপর্যস্ত অবস্থাই প্রমাণ করে। সেন বর্মন আমলে বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী সুবিদিত। বৌদ্ধ পালরাজারা অনেক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছেন—কিন্তু সেনরাজাদের আমলের প্রাপ্ত লিপির একটিতেও বৌদ্ধদের ভূমিদানের উল্লেখ নাই। বরং বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে অভিযানের অনেক কাহিনীই প্রচলিত আছে। রাজশক্তির বিরূপতা ভাজন এই বৌদ্ধেরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা যে সহজেই হারাইত ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

কিন্তু দুঃখের কারণ শুধু এখানেই নহে। সমাজ নায়ক ব্রাহ্মণেরা সমাজের মধ্যে নানা স্তরে নানা ভেদবিভেদ সৃষ্টি করিয়া নিজেরাও সেই ভেদ-বিভেদ হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন নাই। নিজেদের মধ্যেও তাঁহাদের নানা স্তর বিভাগ, নানা গাঞী ইত্যাদি। কিন্তু তবুও যেটুকু তাহাদের হাতের মধ্যে ছিল সেখানে তাহাদের পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টির পরিচয় অতি সুস্পষ্ট। স্মৃতি শাস্ত্রগুলির মধ্যে এমন অনেক বিধির উল্লেখ আছে যাহাতে দেখা যায় একই অপরাধের জন্য নিম্ন জাতীয়েরা যে শাস্তি পাইতেছে ব্রাহ্মণেরা তাহা অপেক্ষা কম শাস্তি পাইতেছেন বা মোটেই পাইতেছেন না। সমাজের মধ্যে নানা বিধি-

নিষেধের অন্তরালে ব্রাহ্মণ ও উচ্চ শ্রেণীর জনসাধারণের জন্য নানা প্রকার অন্যায় আচরণের পথ প্রশস্ত রহিয়াছে—কিন্তু সামান্য অপরাধেও নিম্নশ্রেণীর লোকদের পাইতে হইতেছে কঠোর শাস্তি।

এই ঐতিহাসিক পটভূমিকাতে চর্যাগীতিগুলি রচিত। সামাজিক বৈষম্য ও পক্ষপাত, উচ্চ বর্ণের মধ্যে নানা প্রকার অন্যায় ও ব্যাভিচার, নিম্নবর্ণ অন্ত্যজদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার অভাব ও অর্থ নৈতিক বিপর্যয় —ইহাই ছিল চর্যারচনার যুগে সামাজিক অবস্থার স্বরূপ। সুতরাং এই যুগে বসিয়া বিপর্যস্ত কোন সামাজিক শ্রেণী যদি সাহিত্য রচনা করে এবং তাহাতে যদি বাস্তব প্রতিফলন হয় তবে স্বভাবতই সেই চিত্র হইবে দুঃখের অথবা কাল্পনিক দুঃখনিবৃত্তির বা মনে গড়া সুখের। হইয়াছেও তাই। চর্যাগীতিগুলির মধ্যে যে সমাজ চিত্র ও বাস্তব জীবন যাত্রার আভাস ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাতে একদিকে সমাজের এই ভেদ বিভেদ এবং বৈষম্যের চিত্র অন্যদিকে দুঃখ পূর্ণ দরিদ্র জীবন যাত্রার কখনও পূর্ণাঙ্গ কখনও বা খণ্ড বিচ্ছিন্ন উপাদান—লক্ষ্য করা যায়।

॥ দুই ॥

জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র ও বিভিন্ন উপাদান

বাসস্থান : অস্পৃশ্যতা

সমাজ চিরকালই শ্রেণী বিভক্ত; শ্রেণী বিভক্ত সমাজের নানা স্তরের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পার্থক্যও কিছু নূতন কথা

নহে। চর্যাপদের যুগেও সমাজের এই শ্রেণীবিভক্ত রূপের পরিচয় অতি সুস্পষ্ট। পূর্বে আমরা ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া চর্যাপদের যুগের সামাজিক পটভূমিকা ও তাহার স্বরূপ সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে দেখিয়াছি নিম্নকোটির সমাজশ্রমিক শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণত সমাজে অবজ্ঞাত ছিল—আর্থিক দিকেও রীতিমত বিপর্যস্ত ছিল। তাহাদের বাসস্থানও ছিল দূরে, সমাজের উচ্চকোটির লোকেদের বাসস্থানের স্পর্শ বাচাইয়া। কয়েকটি চর্যাতেই ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে—

নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ। (১০)

নগর বাহিরে, ডোম্বি তোর কুড়ে ঘর। অন্য একটি চর্যাতেও আছে গ্রাম বা নগরের বাহিরে উচু পর্বতের উপর শবরের বাস—

ঊঁচা ঊঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী। (২৮)

কিম্বা 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী' (৩৩)—ইত্যাদি সমস্ত উদ্ধৃতি হইতে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে তখনকার দিন এই সমস্ত দরিদ্র নীচ জাতীয় ডোম শবর প্রভৃতিদের বাসস্থান ছিল গ্রামের প্রান্তে, পর্বত গাত্রে, কিম্বা টিলায়। অবশ্য উচ্চকোটির লোকদের সহিত ইহাদের কোন যোগাযোগ যে ছিল না তাহা নহে, অনেক সময় তাহাদের মনোহরণের জন্য ডোম্বীদের চেষ্টাও ছিল বেশ প্রকট—কিন্তু তবুও মনে হয় এসমস্ত ব্যাপার সামাজিক দিক দিয়া খুব শ্রদ্ধেয় ছিল না।

জীবিকা :

এই অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য সমাজশ্রমিকেরা আর্থিক দিকেও ছিল

ভীষণভাবে দুস্থ। তাহাদের জীবিকার যে কয়েকটি উপায়ের কথা চর্যাপদে আছে—তাহার কোনটিই তেমন সম্মানজনক বা অর্থকরী নহে। ইহাদের জাতীয় বৃত্তি ছিল মনে হয়—তাঁত বোনা, ও চাঙ্গড়ী প্রস্তুত করা—'তান্তি বিকণঅ ডোম্বী আর ণা চঙ্গতা'। ইহাদের অন্যতম জাতীয় বৃত্তি ছিল নৌকা বাওয়া এবং সম্ভবত মাছ ধরা। অনেকগুলি চর্যার মধ্যে নৌকার উৎপ্রেক্ষা ব্যবহৃত হইয়াছে। এই নৌকা অবশ্যই আধ্যাত্মিক অর্থে উদ্দিষ্ট—কিন্তু বার বার নৌকা ও নদীর ব্যবহার সহজেই দেশের নদীমাতৃকতা এবং তাহার আনুষঙ্গিক অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অনেকগুলি পদেই নৌকা কি করিয়া চালাইতে হইবে, কি করিয়া কাছি উপাড়িয়া গুণ টানিতে হইবে, কি ভাবে জল সেঁচিতে হইবে তাহার নানা প্রকার নির্দেশ আছে। (৮, ১৩, ১৪, ১৫, ৩৮ ইত্যাদি)

খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহ তু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি॥ (৮)

কিম্বা পাঞ্চ কেড়ুয়াল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিটত কাচ্ছীবান্ধী।
গঅণ-দুখোলেঁ সিঞ্চহু পাণী ন পইসই সান্ধি॥ (১৪)

ইত্যাদিতে কাছি টানিবার যে নির্দেশ আছে মনে হয় তাহা পূর্ববঙ্গীয় দড়াজাল। পূর্ববঙ্গে এখনও ঐরূপ দড়াজাল টানিয়া মাছ ধরিবার রীতি প্রচলিত আছে। এবং যে সমস্ত শ্রমিকদের সাহায্যে ঐ জাল টানানো হয় তাহাদিগকে কামলা-ই বলে। চর্যাকারদের জীবনের সহিত নদীর যোগ যখন অতই ঘনিষ্ঠ—তখন ইহা খুবই স্বাভাবিক—ধীবর বৃত্তি তাহাদের জীবিকার অন্যতম উপায় ছিল। ইহাদের ব্যাধ-

বৃত্তির উল্লেখ আছে দুইটি চর্যাতে ; একটিতে তো শিকার ধরিবার রীতিটির বেশ দীর্ঘ বর্ণনা আছে।—চারিদিক হইতে জাল পাতিয়া, —হাক পাড়িয়া হরিণ শিকার করা হইত। (৬) ইহাদের অন্যতম বৃত্তি ছিল—মদচোয়ান, তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে ৩ সংখ্যক চর্যা-গীতিটিতে। (এক সে শুণ্ডিণী দুইঘরে সান্ধঅ। চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ॥ ইত্যাদি) ধুনুরী বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় একটি চর্যাতে—তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু। (২৬) তরুছেদনের উল্লেখ আছে একাধিক চর্যাতে—(৫, ৪৫) এবং কুঠার দ্বারা বৃক্ষছেদনের যেরূপ স্পষ্ট বর্ণনা আছে তাহাতে মনে হয় এই সমাজ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ইহা অন্যতম বৃত্তিই ছিল। ইহাদের জীবিকার আর একটি বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়—তাহা নটবৃত্তি। নৃত্যগীত ইহাদের নিকট শুধুমাত্র আনন্দ ও অবসর বিনোদনের উপাদানই ছিল না—সম্ভবত জীবিকার অন্যতম উপায়ও ছিল ; আর সে নৃত্যগীতের কলা কৌশলও ছিল বহু-বিচিত্র :

> এক সে পদুমা চৌষঠী পাখুড়ী
> তহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥ (১০)

চৌষট্‌ঠী দল যুক্ত পদ্মের উপর এই নৃত্যের কল্পনা হইতেই তৎকালীন বহু বিচিত্র নৃত্যবৃত্তির কথাই অনুমিত হয়।

দৈনন্দিনজীবনের চিত্র : দুখ, অশান্তি, অসঙ্গতি

চর্যাপদগুলিতে তৎকালীন সামাজিকদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা দীন-দরিদ্র-সুলভ। জীবনের নানা দিকে দুঃখ, দুর্দশা, অন্নাভাব, সামাজিক অশান্তি, মানসিক দুঃখ সেই চিত্র-

গুলির মূল কথা। অত্যন্ত দুঃখের সহিত একটি চর্যাতে উল্লিখিত আছে—

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ সংসার বড্হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামায়॥ (৩৩)

আর্থিক বিপর্যয়ের ফলে—তৎকালীন দরিদ্র জন সাধারণের অতি দুঃখের একখানি চিত্র। সমাজ সংসার হইতে দূরে, প্রতিবেশীহীন টিলার উপর ঘর, হাড়িতে ভাত নাই, তবুও তাহার উপর চাপ। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে জগৎসংসারে শুধু অসঙ্গতিই আছে। পদকর্তা পরবর্তী পংক্তিগুলিতে সেই অসঙ্গতির চিত্রকেই পরিস্ফুট করিয়াছেন—

বলদ বিআএল গাবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিণা সাঁঝে॥
জো সো বুধী সোই নিবুধী।
জো সো চৌর সোই দুষাধী॥
নিতি নিতি ষিআলা সিহেঁ সম জুঝঅ।
ঢেণ্ঢণ পাএর গীত বিরলে বুঝঅ॥ (৩৩)

বলদ প্রসব করিল, গাভী বন্ধ্যা; ত্রিসন্ধ্যা পাত্র ভরিয়া দোহন করা হয়, যে বোঝে সেই নির্বোধ, যে চোর সেই সাধু (অথবা কোটাল); নিত্য নিত্য শৃগাল সিংহের সহিত যুদ্ধ করে। ঢেণ্ঢন পাদের গীতি খুব কম লোকেই বোঝে। আধ্যাত্মিক অর্থই এখানে মূল হইলেও বাহ্যিক দিকে অভিধায় যে অসঙ্গতির চিত্র ফুটিয়াছে তাহা মনে হয়

সামাজিক অসঙ্গতিরই প্রতিফলন। এইরূপ নৈরাশ্য ও দুঃখের ইঙ্গিত অন্য কয়েকটি চর্যাতেও আছে—হাঁউ নিরাসী খমন সাঈঁ (২০)—আমি আশাহীনা, স্বামী ক্ষপণক। অথবা—

অপণে নাহি মো কা হেরি শঙ্কা।
তা মহা মুদেরি টুটি গেল কংখা॥ (৩৭)

আমি নিজেই নাই তো কাহার শংকা করিব? তাইতো আমার মহামুদ্রার আকাঙ্খা টুটিয়া গেল।

সামাজিক অশান্তি ও অবস্থাবিপর্যয়ের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় আর কয়েকটি চর্যাতে:

কাহেরে ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস॥
অপনা মাংসে হরিণা বৈরী।
খণহু ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরি॥ (৬)

এখানে অবশ্য হরিণের রূপকে ধর্ম কথা ব্যক্ত হইয়াছে। হরিণ এখানে চিত্তকে বুঝাইতেছে। চিত্ত হরিণের কি অসহায় অবস্থা! চারিদিকে হাক পড়িতেছে, নিজের জন্যই সে নিজের শত্রু! দুঃখে পড়িয়া তিণ ণ চ্ছুপই হরিণা পিবই ণ পাণী—হরিণ তৃণ স্পর্শ করে না জল পান করে না। পরবর্তী আর একটি চর্যাতে যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা আরও দুঃখ বিপর্যয়ের:

বাজণাব পাড়ী পউআঁ খালেঁ বাহিউ।
অদঅ বঙ্গালে দেশ লুড়িউ॥
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরণী চণ্ডালী লেলী॥

দহিঅ পঞ্চ পাটন ইন্দি বিসআ ণঠা।
ণ জাণমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা॥
সোন রুঅ মোর কিম্পি ন থাকিউ।
ণিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ॥
চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ॥ (৪৯)

পদ্মখালে বজ্র নৌকা বাহিত হইল, নির্দয় দস্যুতে দেশ লুঠ করিল। আমার গৃহিণী চণ্ডালী হইল, আমি আজ বাঙ্গালী (বেচারী?) হইলাম। আমার ইন্দ্রিয় বিষয় দগ্ধ হইল; মন যে কোথায় গেল জানিনা। সোনা রূপা আমার কিছুই থাকিল না—নিজ পরিবারে (বেশ) সুখেই রহিলাম! চতুষ্কোটি ভাণ্ডার মোর নিঃশেষ হইল, এখন জীবন্তে মরিলেই বা কি! দুইটি চিত্রেই দেশের মধ্যকার অশান্তি ও অরাজক অবস্থার নির্দেশ অতি সুস্পষ্ট। বিশেষতঃ শেষের চিত্রটিতে অসহায়তা যেন অতি প্রকট। নির্দয় দস্যুতে দেশ লুঠ করিয়াছে—সমস্ত ধনরত্ন লইয়া গিয়াছে—এখন জীবন্তে মরিলেই বা কি?—এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে—দেশে অশান্তির কারণ হিসাবে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিপর্যই নয়, চুরি ডাকাতিরও প্রাদুর্ভাব ছিল। অবশ্য দ্বিতীয়টি প্রথমটির আনুষঙ্গিক। সদ্যোক্ত পদটিতে ডাকাতির কথা আছে। অনুরূপ চুরির কথা আছে কয়েকটি পদে—কানেট চৌরেঁ নিল অধরাতি (২), বাটত ভঅ খাণ্ট বি বলআ (৩৮) জো সো চৌর সোই দুষাধী (৩৩) ইত্যাদি। চোরের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের ইঙ্গিতও আছে কয়েকটি পদে—

সুণ বাহ তথতা পহারী (৩৬)

শূন্য গৃহ, তথতা প্রহরী ; অথবা তালা চাবি ব্যবহার (৪)—ইত্যাদি সেই সতর্কতারই প্রতিচ্ছবি।

নারীর জীবনের অতি দুঃখের একখানি মর্মান্তিক চিত্র পাওয়া যায় আর একটি চর্যাতে—

ফিটলেসু গো মা এ অন্ত উড়ি চাহি।
জা এথু চাহমি সো এথু নাহি॥
পহিল বিআণ মোর বাসনপূড়।
নাড়ি বিআরন্তে সেব বাপূড়া॥ (২০)

প্রসব করিলাম মাগো, আঁতুড় চাই, কিন্তু যাহা চাই তাহা পাই না। এই আমার প্রথম প্রসব—বাসনার পুটুলি, নাড়ি খুজিতে খুজিতে তাহাও লুপ্ত হইল।

এই দুঃখ বিপর্যয়ের মধ্যে সামাজিক নৈতিক আদর্শ যে বিশেষ উচুস্তরের ছিল না তাহা সহজেই অনুমেয়। অন্তত একটি চর্যাতে —গৃহবধূর ব্যভিচারের ইঙ্গিত অতি সুস্পষ্ট।

দিবসই বহুড়ী কাগ ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ॥ (২)

দিবসে বধূটি কাকের ভয়ে ভীত—আর রাত্রি হইলে কামরূপ চলিয়া যায়।

সুস্থজীবনের আকাঙ্খা :

এইরূপ অবস্থাতে সুস্থ শান্ত জীবনের আকাঙ্খাও অতি স্বাভাবিক। চর্যার কয়েকটি গীতে সেইধরণের অতি সুন্দর চিত্র আছে। পার্থিব সম্পদ নাই কিন্তু আত্মিক দিকেও অন্তত যাহাতে সুখে থাকা যায়

সেজন্য তাহাদের চেষ্টার অন্ত নাই। সেইরূপ একটি সুখের চিত্র :

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা করো গুলী
গুহাড়া তোহোরি।
ণিঅ ঘরণী ণামে সহজ সুন্দরী॥
ণাণা তরুবর মৌলিলরে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডল বজ্রধারী॥
তিঅ ধাতু খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুণ নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই॥ (২৮)

শবর শবরীর মিলিত জীবন যাত্রার অতি অপরূপ মাধুর্যময় চিত্র।—উচ্চ পর্বতের উপর বাসকরে শবরী বালিকা,—পরিধানে তাহার ময়ূর পুচ্ছ, গলায় গুঞ্জা মালা; এই-ই শবরের নিজ গৃহিনী, নামে সহজ সুন্দরী। নানা তরুবর মুকুলিত হইয়াছে—গগনে ডাল ঠেকিয়াছে (অর্থাৎ মিলনের পরিবেশ, বসন্তের আগমন ঘটিয়াছে।) কর্ণকুণ্ডল ধারিণী শবরী একাকী বনে ভ্রমন করিতেছে। শবর ত্রিধাতুর খাট পাড়িল, মহাসুখে শয্যা বিছাইল। নাগর শবর, নাগরী শবরী প্রেমে রাতি পোহাইল। কর্পূর বাসিত পান খাইয়া, নৈরামণি (শবরীর) কণ্ঠলগ্ন হইয়া মহাসুখে শবরের রাত্রি প্রভাত হইল।—নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের পরিপূর্ণ চিত্র। হয়তো জীবনে যে সুখ এই শবর শবরীরা লাভ করিতে পারে নাই অধ্যাত্ম সাধনার উদ্‌গতির (Sublimation)

মধ্য দিয়া তাহারই বাসনা চরিতার্থ করিবার কল্পনা ইহা। তবুও এ চিত্র এক হিসাবে অবাস্তব নয়—কারণ একেবারে বাস্তব নিরপেক্ষ কল্পনা অসম্ভব। শবরের কল্পনার এই চিত্রের ভিত্তিভূমি তাই বাস্তব, সন্দেহ নাই। হয়তো সমাজের উচ্চ কোটির লোকেরা এই নিরবচ্ছিন্ন সুখের অধিকারী ছিল।

অনুরূপ আর একটি বিস্তৃত চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়—৫০ সংখ্যক গীতিতে—

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হিএঁ কুরাড়ী।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী॥
ছাড় ছাড় মাআ মোহা বিষমে দুন্দোলী।
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ মেহেলী॥
হেরি যে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
সুকড় এবে রে কপাসু ফুটিলা॥
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ী তাএলা।
ফিটেলি আন্ধারি রে অকাশ ফুলিআ॥
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবর শবরী মাতেলা।
অনুদিণ শবরো কিম্পি ণ চেবই মহাসুহেঁ ভেলা॥ (৫০)

গগনের গায়ে উচু টিলাতে শবরের বাড়ী, নৈরামণিকে কণ্ঠে লইয়া এই শূন্য অবরোধে মহাসুখে জাগিয়াই রাতি কাটে। এই তৃতীয় বাটিকা আকাশ তুল্য, এখন সুন্দর কাপাস ফুল ফুটিয়াছে। আকাশ জ্যোৎস্নায় পরিপূর্ণ, অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে, যেন আকাশ ভরিয়া ফুল ফুটিয়াছে। কাগনী ধান পাকিল, শবরী জগৎসংসার ভুলিয়া মহা-সুখে মত্ত হইল।—সুখ পরিকল্পনার সত্যই পরিপূর্ণ চিত্র! বৃক্ষান্তরালে

উচু টিলাতে শান্তিপূর্ণ গৃহ; কণ্ঠাশ্লিষ্ট প্রেমময়ী গৃহিণী ; ধান পাকিয়াছে —অন্নের অভাব এবার মিটিবে। কাপাসফুল ফুটিয়াছে—বস্ত্রের অভাবও থাকিবে না। সুখের জন্য মানুষের আর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে !

খণ্ড চিত্র :

তৎকালীন জীবনযাত্রার এরূপ বিস্তারিত চিত্র ছাড়াও চর্যাগুলির মধ্যে তৎকালীন জীবনের অনেক খণ্ড বিচ্ছিন্ন ইঙ্গিত—অনেক আচার ব্যবহার রীতি নীতি ইত্যাদির আভাস পাওয়া যায়। তৎকালীন জীবন যাত্রা সুখেরই হউক আর দুঃখেরই হউক—আধুনিক জীবন যে সেই জীবনেরই ঐতিহাসিক ধারার ক্রমপরিণতি—তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়।

তখন বাঙ্গালী পরিবার নানা পরিজন লইয়া গঠিত হইত ; কেবল মাত্র স্বামী স্ত্রী লইয়া নহে। একাধিক চর্যাতে উল্লিখিত আছে শ্বশুর শাশুড়ী ননদ শালী ইত্যাদি লইয়া পরিবারটি গঠিত।

মারিঅ শাসু নণন্দ ঘরে শালী।
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালী॥ (১১)

শাশুড়ী ননদ শালী স্ত্রী ইত্যাদি সমস্ত পরিজন বর্গকে হত্যা করিয়া কাহ্ন কাপালিক হইল। বিবাহের রীতিতেও আধুনিক জীবন যাত্রার সহিত তৎকালীন জীবনের অনেক মিল। বাদ্যভাণ্ড সহকারে বরযাত্রা, বিবাহে যৌতুক প্রথা, নারীদিগের বাসর জাগা, ইত্যাদি পরিচয় তৎকালেও ছিল। বিবাহের চিত্রটি বেশ পূর্ণাঙ্গ :

ভব নির্বাণে পড়হ মাদলা।
মণ পবণ বেণি করণ্ড কশালা॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিলা।
কাহ্ন ডোম্বী-বিবাহে চলিলা॥
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম॥
অহণিসি সুরঅ পসঙ্গে জাঅ।
জোইণি জালে রএণি পোহাঅ॥ (১৯)

পটহ ও মাদল, জোড়া ঢোল, কাঁসি ইত্যাদির জয় জয় দুন্দুভি শব্দ উচ্ছলিত হইল, কাহ্ন ডোম্‌নীকে বিবাহ করিতে চলিল। বিবাহে তাহার জন্ম সার্থক হইবে—বিবাহের যৌতুক অনুত্তর ধর্ম। অহর্নিশি সুরত প্রসঙ্গে যায়, রমনী পরিবৃত হইয়া বাসর রজনী পোহায়। এখানে বিবাহের উৎপ্রেক্ষার মধ্যদিয়া ধর্মকথা ব্যক্ত হইয়াছে—কিন্তু তৎকালীন বিবাহের যে বাস্তব চিত্র পাওয়া গেল, চিত্র হিসাবে তাহা নিখুঁত। এই ধরণের আচার অনুষ্ঠান বহুল বিবাহ ছাড়াও তৎকালে যে 'সাঙ্গা'ও প্রচলিত ছিল তাহার ইঙ্গিত আছে—

"আলো ডোম্বি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ।" (১০)

একটি পদের মধ্যে তৎকালীন সৎকার প্রথার ও কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। এ রীতিটিও আধুনিক রীতির মত :

চারি বাসে গড়িল রে দিঅঁা চঞ্চালী
তঁহি তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুণ শিআলী॥
মারিল ভবমত্তারে দহদিহে দিধলী বলী।
হের সে সবর নিরেবণ ভইলা ফিটলি ষবরালী॥ (৫০)

চারি বাঁশে (খাট, চালি) গড়িল চেঁচাড়ি দিয়া, তাহাতে তুলিয়া শবরকে দাহ করা হইল। কাঁদিল শকুনি শৃগাল। সংসার মত্ত মরিল, দশদিকে পিণ্ড দেওয়া হইল। শবর নির্মূল হইল, শবরালি ঘুচিল।

পারিবারিক জীবনের খণ্ড চিত্র হিসাবে গোপালন ও দুগ্ধ দোহনের কথাও পাওয়া যায়। বলদের ব্যবহার, (সম্ভবত লাঙ্গল চষিবার জন্য) তখনকার দিনে অজ্ঞাত ছিল না তাহাও অনুমান করা চলে বলদ শব্দটির উল্লেখ হইতে। হস্তীর ব্যবহারও তখনকার দিনে অজ্ঞাত ছিল না, অন্তত ধনী ব্যক্তিরা হস্তীর ব্যবহার করিতেন তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় দুইটি গীতিতে। দুইটি স্তম্ভের সহিত শিকল দ্বারা হস্তীকে বাঁধিয়া রাখা হইত, বিশিষ্ট কোন ধ্বনি দ্বারা সে চালিত হইত—এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় পদ দুটিতে (৯, ১৯)।

অবসর বিনোদনের উপায় হিসাবে দাবা খেলা তখনকার দিনে বিশেষ প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। দাবা খেলিবার কি রীতি তখনকার দিনে প্রচলিত ছিল তাহা অবশ্য জানা যায় না তবে যেটুকু উল্লেখ আছে তাহাতে মনে হয় আধুনিক রীতি হইতে তাহা খুব বিভিন্ন নহে—

করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ ণঅবল।
সদ্ গুরুবোহেঁ জিতেল ভববল॥

*   *   *

পহিলে তোড়িআ বড়িআ মারিউ।
গঅবরে তোলিয়া পাঞ্চ জনা ঘালিউ॥

মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা।
অবশ করিআ ভববল জিতা॥ (১২)

করুণা পিড়িতে নববল (দাবা) খেলি। গুরু উপদেশে জয়লাভ

করি। প্রথমে তুড়িয়া বোড়ে মারা হইল, গজদ্বারা পাঁচজনকে ঘায়েল করা হইল। মন্ত্রী দ্বারা ঠাকুরকে (রাজাকে) পরিনিবৃত্ত করিয়া জয় করা হইল।

সামাজিক ব্যসন হিসাবে মদ খাওয়া তখনকার দিনে বিশেষ প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। মদচোয়ানো যেমন একটি শ্রেণীর জীবিকা ছিল—মদ খাওয়া তেমনি অনেকের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মদের দোকানে বিশেষ কোন চিহ্ন থাকিত এবং তাহা দেখিয়া গ্রাহকেরা দোকান চিনিত—"দশমী দুআরত চিহ্ন দেখই‌আ। আইল গরাহক অপণে বহিআ" ॥ (২) কর্পূর দিয়া পান খাওয়াও বিলাসিতা ও আনন্দের অংশ বিশেষ ছিল।

সামাজিক উৎসব আনন্দের অঙ্গ হিসাবে নাচগান ইত্যাদির প্রচলন ছিল প্রচুর। নাচ গান বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির উল্লেখ বার বার পাওয়া যাইতেছে। চর্যাগুলি গান—এগুলি যে সুরলয় সংযোগে গীত হইত তাহাতো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। একটি পদে (১৭) 'হেরুঅবীণা' নামে যে বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে তাহার বর্ণনা হইতে মনে হয় যন্ত্রটি গোপীযন্ত্র জাতীয় কোন যন্ত্রবিশেষ। লাউ, দণ্ডী, তন্ত্র ইত্যাদির সংযোগে যন্ত্রটির গঠন। মনেহয় তখনকার দিনেও পদগুলি কীর্তনের ন্যায় গীত হইত এবং তাহাতে হেরুক বীণা বাজিত। এই পদটীরই শেষ দিকে যে ইঙ্গিত আছে তাহাতে মনে হয় তখনকার দিনে নাটক অভিনয় বেশ প্রচলিত আছে। নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী। বুদ্ধ নাটক বিষমা হোই ॥ (১৭)—নাচ গান নাটক সমস্ত কিছুরই ইঙ্গিত এখানে আছে। নটবৃত্তি যে বিশেষ একটি শ্রেণীর জীবিকা ছিল তাহার উল্লেখ ইতিপূর্বেই করিয়াছি।

একটি পদে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে যুদ্ধ যাত্রার বর্ণনা আছে। পদটি অবশ্য মূলে পাওয়া যায় নাই। তিব্বতী অনুবাদ হইতে সম্ভাব্য রূপটি অনুমান করা চলে :

(বিষয়েন্দ্রিয়ের) দুর্গ সমূহ জিত হইল, শূন্যরাজ মহাসুখী হইলেন। তূর্য শঙ্খধ্বনি অনাহত গর্জন করিল। (সংসার মোহরূপ) সৈন্য দূরে পলাইল। সুখ নগরীর প্রধান স্থান সব জয় করা হইল। আঙ্গুল ঊর্ধ্বে তুলিয়া কুক্কুরী পাদ বলিতেছেন।

জীবনযাত্রার বিভিন্ন উপাদান :

ইহাছাড়া কতকগুলি চর্যাতে—তখনকার জীবনযাত্রার বাস্তব উপাদানের কিছু কিছু নামোল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। ঘরে ব্যবহৃত বাসন পত্রাদির মধ্যে—হাড়ি, পিঠা, (দুধ দুহিবার পাত্র), ঘড়ি (ঘড়া), ঘড়ুলি (গাড়ু) ইত্যাদির উল্লেখ আছে। অলংকারের মধ্যে আছে—কাণেট (কর্ণভূষণ), ঘণ্টানেউর (নূপুর), কাঙ্কান (কাঁঙ্কণ) মুত্তিহার (মুক্তাহার) এবং কুণ্ডল। আরশি ব্যবহারের উল্লেখ আছে একটি চর্যাতে। বাদ্যযন্ত্র, বাদ্যভাণ্ডের মধ্যে উল্লেখ আছে—পড়হ (পটহ), মাদল, করণ্ড (ঢোল ?) কসাল (কাঁসি), ডমরু, ডমরুলি, বীণা, বাঁশি ইত্যাদি। অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিষ পত্রাদির মধ্যে উল্লেখ আছে—কুঠার, কোঞ্চাতাল (তালা, চাবি) টাঙ্গি, পিড়ি, চীরা (পতাকা), সোনা, রূপা ইত্যাদির। থানা, কাছারি ইত্যাদিও প্রচলিত ছিল বোঝা যায়—উআরি (কাছারি) এবং দুষাধি (কোটাল) শব্দদ্বয়ের ব্যবহার হইতে।

ধর্মীয়রূপ :

চর্যাগুলির মধ্য হইতে—তৎকালীন সমাজের ধর্মীয় রূপটি বেশ সুন্দর ভাবে জানা যায়। সমাজে তখন—কাপালিক, যোগী, ক্ষপণক, রসসিদ্ধা ইত্যাদি—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধক ছিলেন। তত্ত্ব ও আচার অনুষ্ঠানের দিকে ইহাদের মধ্যে রীতিমত যোগ ও সাদৃশ্য ছিল। ইহাদের জীবন যাত্রার অনেক খণ্ড চিত্র চর্যার এখানে ওখানে ছড়াইয়া আছে। বেশী করিয়া উল্লেখ আছে— উলঙ্গ, হাড়ের মালা গলায় পরা, সাধন সঙ্গিনী সমভিব্যাহারী কাপালিকের কথা।

নারীর অবস্থা :

সমাজে নারীদের অবস্থা কেমন ছিল চর্যাগীতি হইতে তাহার কোন প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্য চর্যাগীতির যাহা উদ্দেশ্য তাহাতে তাহা পাওয়া সম্ভবও নয়। তবে দুঃখ বিপর্যয়ের চিত্র প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি—নারীরাও ছিল সমদুঃখভাগী। নারীরা যে সাধনার জগতে অগ্রসর ছিল এবং সাধন সঙ্গিনী হিসাবে তাহাদের প্রয়োজন ছিল তাহার অতি প্রচুর উল্লেখ চর্যাগীতিগুলিতে আছে। নারীদের জন্য স্থান বিশেষে মহিলা মহল থাকিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। ১৩সং চর্যাতে উল্লিখিত—'শূন মেহেরী'র ব্যাখ্যা শূন্য অন্তঃপুর বা মহিলা মহল এইরূপ অনুমানের ভিত্তি।

পূর্বেই আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি চর্যাগীতিগুলি সাধন সঙ্গীত। সুতরাং সমাজের বাস্তব চিত্র অঙ্কন তাহার উদ্দেশ্য হইতে পারেনা। তবুও, কোন যুগের সাহিত্যই সম্পূর্ণরূপে সমাজ নিরপেক্ষ

হয়না। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপকল্প ইত্যাদি ব্যবহারের মধ্য দিয়া যুগ-জীবনের বাস্তব আভাষ স্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়। এমন কি, কোন বিশেষ যুগে কোন বিশেষ ধর্ম বা সাধনার প্রচলনের মধ্যেও সমাজ পরিবেশগত কারণ থাকাই স্বাভাবিক। সুতরাং চর্যাগীতিগুলির মধ্যেও যুগ ও জীবনের প্রতিফলন হিসাবে যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা তৎকালীন ইতিহাস বিরোধী তো নহেই বরং ইহার মধ্যেই নিহিত আছে ধর্মীয়জীবনের অভিপ্রায় সূত্রটি। জীবন যাত্রার নানা আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, জীবিকা, অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনযাত্রার নানা প্রকার বাস্তব উপাদান সবই তৎ-কালীন সমাজজীবনের প্রতিফলন। এই সমস্ত রীতিনীতির অনেক-গুলিই আধুনিক কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়া—বাঙ্গালীজীবনের অখণ্ড ধারাবাহিকতাও সূচিত করিতেছে।

৮ ॥ চর্যাগীতির সাহিত্যিক মূল্য ॥

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে আদিতম উপাদান হিসাবে চর্যাগীতিগুলির উল্লেখ সর্বদাই করা হয়, কিন্তু এগুলি আদৌ সাহিত্যিক নিদর্শন কিনা এ প্রশ্ন সাধারণতঃ করা হয় না। বস্তুত এগুলির সাহিত্যিক মূল্য কতখানি তাহার নির্ভুল বিচার এখন আর সম্ভব নহে। যুগ পরিবর্তনে সাহিত্যের ভাব ভাষা পরিবর্তিত হইয়া যায়, ফলে, অনেক সময়, কোন কোন কাব্য-সাহিত্যের সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণে বাধা ঘটায়। আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। হাজার বছর পূর্বেকার কেবল অপভ্রংশের খোলসমুক্ত শিশুবয়সী এই বাঙলা ভাষা আধুনিক কালে বাঙ্গালীর কাছেও ব্যাখ্যাগম্য ভাষা। ভাষার এই দুর্বোধ্যতার জন্য—রস যাহা আছে তাহারও উপলব্ধিতে ব্যাঘাত জন্মে। অন্যদিকে ভাবের বিবর্তনও এদিকে কম বাধা নহে। পাঠক সাধারণের মনে আবেদন সৃষ্টি করিতে পারা এবং তাহাদের অন্তরের রম্যবোধকে জাগ্রত, উদ্বোধিত করিয়া অলৌকিক আনন্দের মায়ালোকে পৌছাইয়া দেওয়াই সাহিত্যের কাজ—তাহাতেই সাহিত্যের সাহিত্যত্ব। এইভাবে সহৃদয় হৃদয়বেদ্য হইয়া উঠিবার জন্য কবির মন ও পাঠকের মনের সমতা চাই। অর্থাৎ কবির মনোসৃষ্ট ভাববস্তুর বাসনা সংস্কার পাঠকের মনে যদি না থাকে তবে সেই কাব্য পাঠকের মনে কোন আবেদন সৃষ্টি করিতে পারেনা। এইখানেই কাব্য বিশেষের কোন এক বিশেষ যুগে খ্যাতির অধিকার

থাকা সত্ত্বেও পরে সেই খ্যাতি নষ্ট হইবার কারণ খুজিয়া পাওয়া যায়। স্থায়ীভাবগুলি সম্পর্কে বক্তব্য যাহাই হউকনা কেন, মানুষের মনের সঞ্চারীভাবগুলি—সঞ্চরণশীল। যুগে যুগে তাহারা পরিবর্তিত হয়। রবীন্দ্রনাথও তাই সন্দেহ করিয়া ছিলেন:—

আজি নববসন্তের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ,
আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,
আজিকার কোনো রক্তরাগ—
অনুরাগে সিক্ত করি পারিব কি পাঠাইতে
তোমাদের করে,
আজি হতে শতবর্ষ পরে॥

কবির নিজের সম্পর্কে এ সন্দেহ অমূলক হইলেও, সাধারণ কাব্য সৃষ্টি সম্পর্কে কিন্তু—ইহা একেবারে অমূলক নহে। মানুষের মনের স্থায়ী রসের বীজ ও সাহিত্যের স্থায়িত্বের কথাকে একেবারে অস্বীকার না করিলেও একথা অবশ্যই মানিতে হয় যে পৃথিবীর কোন সাহিত্যই চির-কাল সমান ভাবে রস সৃষ্টিতে সক্ষম নহে। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ, কেবল মাত্র স্থায়ীভাবই রস সৃষ্টির কারণ নয়। যে বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী সহযোগে রসসৃষ্টি হইয়া থাকে তাহাদের সম্পর্কে মানুষের ধারণা পাল্টায়—এবং স্থায়ীভাব স্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও—ইহাদের পরিবর্তনশীলতার জন্যে রসোপলব্ধি, ব্যাহত না হইলেও, ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং চর্যাগীতিগুলির রস তৎকালীন পাঠকদের মনে যতখনি ছিল আজ আর কিছুতেই তাহার সম্যক উপলব্ধি হইবে না। অন্যদিকে চর্যার ভাষা ও বিষয় বস্তুর (তত্ত্বের) ব্যাখ্যাগম্যতাও ইহার রসোপ-

লব্ধির পথে বাধা। কাব্য ব্যাখ্যাগম্য হইলে 'সুধী' ব্যক্তিদের উৎসবের কারণ হইতে পারে—কিন্তু সাধারণের পক্ষে তাহা দুর্ভাগ্যই বটে। চর্যাগীতির তত্ত্বও—একদা যাহাই হউক—আজ রীতিমত ব্যাখ্যাগম্য। সুতরাং এদিক দিয়াও সহজ রসোপলব্ধির সম্ভাবনা অনেক কম।

সুতরাং প্রথমেই স্বীকার করিয়া লওয়া ভাল—অন্তত আধুনিক কালে—চর্যাগীতিগুলির—ঐতিহাসিক তথা দার্শনিক ও ভাষাতাত্ত্বিক মূল্য যতখানি, সাহিত্যিক মূল্য ততখানি নহে। তবে একেবারেই কিছু সাহিত্যিক মূল্য নাই একথাও বলা চলে না। চর্যাগীতিগুলি আধ্যাত্মিক সাধন সঙ্গীত সুতরাং ইহার কোন সার্বজনীন সাহিত্যিক মূল্য থাকিতে পারে না—একথা যাহারা বলেন তাহাদের সহিতও আমরা একমত হইতে পারি না—কারণ আধ্যাত্মিকতা—সাম্প্রদায়িক আচার অনুষ্ঠান মাত্রের বর্ণনায় পর্যবসিত না হইলে—মানুষের হৃদয়ের একটি আবেগ হিসাবে ইহারও কিছু সাহিত্যিক আবেদন থাকে। সেদিক দিয়া চর্যাপদেরও কিছু কিছু আবেদন থাকা স্বাভাবিক; এবং আছেও।

তত্ত্বের দিকে চর্যার দর্শন ও সাধন পদ্ধতি গুহ্য তান্ত্রিক সাধনার অন্তর্গত। বিষয়টি জটিল এবং তাহাকে গোপন করিবার চেষ্টারও অন্ত নাই। প্রাচীনতার জন্য দুর্বোধ্য এই ভাষাকে তত্ত্ব ও গুহ্যতার জন্য আরও দুরূহ করায় চর্যার কবিতাগুলির রসাস্বাদনে ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু তবুও যেহেতু এই ধর্মের সাধকেরা ছিলেন দীন দরিদ্র জনসাধারণ তাই, দুরূহতার চেষ্টা সত্ত্বেও উপমা উৎপ্রেক্ষায় ইহাকেও সহজ করিতে হইয়াছে। তাহাছাড়া দার্শনিক ও ধর্মীয় স্বরূপে চর্যাগীতিগুলি—সহজিয়া সাধনারও অন্তর্গত। সাধনার ক্ষেত্রে এই সহজিয়া ভাব

রীতিমত সার্বজনীন। একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—এই সহজিয়া ভাব বাঙ্গালীর জন্মগত। সুতরাং বাঙ্গালীর একান্ত পরিচিত এই সাধনার ধারা বাঙ্গালীর মনে আজিও কিঞ্চিৎ আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে। যখন চর্যাকারেরা বলেন—

কুলেঁ কুল মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।
বাল ভিণ একু বাকু ণ ভুলহ রাজপথ কন্ধারা॥
মাআ মোহ সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
আগে নাব ন ভেলা দীসই ভান্তি ন পুচ্ছসি নাহা॥

(কূল হইতে কূলে ঘুরিও না রে মূঢ়, সংসার সোজা পথ, মূর্খ তিলেক বাঁকে ভুলিও না, রাজপথ কানাত ঘেরা। মায়া মোহ সমুদ্রের অন্তও বুঝিস না—থইও পাস না ; আগে নৌকা বা ভেলা দেখা যায় না, ভ্রান্তিবশে নাথ (গুরু)-কেও জিজ্ঞাসা করিস না)—সহজ বৈরাগ্যের এই কথার আবেদনও সহজ। সেইরূপ, কবি যখন বলেন 'অনুভব সহজ মা ভোলরে জোঈ।'—তখন ইহার সহজ আবেদনে আমাদের অন্তর সাড়া না দিয়া পারে না।

আধ্যাত্মিকতা চর্যাগীতির উদ্দেশ্য হইলেও ইহাতে এমন অনেক রূপকল্প ব্যবহৃত হইয়াছে পাঠক চিত্তে যাহার আবেদন চিরকালীন রসের ভূমিতে। এরূপ কতকগুলি চিত্রে আমরা পাই—তৎকালীন জীবনের কিছুকিছু পরিচয় যেমন, শিকারের চিত্র, নৌকা বাহিবার চিত্র, মদ্য বিক্রয়শালার চিত্র ইত্যাদি। ইহাদের অনেকগুলিতেই স্বভাবোক্তির মাধ্যমে কিছুটা পরিমাণে রসের উদ্বোধন হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়—নদীপ্রবাহ ও নদীপার হইবার এই বর্ণনাটি—

ভবনই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামী লোঅ নিভর তরই॥ ইত্যাদি

অথবা গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ।
তহি বুড়িলী মাতঙ্গী পোইআ লীলেঁ পার করেই।

*   *   *

পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তে মাঙ্গে পিঠত কাচ্ছী বান্ধী।
গঅণ দুখোলেঁ সিঞ্চহু পাণী ন পইসই সান্ধি॥

ইত্যাদি

কতকগুলি চিত্র আছে, যেগুলির সার্বজনীন সাহিত্যিক মূল্য ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও অস্বীকার করা চলে না। চিত্র সৌন্দর্যের দিক দিয়াও সেগুলি যেমন উপভোগ্য, তেমনি উপভোগ্য সেগুলির পশ্চাতে রহিয়াছে পরিপূর্ণ সুখের আশায় যে-উন্মুখ চিত্ত তাহার গভীর আকুতি।

ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডল বজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ ণৈরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী।
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইঅ মহাসুহে রাতি পোহাই॥

শবর শবরীর মিলনের এই পরিপূর্ণ চিত্রটি সত্যই অনবদ্য। মিলনের পরিবেশ হিসাবে—বনভূমিতে বসন্তের আগমন; নানা তরুবর মুকুলিত

হইয়াছে—ডাল পালা আকাশের দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। ময়ূর পুচ্ছ পরিহিত, গ্রীবায় গুঞ্জামালা ধারী, কর্ণকুণ্ডলে সজ্জিত শবরী একাকী বনমধ্যে বিচরণ করিতেছে। শবর শয্যা রচনা করিয়া—প্রেমে রাত্রি অতিবাহিত করিল। এ চিত্রের অন্তরালে আধ্যাত্মিক অর্থ যাহাই থাকুক না কেন—বাহ্যিক দিকে এ চিত্রের সৌন্দর্য ও তাহার কাব্যরূপ পাঠককে মুগ্ধ করে। অনুরূপ আর একখানি চিত্র :

গগনচুম্বী গৃহ, সমস্ত চিন্তা-উদ্বেগ-নির্মুক্ত অবস্থায় শূন্য-রূপ নারীমহলে প্রিয়ার কণ্ঠাশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান ; বাটির পাশে নীচে কাপাস ফুল ফুটিয়াছে—আকাশ ভরিয়া ফুটিয়াছে তারা ফুল, অন্ধকার দূরীভূত হইয়া জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হইতেছে। মাঠে ভবিষ্যৎ প্রাচুর্যের ইঙ্গিত বহন করিয়া স্বর্ণশীর্ষে আন্দোলিত পাকা ধানের মঞ্জরী। শবর শবরীর আর কি চাই ! আনন্দে মত্ত শবর শবরী অনুদিন মহাসুখে বিভোর হইয়া আছে। এ চিত্রের কাব্যোৎকর্ষ উপেক্ষণীয় নহে।

বিষয়বস্তু যত আধ্যাত্মিকই হউকনা কেন তাহাকে প্রকাশ করিবার জন্য যে সকল রূপকল্প ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা আমাদের জীবনের অতি পরিচিত বিভিন্ন জিনিষের। এরূপ রূপকল্প আছে যুদ্ধ-যাত্রার, বিবাহ-যাত্রার। এগুলি কোন পরিপূর্ণ রস সৃষ্টি করিতে না পারিলেও—পাঠকের মনের মধ্যে একটি রম্যবোধকে জাগ্রত করে ও তাহার ফলে কিঞ্চিৎ আনন্দেরও সঞ্চার করে। এরূপ কতকগুলি চিত্রে আছে শৃঙ্গারের আভাষ। এগুলি সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য :

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বি কমলরস পীবমি॥

পদটির আকাঙ্ক্ষার বিষয় ও আবেগ পাঠক চিত্তে বেশ কিছুটা আবেদন সৃষ্টিতে সমর্থ সন্দেহ নাই। অনুরূপ আর একখানি চিত্রে প্রেম নিবেদনের ভঙ্গিটিও বেশ আনন্দদায়ক :

নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ
ছোই ছোই যাইসি ব্রাহ্মণ নাড়িআ ।।
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ ॥
এক সে পদমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥
হালো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে
আইসসি জাসি ডোম্বী কাহরি নাবে ॥

*   *   *

তুলো ডোম্বী হাউঁ কপালী
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী ॥ (১০)

অন্তেবাসী এই ডোম্বী-যোগিনীর প্রেম লাভের জন্য কি গভীর আকাঙ্ক্ষা! তাহার জন্য ত্যাগ স্বীকারও কম নহে,—'ডোম্বী তোমার জন্য আমি নটসজ্জা ছাড়িলাম—তোমার জন্য আমি হাড়ের মালা পর্যন্ত গলায় পরিলাম—এখনও কি তোমার সহিত আমার সাঙ্গা হইবে না?' জানিনা ডোম্বী এ আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল কিনা —কিন্তু যে গভীর আবেগের সহিত এই আকাঙ্ক্ষার কথা উচ্চারিত হইয়াছিল—তাহার আবেদন আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

দুঃখ-বর্ণনার কাব্য-আবেদন সর্বাপেক্ষা বেশী। দেশ-বিদেশের

কবিসাহিত্যিকেরা এ কথা উপলব্ধি করিয়াছেন—এবং এক বাক্যে উচ্চারণ করিয়াছেন—'সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহ'—কিম্বা

"Our sweetest songs are those
that tell of saddest thought."

চর্যাগীতির কবিরাও এ তত্ত্ব অবগত ছিলেন। তাহাদের কাব্যেও তাই দুঃখের ছড়াছড়ি। কতকগুলি চিত্রে দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় পরিপূর্ণ দুঃখ ও অসঙ্গতির যে আভাষ আছে—তাহা পাঠক চিত্তেও অনুরূপ রসের উদ্বোধন করিয়া স্বতই কাব্য পর্যায়ে উন্নীত হইয়া যায়। এরূপ একখানি চিত্রে আছে—নির্দয় দস্যু কর্তৃক ঘরবাড়ী লুন্ঠিত হইবার পর নিদারুণ অসহায় অবস্থার বর্ণনা। অন্য আর এক খানি চিত্রে আছে—দূরে টিলার উপর প্রতিবেশীহীন নির্জনে অবস্থিত একখানি ঘরের চিত্র। গৃহে নিত্যই অন্নাভাব—তবুও অতিথি আবেশীর অন্ত নাই। সংসার দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। হায়, দোহা দুধ কি বাটে ফিরিয়া যায়! সাংসারিক দুঃখের এই অভিঘাতে বুদ্ধির সমতা যায় নষ্ট হইয়া। তাইতো মনে হয়—গাভী হইল বন্ধ্যা, আর বলদ বৎস প্রসব করিল। পাত্র ভরিয়া তাহাকেই তিন সন্ধ্যা দোহন করা হয়। যে বোঝে সেই নির্বোধ, আর যে চোর সেই সাধু!—হাজার বছরের পুরাতন এই চিত্র—দুঃখানুভূতির তীব্রতায় তবুও ইহার আবেদন চির নূতন।

দুঃখানুভূতির তীব্রতা আরও বেশী করিয়া লক্ষ্য করা যায় প্রথম পুত্রবতী দুঃখিনী এক নারীর উক্তিতে—

হাউঁ নিরাসী খমন সাঙ্গঁ
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই॥

ফিটলেসু গো মা এ অন্তউড়ি চাহি।
জা এথু চাহমি সো এথু নাহি॥
পহিল বিআণ মোর বাসনপূড়া।
নাড়ি বিআরন্তে সেব বাপূড়া॥

নারীর দুঃখ প্রকাশের একমাত্র আশ্রয়স্থল মাতা। মাতাকে সম্বোধন করিয়া এই দুঃখপূর্ণ উক্তি : এ দুঃখও নারী জীবনের চরমতম দুঃখ। নারীত্বের পূর্ণতা মাতৃত্বে—সেই মাতৃত্বই আজ দুঃখের আঘাতে ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। ইহা অপেক্ষা নৈরাশ্য আর কি আছে! দুঃখের কথা আর কাহাকে বলিবে—বলিবেই বা কোন মুখে। স্বামী বিরাগী। বাসনার পুটলি এই প্রথম প্রসব—অথচ আঁতুড় নাই, যাহা চাওয়া যায় কিছুই নাই!—আধ্যাত্মিক অর্থ যাহাই হউক—নারী জীবনের এই দুঃখানুভূতির তীব্রতাই কাবতাটীর প্রাণ এবং কবিত্বের দিক দিয়াও তাই সমগ্র চর্যাপদে এই পদটির আসন অনেক উচ্চে।

৯ ॥ চর্যাগীতির উত্তরাধিকার ॥

ইতিহাসের ধারা নিরবচ্ছিন্ন গতিতে বহিয়া চলে। কালের সংঘাতে তাহার অনেক উপাদান হয়তো লোক চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যায়—হয়তো কিছু কিছু—একেবারে স্মৃতিমাত্রও না রাখিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়—তবুও একথা মনে করিবার কারণ নাই যে ইতিহাস কয়েকটি মাত্র আকস্মিক ঘটনার সমাবেশ। সমস্ত ইতিহাস যেমন, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসও তেমনি—সমাজ ও যুগের প্রভাবে প্রভাবিত বাঙ্গালী মানসের ধারাবাহিক বিবর্তনের স্বাক্ষর সমন্বিত বিচিত্র সৃজনী প্রতিভার ইতিহাস। উপাদানের অভাবে অনেক সময়ই আমরা ইহার সম্পর্কে খণ্ডিত ধারণা পোষন করিয়াছি—কিন্তু বস্তুত ইহা খণ্ডিত নহে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ের পুথিখানি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব পর্যন্ত আমরা এই সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাচীনতম রূপটির কল্পনাও করিতে পারিতাম না। আজ সে উপাদানের অভাব দূরীভূত হইয়াছে। প্রাচীনতম কাল হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত আমরা সাহিত্যের প্রত্যেকটি স্তরের কিছুনা কিছু উপাদান সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি—এবং সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারাবাহিকতাও আজ আমরা অনুসরণ করিতে পারি।

কিন্তু শুধু এটুকুই কর্তব্য নহে। লক্ষ্য করিবার বিষয়,—একটি স্তর হইতে আর একটি স্তরে—বিবর্তনের ধারাটি কি? প্রাচীন স্তর

অর্বাচীন স্তরের উপর কি কি প্রভাব রাখিয়া গেল—আধুনিক স্তরই বা কোন কোন স্বকীয় উপাদান লইয়া পূর্ববর্তী স্তর হইতে স্বতন্ত্র হইয়া উঠিল। সমাজ বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলা সাহিত্যের এই ধারাবাহিক ক্রম বিবর্তনের ইতিহাস আজও সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হয় নাই। হওয়া সহজও নহে। কিন্তু হওয়া বাঞ্ছনীয়। এইরূপ ধারাবাহিকতার আলোচনা হয় নাই বলিয়া প্রাচীন কালের সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের মনে অনেক সময়ই অনেক বিচিত্র ধারণা দেখা দিয়াছে। এখনও পর্যন্ত আমাদের অনেকের ধারণা আছে—চর্যাগীতিগুলি প্রাচীন বাঙলার একটি বিশিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধন-সঙ্গীত মাত্র, ইহার না আছে কিছু সাহিত্যিক মূল্য না আছে কিছু ধারাবাহিকতা। তত্ত্বের দিকে অনেক মনীষী আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে চর্যাগীতিগুলির মধ্যেকার সহজিয়া বৌদ্ধদের সাধনা—বিবর্তনের ধারায় সহজিয়া বৈষ্ণব, নাথ সম্প্রদায়, আউল, বাউল ইত্যাদি পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। কথাটির গুরুত্ব নিতান্ত কম নহে। যে সাধনাকে আমরা দোহা ও চর্যাগীতিতে আরম্ভ ও শেষ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম—তাহারই প্রচ্ছন্ন ধারা—সহজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাঙলার বাউল পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে—এ তত্ত্বের মূল্য বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিবার বিষয়ই বটে। কিন্তু আমার মনে হয় তত্ত্বটির মূল্য আরও অধিক। যখন হইতে বাঙ্গালী বাঙলা ভাষা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে ঠিক সেই সময়ে যে দোহা ও চর্যাগুলি বাঙ্গালীর সাধনার সূত্রপাতে অবস্থিত ছিল—তাহা নিতান্তই আকস্মিক ভাবে—আরও কয়েক শতাব্দী ধরিয়া তাহার প্রভাবকে আরও কয়েকটি সাধনার মধ্য দিয়া ক্ষীণ ধারায় প্রসারিত

করিয়া দিয়াছে—শুধু এই পর্যন্ত জানিলেই চলিবে না। এ কথা বলিলে বিস্ময়কর শোনায় বটে—কিন্তু কথাটি সত্য যে—বাঙ্গালীর জীবন ধারার সূত্রপাতের ঐ চর্যাগুলি—ধারাবাহিক বাঙ্গালী জীবন-চর্যারও স্বাক্ষর বহন করে। ঐ গীতিগুলির মধ্যেই বাঙ্গালী জীবনের মূল সূত্রগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। যুগে যুগে রং পাল্টাইয়া ঐ সাধনা, ঐ জীবন-বোধই বাঙ্গালী চৈতন্যে বিরাজ করিয়াছে ও বাঙ্গালীয়ানার নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

চর্যাগীতিগুলির ধর্ম ও দার্শনিকতা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা যাহা লক্ষ্য করিয়াছি—তাহার মূল সূত্রগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করিলে দাঁড়ায় যে—(ক) ইহার দার্শনিকতার মূলে যদিও বিবর্তিত বৌদ্ধ ধর্ম তবুও সমন্বয়ই ইহার মূল সুর। বিবর্তিত বৌদ্ধধর্মের কাঠামোর উপর বেদান্ত, যোগ ও তন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন সাধনার ধারা মিলিত হইয়া চর্যাগীতির দার্শনিক পটভূমিটি রচনা করিয়াছে। (খ) যে কারণেই হউক চর্যাগীতিকবিদের জীবন সম্পর্কে একটি ঔদাসীন্যের ভাব আছে। এ ঔদাসীন্য ঠিক পরিপূর্ণ বৈরাগ্যের ঔদাসীন্য নহে—এ ঔদাসীন্য যেন কবিত্ব মিশ্রিত ঔদাসীন্য। জীবনকে গ্রহণ করিতে হইবে—তাহার স্বরূপ মাধুর্যকে উপলব্ধি করিতে হইবে তবুও যেন "তেন ত্যাক্তেন ভুঞ্জীথা ঃ মাগৃধঃ কস্যাস্বিদ্ধনম্।" (গ) সাধনার ধারায় আচার অনুষ্ঠানের বাহুল্য নাই—বরং আছে আচার অনুষ্ঠান বাহুল্যের প্রতি বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ। প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদী মনোভাবই তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—'সহজ সাধনার' পথে। এই সহজ সাধনাই চর্যার সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। (ঘ) সহজ সাধনার অনুসিদ্ধান্ত হিসাবেই দেখা দেয়—মানব তন্ত্র। তন্ত্রের দিকে

সহজ সাধনা-যে বলে—মানুষের দেহভাণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ড—তাহাই সাধকের দৃষ্টিতে মানুষের গৌরবকে বাড়াইয়া তে'লে। মানবতন্ত্র তাই সহজ সাধনার অনুষঙ্গী। ভারতীয় পটভূমিতে বাঙ্গালীর জীবন ও সাধনাকে বিশ্লেষণ করিলে—আমার মনে হয় পূর্বোক্ত এই বৈশিষ্ট্য এবং সূত্রগুলি স্পষ্টভাবেই যুগে যুগে প্রবাহিত হইতে দেখা যাইবে। অবশ্য বাহিরের নানা প্রভাব ইহার রং অনেক পাল্টাইয়া দিয়াছে—কিন্তু ধারা-বাহিকতার সূত্রটিও দুর্লক্ষ্য নহে।

বাঙ্গালীর জীবনে ও সাধনায় সমন্বয়ের সুরটিই, মনে হয়, প্রধান সুর। আর্যপূর্ব বাঙলা দেশ কোন একটি বিশিষ্ট জাতির বাসভূমি ছিল না—একাধিক অনার্য জাতি এখানে বাস করিত,—পরে তাহার সহিত মিশিয়াছে—আর্যরক্ত। আধুনিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে বাঙ্গালীর দেহে কোন বিশিষ্ট জাতির বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত নাই। বাঙ্গালীর দেহ গঠনে আছে বিভিন্ন জাতির বিচিত্র উপাদানের সমন্বয়। দেহে যেমন, বাঙ্গালীর মনেও তেমনি এই বিচিত্রের সমন্বয়। রবীন্দ্রনাথ ভারত-তীর্থের মধ্যে ভারতবর্ষের যে সমন্বয়ের গীতি গাহিয়াছেন তাহা বিশেষ করিয়া সত্য বাঙলা দেশে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে দুঃখ করিয়া 'বাঙলা সকলের' বলিয়া যে উক্তি করিয়াছিলেন—দুঃখ না করিয়াও বাঙ্গালীর মনো-জীবন সম্পর্কে সে কথা বলা চলে। বস্তুত বাঙ্গালীর এমন একটিও সাধনা নাই যেখানে 'সমন্বয়' প্রভাব বিস্তার করে নাই। বাঙ্গালীর সাধনায় বৈষ্ণব-শাক্ত-বেদ-তন্ত্র সর্বদাই একাকার। অদ্বৈতবাদী বেদান্তের আনন্দ-ভাবনাই বৈষ্ণব সাধনার মূলে। এই অদ্বৈতবাদী

আনন্দভাবনা। বৈষ্ণব তন্ত্রে আসিয়া সমন্বয়ের প্রভাবে হইল ‘অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ’, ‘দ্বৈতাদ্বৈত বাদ’। দ্বৈতবাদী শাক্তেরা অদ্বৈতবাদের প্রভাবে পড়িয়া—নির্বিঘ্নে বলিয়া বসিলেন—‘তারা আমার নিরাকারা’। সাকার শক্তি নিরাকার পরমব্রহ্ম-র সহিত একাকার হইয়া গেলেন। মাধুর্যের উপাসক বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের রূপটিকেও বাদ দিতে পারেন না। আবার ঐশ্বর্যের সাধক শাক্তেরা মায়ের মাধুর্যমিশ্রা রূপটিকে যেন রসাইয়া রসাইয়া রূপ দিয়া তোলেন। সাধনার ক্ষেত্রে এই সমন্বয়ের ধারাটি একেবারে আধুনিক কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। রামমোহন—দেবেন্দ্রনাথ—রামকৃষ্ণ-পরমহংস ইত্যাদির Neo-Hinduism বা Revivalism আন্দোলনের ভিত্তিই এই সমন্বয়ে। বাঙ্গালীর জীবন ও সাধনার ক্ষেত্রে এই সমন্বয়ের সাক্ষ্য বহন করিয়া আসিতেছে—বাঙালীর সাহিত্য—শুধু বিষয় বস্তুতেই নহে—রূপকল্পে, form এও। এই সমন্বয়ের চরম প্রমাণ রবীন্দ্র-সাহিত্য। দেশী বিদেশী সকল সুরের সঙ্গমতীর্থ রবীন্দ্র-ভারতী। এমন কি রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য সাধনায়ও সেই সমন্বয়ের ধারাটি সমানে অব্যাহত ভাবে চলিয়াছে। ইহার মূল কারণই বাঙ্গালীর জীবনচর্যার মূল সূত্র—‘দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে’।

বাঙ্গালীর সাধনা রূপে সমন্বয়ী, স্বরূপে তাহা ‘সহজ’। এই সহজ সাধনা একমাত্র বাঙ্গালীরই একান্ত নিজস্ব নহে—তবুও একথাটী সত্য যে এই সহজসাধনা বাঙ্গালী জীবনে যতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ভারতীয় অন্য কোন প্রদেশে তাহা সেরূপ পারে নাই। কবীর, দাদু প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সন্তদের সাধনার স্বরূপটিও ‘সহজ’ সন্দেহ নাই।

কিন্তু একথা নিশ্চয় করিয়া বলিবায় উপায় নাই যে—তাহার উপর বাঙ্গালীর প্রভাব ছিল না। অন্তত সম`স্বর দিক দিয়া তাঁহারা চর্যাপদের পরের যুগের। সুতরাং অসম্ভব নহে যে তাহাদের উপর বাঙ্গালী জীবনচর্যার প্রভাব কিছু থাকিবে। কিন্তু সে আলোচনা থাক। আপাততঃ আমরা লক্ষ্য করিব—বাঙ্গালীর এই সহজ সাধনার বিবর্তন। বাঙলার প্রকৃতির মধ্যেই এমন উপাদান আছে যাহা বাঙালীকে উদাস করিয়া তোলে—অথচ ইহার প্রাণমাতানো সৌন্দর্যকে একেবারে পরিত্যাগও করা চলে না। বাঙ্গালীর বৈরাগ্য ও সৌন্দর্য সাধনা তাই একত্রেই চলে। সহজ সাধনার মূলেও এই মনোভাব। জীবনের রূপরস আনন্দ গন্ধের মধ্য দিয়া, জীবনের মধ্য দিয়া জীবননাথের অনুসন্ধান। জীবনের সহজ বৃত্তি-প্রবৃত্তিগুলিকে নিরুদ্ধ করিয়া বিকৃতির পথে নহে—সেই বৃত্তিগুলির প্রকাশের মধ্যেই সাধনা।. নিরঙ্কুশ উপভোগ ইহাদের উদ্দেশ্য নহে,—উপলব্ধিই চরম। সহজ সাধনার দার্শনিক ভিত্তিটি সাধারণত হয় মায়াবাদী; তবুও বেদান্তের মায়াবাদ বলিতে ঠিক যাহা বোঝায়—ইহাদের মায়াবাদের উগ্রতা তত নহে। ইহারা জগৎকে মিথ্যা বলে বটে—তাহা জগতের রূপ হইতে স্বরূপের দিকে দৃষ্টিকে পরিচালিত করিবার জন্য। 'আদিতে অনুৎপন্ন এই জগৎ ভ্রান্তিতে প্রতিভাসিত হইতেছে' —একথাও যাহাদের উক্তি—'নানা তরুবর মুকুলিত হইল, গগনেতে ডাল লাগিল'—বলিয়া, আধ্যাত্মিক অর্থে হইলেও, এই জাগতিক সৌন্দর্যের চিত্রও তাহারাই অঙ্কন করেন। জগতের তত্ত্বজ্ঞান দুলক্ষ্য বিজ্ঞান (দুলকৃখ বিণাণা)—সুতরাং তাঁহাদের নির্দেশ—'অনুভব সহজ মা ভোলরে জোঈ'। তত্ত্বের দিকে এই সহজসাধনা এবং তাহার

আনুষঙ্গিক দেহতত্ত্ব ইত্যাদি—বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যেও প্রসারিত হইয়াছে। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তত্ত্বের দিকে এই ধারাবাহিকতা অতি নির্ভুল ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দেখাইয়াছেন—বৈষ্ণব সহজিয়াদের সাধনার সমস্ত দিকই বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনার সহিত অভিন্ন—কেবলমাত্র প্রেমের রূপকে তত্ত্ব ব্যাখ্যায় বৈষ্ণব সহজিয়াদের অভিনবত্ব। কিন্তু আমার মনে হয় এই দিকেও বৈষ্ণব সহজিয়ারা যে একেবারে স্বতন্ত্র বা কেবলমাত্র বৈষ্ণব ধারার প্রভাবে প্রভাবিত— তাহাই নহে। এখানেও চর্যাগীতির প্রভাব আছে। চর্যাগীতিতে প্রেম নাই—একথা ঠিক। কিন্তু প্রেমের প্রত্যক্ষ পূর্বাভাষ আছে। চর্যাগীতির অর্থাৎ সহজিয়া বৌদ্ধদের মহাসুখ পরিকল্পনা একদিকে যেমন বুদ্ধদেবের 'নির্বাণে'র দুঃখনিবৃত্তি ধারণা ও বেদান্তের আনন্দবাদের সমন্বয় অন্যদিকে তেমনি তন্ত্রের প্রভাবে ইহাই আবার পুরুষ প্রকৃতির মিলন মহারসের উপলব্ধি। এই মহাসুখ পরিকল্পনার মধ্যেই আছে সহজসাধনার প্রেমের বীজ। প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যা বা প্রাধান্য না থাকিলেও সহজসুন্দরীকে লইয়া প্রেমের কয়েকখানি মনোরম চিত্র চর্যাগীতিতে আছে। অস্বীকার করিবার উপায় নাই সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার ক্ষেত্রে ইহা ছাড়াও আছে মূল বৈষ্ণব ধর্ম ও সূফী মতের প্রভাব; কিন্তু বীজাকারে প্রেমের অস্তিত্ব চর্যাগীতিতেও ছিল এবং তাহার প্রভাবও স্বীকার না করিয়া লাভ নাই।

প্রেমের এ অস্তিত্ব না থাকিয়াও পারে না। যেখানে মানুষের দেহের মধ্যেই সকল তত্ত্ব নিহিত বলা হইতেছে, যেখানে মানুষের সহজ প্রবৃত্তিকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে, সাধন পদ্ধতিতে যেখানে

দুইকে অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে—সেখানে যে আকারেই হউক প্রেমের অস্তিত্ব থাকিতে বাধ্য। নানা কারণে চর্যাগীতিতে এই প্রেম প্রচ্ছন্ন, বৈষ্ণব সহজিয়া সঙ্গীতে তাহা প্রত্যক্ষ। বাউল সঙ্গীত গুলিতে—এই প্রেমই আবার অন্য আর একটি বিশিষ্ট মূর্তি ধরিয়া আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। এখানে প্রেম অন্য কোন বাহ্য শক্তি বা প্রকৃতির সহিত নহে—তাহা নিজের মনের মানুষেরই সহিত। এই 'মনের মানুষ' পরিকল্পনা—বাউলদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখানেও কিন্তু চর্যাগীতি ও দোহাকোষের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নহে। দোহা ও চর্যাগুলির মধ্যে—দেহ প্রাধান্যের কথা প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি—সহজকে তাঁহারা দেহের মধ্যে কল্পনা করিতে যাইয়া এক নৈর্ব্যক্তিক পুরুষের কল্পনার পূর্বাভাষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ঃ

পণ্ডিঅ সঅল সথ বকৃখাণই।
দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই॥

অথবা ঘরে অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই।
পই দেকৃখই পড়িবেসী পুচ্ছই॥

ইত্যাদি দোহাগুলিতে দেহ-ঘরে যে বুদ্ধের অবস্থিতি কল্পনা করা হইয়াছে—তাহার সহিত বাউলের 'মনের মধ্যে মনের মানুষের' কল্পনার যোগসূত্র স্থাপন করা চলে। 'আছে এক মনের মানুষ পরম পুরুষ দেহের মাঝে বিরাজ করে'—বাউলের এই গান, অথবা—

'দেহের মধ্যে আছেরে সোনার মানুষ ডাকলে কথা কয়,
তোমার মনের মধ্যে আর এক মন আছে গো।
তুমি মন মিশাও সেই মনের সাথে
দেহের মধ্যে আছেরে মানুষ ডাকলে কথা কয়।'

এইরূপ আরও বহুগানে মনের মানুষের যে কল্পনা আছে—তাহা মূল সহজ সাধনা ও প্রেম ভাবনারই এক বিশেষ বিকাশ।

এই ধারার শেষ কিন্তু এইখানেই নয়। বাউলদের এই ধারা—রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করিয়াছে প্রচুর পরিমাণে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বহু আলোচনায় তাঁহার উপর বাউল প্রভাবের কথা স্বীকার করিয়াছেন। হারামণি ১ম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি নিজেই লিখিয়াছেন: "আমার লেখা যারা পড়েছেন, তাঁরা জানেন বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি আমার লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদলের সঙ্গে আমার সদা-সর্বদাই দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হ'ত। আমার অনেক গানে আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগিনীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী আমার মনের মধ্যে সহজভাবে বিঁধে গেছে।" এই 'সহজভাবে বিঁধে গেছে' কথাটা একান্তভাবে সত্য। 'Religion of Man' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যখন তিনি প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সহিত নিজের অন্তরের আধ্যাত্মিক চিন্তার মিলন ঘটাইতে পারিতেছিলেন না তখন এই বাউলদের 'মনের মানুষ' পরিকল্পনাই তাহাকে পথের সন্ধান দিয়াছে। পূর্ব হইতেই তিনি 'অন্তরতর যদয়মাত্মা' এই বাণীর সহিত পরিচিত ছিলেন। বাউলদের মুখের 'মনের মানুষ' ও পরম পুরুষকে তিনি এক করিয়া লইলেন—এবং তাঁহার কাব্য-সঙ্গীতেও তাহাকে রূপ দিলেন বারবার :—

ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব স'্গল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।

এই অন্তরতম ও মনের মানুষে সাদৃশ্য অতি স্পষ্ট। এই সাদৃশ্য আরো স্পষ্ট করিয়া লক্ষ্য করা যায় কতকগুলি গানে—যেগুলি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "রবীন্দ্র বাউলের রচনা" ঃ

আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে।
সে আছে ব'লে
আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে,
প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে॥
সে আছে বলে চোখের তারার আলোয়
এত রূপের খেলা রঙের মেলা অসীম সাদায় কালোয়।
সে মোর সঙ্গে থাকে ব'লে
আমার অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগায় দখিন সমীরণে॥ ইত্যাদি।

অথবা আমি কান পেতে রই আমার আপন হৃদয় গহন দ্বারে
কোন গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা শুনিবারে।
ভ্রমর সেথা হয় বিবাগি নিভৃত নীলপদ্ম লাগি রে
কোন রাতের পাখি গায় একাকী সঙ্গিবিহীন অন্ধকারে॥
কে সে আমার কেই বা জানে, কিছু বা তার দেখি আভা।
কিছু বা পাই অনুমানে, কিছু তাহার বুঝি না বা।
মাঝে মাঝে তার বারতা আমার ভাষায় পায় কী কথা রে,
ও সে আমায় জানি পাঠায় বাণী গানের
তানে লুকিয়ে তারে॥

অনুরূপ অসংখ্য সঙ্গীতের উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের রচনায় সহজেই মেলে।

বাঙ্গালী সাধনায় আর একটি চিরবৈশিষ্ট্য—মানব মাহাত্ম্যের উপলব্ধি। মানুষ ও মাটিকে পরিত্যাগ করিয়া, জগৎ ও জীবনকে অতিক্রম করিয়া যে সাধনা—বাঙলার মাটীতে তাহা কোনকালেই বিশেষ প্রশ্রয় পায় নাই। এই জন্যই শুদ্ধজ্ঞান অপেক্ষা কর্ম ও ভক্তির পথ চিরকালই বাঙলাদেশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ন্যায়ের চর্চা বাঙলাদেশে প্রচুর হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা তান্ত্রিক কর্মকাণ্ড ও বৈষ্ণব প্রেমের নিকট পরাস্ত হইয়াছে। বাঙ্গালীজীবনে এই কর্ম ও ভক্তির প্রাধান্যের কারণ বাঙ্গালী মানুষকে চিরকাল বড় করিয়া দেখিয়াছে। এই মানুষকে বড় করিয়া দেখা একদিকে যেমন আনিয়াছে—'সহজ সাধনা'র ধারা, অন্যদিকে তাহারই অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে আসিয়াছে—মানবিকতার মূল্যবোধ। বৌদ্ধ-সহজিয়ারা তন্ত্র ও যোগ হইতে এই সত্য লাভ করিয়াছিলেন যে বিশ্বের সকল তত্ত্ব আছে মানুষের দেহভাণ্ডে;—এই দেহতত্ত্বই জন্ম দিয়াছে বৈষ্ণব সহজিয়াদের 'মানব তন্ত্র'। চণ্ডীদাসের বিখ্যাত উক্তি:

> "শুনহ মানুষ ভাই,
> সবার উপরে মানুষ সত্য
> তাহার উপরে নাই।"

শুধু মাত্র তান্ত্রিক অর্থেই সত্য নহে—বাস্তব মানবিকতার অর্থেও সত্য। কথাটি শুনিতে একটু বিস্ময়কর বলিয়াই মনে হয়। সমগ্র প্রাগাধুনিক যুগ ধরিয়া বাঙলা সাহিত্যের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছি—

অন্ততঃ আপাতদৃষ্টিতে—মানুষকে দেবতার হাতের ক্রীড়নক করিয়া দেবতার মহিমা প্রচারের চেষ্টা। সেখানে মানবমাহাত্ম্যের এই উক্তি কি করিয়া সম্ভব! কিন্তু কথাটি সত্য। মধ্যযুগে দেবপ্রাধান্য স্বাভাবিক—এবং মানবতন্ত্র বা মানবিকতা বলিতে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির সংস্পর্শে আসিবার পর হইতে যে ধারণা আমরা লাভ করিয়াছি—ঠিক সেই অর্থে মানবিকতাকে আমরা মধ্যযুগে কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু যেটুকু আছে তাহাই বিস্ময়ের এবং তাহার সূত্রপাত বাঙলা সাহিত্যের আদিযুগ হইতে। বৌদ্ধ সহজিয়ারা মানুষের মধ্যেই সমস্ত তত্ত্ব, এই কথা বলিয়া মানুষকে যেটুকু মহিমা দিলেন—তাহাই আর একটু বৃহত্তর সার্থকতায় ভরিয়া উঠিল—সহজিয়া বৈষ্ণবদের হাতে। অতি ক্ষীণ হইলেও এই মহিমা-বোধের ধারা মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে অন্যান্য বিভাগেও লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা প্রবাহিত হইয়াছে—মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্য দিয়া। এই মঙ্গলকাব্যগুলি স্পষ্টতঃ দেব-মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যেই রচিত। কিন্তু তবুও ইহার মধ্যে একমাত্র চাঁদসদাগরের চরিত্র উল্লেখ করিয়াই বলা চলে যে মানুষকে বড় করিবার দৃষ্টি চিরকালই কবিদের ছিল—কিন্তু পারিয়া উঠেন নাই কেবল ভয়ে। চাঁদ যেন কোন ব্যক্তি-চরিত্র নহে—চাঁদ যেন দেবতার অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের যুগসঞ্চিত বিদ্রোহের বাণীর প্রতীক। অবশ্য শেষ পর্যন্ত চাঁদকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে, কিন্তু সে পরাজয়ও দেবতার ভয়ে নহে, স্নেহের নিকট। এই পরাজয়ও এক হিসাবে মানব-মাহাত্ম্যই ঘোষণা করিতেছে। চাঁদ প্রস্তরে গঠিত একটি আদর্শবাদী সত্ত্বা নহেন—

তিনি রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ, তাই স্নেহের কাছে তাঁহার পরাজয় স্বাভাবিক।

'মধ্যযুগের সাহিত্যের আর একটি বিরাট শাখা—বৈষ্ণব পদাবলী। বৈষ্ণব পদাবলীর দার্শনিক পটভূমি অনস্বীকার্য। প্রেমে আধ্যাত্মিকতা এবং রাধাকৃষ্ণের মাধ্যম সেখানে আছে—তবুও বিখ্যাত 'বৈষ্ণব কবিতা' নামক কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ যে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন—তাহাকেই উত্তর ধরিয়া আমরা বলিতে পারি—রাধাকৃষ্ণ প্রতীকের মধ্য দিয়া বৈষ্ণব কবিরা মানুষের প্রেমকেই রূপ দিয়াছেন। ইহার পশ্চাতে একটি আধ্যাত্মিক প্রেরণা ছিল সন্দেহ নাই—কিন্তু সেই আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও মানবিক চেতনায় তো কোন বিরোধ নাই। প্রেমের ক্ষেত্রে থাকেও না। প্রেম মানুষের মনের এমনই একটি বৃত্তি—যেখানে দেবে মানবে একাকার হইয়া যায়—'যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা'। সুতরাং বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমের অসীমতা মানবিক প্রেমেরই উদ্‌গতি বা Sublimation এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমের চিত্রের নামে দীন মর্ত্যবাসীর প্রেমচ্ছবি, তাহাদেরই চিত্ত দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতার চিত্রই অঙ্কন করা হইয়াছে—একথা বলিলে খুব অত্যুক্তি হয় না।

মধ্যযুগের শাক্ত পদাবলীতেও এই মানুষের ছবি। সেখানেও মাতা ও কন্যা; সেখানেও বাঙ্গালী কন্যার গৌরী দানের চিত্র—সেখানে অল্পবয়স্কা মূঢ় বালিকার পতিগৃহে যাত্রা, বৎসরান্তে তিনটি দিনের জন্য পিতৃগৃহে আগমন এবং আবার শোকের উদ্বেলতার মধ্যে পতিগৃহে প্রত্যাবর্তন—একেবারে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারের নিখুঁত চিত্র। মেনকা ও গৌরী শুধু ছলনা—উদ্দিষ্ট সেখানে আমাদেরই ঘরের অতি পরিচিত স্নেহ-নির্ঝর মাতা ও কন্যা। এমন কি—শাক্ত

পদাবলীর যে কবিতাগুলি আগমনী বিজয়ার নহে—তাহাতেও ভক্ত ও মাতায় যে লীলা তাহাও নিতান্তই পার্থিব বাৎসল্যের লীলা। আর যেখানে তত্ত্বকথা—সেখানেও আছে—

মন রে কৃষিকাজ জানো না
এমন মানব-জমিন্ রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।

কৃষিকাজ নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক কর্ষণ—কিন্তু ক্ষেত্রটি সেই মানব-জমিন। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই মানুষেরই কথা।

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে এই যেটুকু মানব মাহাত্ম্যবোধ আছে—তাহাই বিস্ময়ের এবং পূর্বেই বলিয়াছি—ইহাই বাঙ্গালীর মজ্জাগত। নানা কারণে হয়ত সর্বদা ইহা সমানভাবে স্ফুরিত হইতে পারে নাই—কিন্তু কেবল মাত্র চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের উক্তি দুইটিকেই উল্লেখ করিয়া বলা চলে—প্রাগাধুনিক যুগের বাঙ্গালীর মানবিকতা বোধকে প্রমাণ করিবার জন্য—ইহাই যথেষ্ট দলিল।

আমাদের ধারণা আছে—উনবিংশ শতাব্দীতেই আমরা প্রথম মানবিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ হইলাম—এবং তাহা সম্ভব হইল ইংরাজী শিক্ষা সভ্যতার সংস্পর্শে। কথাটা আংশিক সত্য। আমাদের মানবিকতা বোধ সম্পূর্ণ হইল উনবিংশ শতাব্দীতে—ইহার উন্মেষ ঘটিয়াছিল বাঙ্গালী জীবনের জন্মলগ্নে। এই বিবর্তনেরই একটি বিশেষ স্তর রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের মানবিকতাবোধ সম্পর্কে আলোচনা করিবার অবসর এখানে নাই, সুধী পাঠকের নিকট তাহার প্রয়োজনও নাই। শুধু কেবল এই কথাটিই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই—রবীন্দ্রনাথকে কেবল মাত্র আধুনিক সভ্যতার বা

শিক্ষার পরিণত ফল হিসাবে যাহারা ভাবেন তাহারা একদেশদর্শী। রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শনে প্রায় প্রতিটি স্তরে আছে—প্রাচীন ও নবীনের সমান প্রভাব; তাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মানবিকতার মূল্যবোধ বিশ্লেষণে, চর্যাগীতির সূত্রপাতে যে মানবিকতা বোধের জন্ম, সেই ধারার অনুবর্তনকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

বাঙ্গালীর জীবন-চর্যা ও সাহিত্য সাধনার অন্তরঙ্গে (Content-এ) আমরা এতক্ষণ চর্যাগীতির ধারার অনুবর্তন লক্ষ্য করিলাম। অবশ্য আমার বক্তব্য এই নহে যে চর্য্যাগীতির মধ্যে যে বস্তু আমরা পাইয়াছি যুগ যুগ ধরিয়া তাহাই ভাঙ্গাইয়া খাইতেছি। আমার বক্তব্য এই যে—বাঙ্গালীর জীবন সাধনা তথা সাহিত্য সাধনার কয়েকটি মূল বস্তু যাহা আমরা চর্যাগীতির মধ্যে লাভ করিয়াছি—তাহাই যুগে যুগে কিছু কিছু রঙ পাল্টাইয়া, মাঝে মাঝে অন্য প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া, এবং মাঝে মাঝে ক্ষীণ ও প্রচ্ছন্ন হইলেও, অক্ষুণ্ণ ধারায় প্রবাহিত। বাঙ্গালীর সাহিত্যিক রূপ কর্মের বহিরঙ্গের মধ্যেও—এই অনুবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। পদাকারে মুক্তক বা খণ্ড কবিতা রচনা করা বাঙ্গালীর সাহিত্য-সাধনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, সবই এই পদাকারে সাহিত্য সাধনা। এমন কি বৃহৎ আকার মঙ্গলকাব্যগুলিতেও অনেক ক্ষেত্রে পদাকারে কাব্য রচনার চেষ্টা আছে। এই পদাকারে কাব্য রচনার—প্রথম বাঙলা প্রমাণ—চর্যাপদগুলির মধ্যে আছে। 'মধুর কোমল কান্ত পদাবলী' স্রষ্টা জয়দেব—চর্যাগীতির পরের আমলের, সুতরাং গৌরব জয়দেবের নয়—গৌরব চর্যাকারদেরই প্রাপ্য।

এই পদগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য—ঠিক বহিরঙ্গে নয়—অন্তরঙ্গে

—ইহার গীতি-কবিতার সুর। এখানে আকার ও প্রকারে মাখা-মাখি, কারণ আকারে সংক্ষিপ্ত না হইলে গীতি-কবিতা রচনা সম্ভব নয়। পরম সুখের বিষয় বাঙ্গালীর সাহিত্য-সাধনার মূল সুর—এই গীতি-সুর বা Lyricism-এর সূত্রপাত চর্যাগীতিগুলিতে। অন্যদিকে—চর্যাগীত-রীতি হইতে কীর্তনের উৎপত্তি একথা জোর করিয়া বলা না গেলেও—একথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে চর্যাগীতিগুলি যেমন সামাজিকভাবে একক ও সম্মেলক গীত হইত—তেমনি গীতধারা প্রবাহিত হইয়াছে বাঙালীর চিরকালের সামাজিক জীবনে—কীর্তনে—শাক্তদের গানে—ব্রাহ্ম-সঙ্গীতে।

সুতরাং একথা মনে করিবার কারণ নাই—চর্যাগীতি বাঙ্গালী জীবনে ও সাহিত্য-সাধনায় বিশেষ একটি যুগের বিশেষ একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক সাধন-সঙ্গীত মাত্র,—ইহার না আছে কোন অনুবৃত্তি—না আছে কোন উত্তর প্রভাব। চর্যাগীতির ভাবধারা ভুঁইফোড় কিছু নহে। বাঙ্গালী জীবনের বিশেষ একটি পর্যায়ে সমাজের সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই ইহার উদ্ভব হইয়াছিল—আবার বাঙ্গালী জীবন ও সমাজের বিবর্তনে—তাহার সেই মূল ধারাগুলি সাহিত্যের বিভিন্ন রূপকর্মের ভিতর দিয়া আধুনিক কাল পর্যন্তই প্রবাহিত হইয়াছে।

১০ ॥ পরিশিষ্ট ॥

। মূলগীতি-ব্যাখ্যাসংকেত-মন্তব্য ।

১

রাগ পটমঞ্জরী

(কাআ তরুবর পঞ্চ-বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ ॥ ধ্রু ॥)
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিআই ॥ ধ্রু ॥
(এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি লেহুরে পাস ॥ ধ্রু ॥
ভণই লুই আমহে সাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা ॥ ধ্রু ॥ [লুই])

পদটিতে চর্যার দার্শনিক পটভূমি, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও সাধন পদ্ধতির সুন্দর নিদর্শন মেলে। গুরুর উপর নির্ভরশীলতা, আচার অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়িতে বিরাগ ও তান্ত্রিক পদ্ধতিতে মহাসুখ লাভের ইঙ্গিতও লক্ষণীয়।

পইঠো—প্রবিষ্ট; মহাসুহ—মহাসুখ; ভণই—ভণে; পুচ্ছিঅ—জিজ্ঞাসা করিয়া; সমাহিঅ—সমাধিদ্বারা; কাহি—কি; করিঅই—করা যায়; মরিআই—মারা পড়ে; এড়ি—পরিত্যাগ করিয়া;

এউ—এই ; ছান্দক—ছন্দের অর্থাৎ বাসনার ; করণক—ইন্দ্রিয়ের ; পাটের—পারিপাট্যের ; আস—আশা · সুনুপাখ—শূন্যপক্ষ ; ভিতি—ভিত্তি ; লেহু—লও ; পাস- পার্শ্ব ; সাণে—সংজ্ঞায়, ইশারায় (পাঠান্তর ঝাণে—ধ্যানে) ; দিঠা—দৃষ্ট ; ধমণ চমণ—ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী দ্বয়ের বৌদ্ধতান্ত্রিক নামান্তর ; বেণি—দুই ; পাণ্ডি—পিঁড়ি ; বইঠা—উপবিষ্ট ; ধ্রু—ধ্রুবপদ।

২

রাগ গবড়া

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তিলি কুম্ভীরে খাই ॥
আঙ্গণ ঘরপণ সুন ভো বিআতি।
কানেট চোরি নিল অধরাতী ॥ ধ্রু ॥
সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ ॥ ধ্রু ॥
দিবসই বহুড়ী কাগডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥ ধ্রু ॥
অইসন চর্য্যা কুক্কুরী পাএঁ গাইড়।
কোড়ি মঝেঁ একু হিঅহিঁ সমাইড় ॥ ধ্রু ॥

[কুক্কুরীপাদ]

পদটির আদ্যোপান্ত হেঁয়ালি ভাষায় রচিত। সাধারণ শব্দার্থের অন্তরালে তান্ত্রিক পারিভাষিক অন্য অর্থ উদ্দিষ্ট।

দুলি—কচ্ছপ, এখানে দুই, দ্বৈতত্ব বুঝাইতেছে ; পিট—পীঠ, নাভিমূলে অবস্থিত মণিপুর চক্র ; রুখের—বৃক্ষের অর্থাৎ দেহবৃক্ষের ;

তেন্তিলি—তেঁতুল, এখানে বোধিচিত্ত ; কুম্ভীরে—কুম্ভক যোগদ্বারা ; আঙ্গণ—অঙ্গন, বিরমানন্দের স্থান ; ঘর—মহাসুখ চক্র ; বিআতি ও বহুড়ী—অবধুতিকা ; কাণেট—কর্ণভূষণ অর্থাৎ প্রকৃতিদোষ ; চোর—সহজানন্দ ; রাতি—সহজানন্দে বিলীন হইবার পূর্ব মুহূর্ত, নিবৃত্তি ; দিবস—প্রবৃত্তি, চিত্তের জাগ্রতাবস্থা ; সসুরা—শ্বশুর, শ্বাস ; কামরু—কামরূপ, মহাসুখচক্র। কা গই—কোথায় যাইয়া ; মাগঅ—মাগে, অনুসন্ধান করে ; কাগডরে—কাকের ভয়ে ; ভইলে—হইলে; অইসন—এইরূপ ; গাইড়—গাইল ; কোড়ি—কোটি ; একু—একের; হিঅহি—হৃদয়ে ; সমাইড়—প্রবেশ করিল।

গুরুর উপদেশে কুম্ভক যোগদ্বারা ইড়া পিঙ্গলাকে বশীভূত করিয়া বোধিচিত্তকে নিঃস্বভাবীকৃত করিয়া তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সহজানন্দ লাভের কথাই পদটির বক্তব্য। দুইকে দোহন করিলে অর্থাৎ দ্বৈত-জ্ঞান বিনষ্ট হইলে শক্তিকে আর মণিপুর চক্রে ধরিয়া রাখা যায় না। তাহা ঊর্ধ্বগামী হয়। কুম্ভক যোগ অভ্যাসে সংবৃতি বোধিচিত্ত নষ্ট হয়। চিত্তের সংবৃতি অবস্থায় অবধূতিকা ভীত হয় কিন্তু প্রকৃতিদোষ-মুক্ত সহজানন্দ অবস্থায় অবধূতিকা মহাসুখচক্রে প্রবেশ করে। পদটিতে সন্ধাভাষার চূড়ান্ত। সাধনতত্ত্বের গোপনীয়তার জন্যই স্বেচ্ছাকৃত এই প্রয়াস। ভণিতাতেও পদকর্তা গোপনতার ইঙ্গিত দিয়াছেন।

৩

রাগ গবড়া

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ ॥ ধ্রু ॥
সহজে থির করি বারুণী সান্ধ।
জেঁ অজরামর হোই দিঢ় কান্ধ ॥ ধ্রু ॥
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥ ধ্রু ॥
চউশঠী ঘড়িয়ে দেত পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা ॥ ধ্রু ॥
এক ঘড়ুলী সরুই নাল।
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল ॥ ধ্রু ॥ [বিরুআ]

শুণ্ডিনি—অবধূতিকা; দুই—দুইকে, ইড়া পিঙ্গলাকে; ঘরে—মধ্য নাড়িতে; সান্ধঅ—প্রবেশ করায়; চীঅণ—চিকণ, অবিদ্যামল শূন্য; বাকলঅ—বাকল দ্বারা; বারুণী—মদ, সুখ প্রমোদ স্বরূপ বোধিচিত্ত; সহজে—সহজানন্দে; দিঢ়কান্ধ—দৃঢ়স্কন্ধ; দশমিদুআরত—দশম দ্বারে; দেখইআ—দেখিয়া; গরাহক—গ্রাহক; চউশঠী ঘড়িয়ে—চৌষট্টি ঘড়ায়; পইঠেল—প্রবেশ করিল; ঘড়ুলী—ছোট ঘড়া, গাড়ু; নাল—নল।

পদটিতে মদ্যবিক্রয়ের রূপকে যৌগিক পদ্ধতির বর্ণনা। দেহামৃত সোমরস সহস্রার পদ্মে রক্ষিত হয় এবং সেখান হইতে শঙ্খিনী নামক সরু বক্র নলপথে নিম্নগামী হয়। যোগমতে, শঙ্খিনীর এই মুখ দশম দ্বার। এই দশমদ্বার বন্ধ করিয়া সোমরসকে রক্ষা করা প্রয়োজন।

ইড়া পিঙ্গলাকে মধ্য নাড়ী অবধূতিকায় প্রবিষ্ট করিয়া, এবং দেহামৃত সোমরসকে সহস্রারপদ্মে রক্ষা করিয়া, সহজানন্দ লাভ করিয়া দৃঢ়স্কন্ধ হইয়া অজরামর হওয়া যায়। বোধিচিত্ত সহজামৃতের সন্ধান পাইয়া, চৌষট্টি দলযুক্ত পদ্ম নির্মাণ-চক্র হইতে—সরু নলযুক্ত ছোট ঘটিতে (মহা-সুখ চক্রে) প্রবেশ করিল। পূর্বকালে মদের দোকানের সম্মুখে চিহ্ন থাকিত, তাহা দেখিয়া গ্রাহকেরা দোকানে প্রবেশ করিত। আলোচ্য পদে বোধিচিত্তই গ্রাহক ; দশমীদুয়ার চিহ্ন। বোধিচিত্ত নিজেই দেহামৃত সোমরসের আশায় নির্মানচক্র হইতে মহাসুখচক্রে প্রবেশ করিল।

৪

রাগ অরু

তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।
কঁমল কুলিশ ঘাণ্ট করহুঁ বিআলী॥ ধ্রু॥
জোইনি তই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বি কমল রস পীবমি॥ ধ্রু॥
খেপহুঁ জোইনি লেপ ন জাঅ।
মণি কুলে বহিআ ওড়িআণে সমাঅ॥ ধ্রু॥
সাসু ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল।
চান্দ সুজ বেণি পখা ফাল॥ ধ্রু॥
ভণই গুড়রী অহ্মে কুন্দুরে বীরা।
নরঅ নারী মঝেঁ উভিল চীরা॥ ধ্রু॥ [গুড়রী]

পদটিতে হেঁয়ালি ভাষায় তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতির বর্ণনা। বৌদ্ধতন্ত্রের শক্তি যোগিনীর মণিমূল হইতে মহাসুখ চক্রে প্রবেশের পদ্ধতিরও বর্ণনা

পাওয়া যায় পদটিতে। ত্রিনাড়ী সহযোগে কুণ্ডলিনী শক্তিকে—মণি-মূল হইতে উর্ধ্বদিকে বহাইতে পারাই সাধনা। এই সাধনায় যত সিদ্ধি—দ্বৈতজ্ঞান ততই বিলুপ্ত হয়। পদটির মধ্যে লক্ষণীয়, তত্ত্ব কথাকে লৌকিকতার ছদ্মবেশ দিতে যাইয়া—প্রেমারতির জীবন্ত চিত্রের আশ্রয় গ্রহণ—

জোইনি তই বিণু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বি কমল রস পীবমি॥

তিঅড্ডা—তিন, ত্রিনাড়ী; চাপী—চাপিয়া; জোইনি—যোগিনী; অঙ্কবালী—আলিঙ্গন; ঘাণ্ট—সংযোগ; করহু—কর; বিআলী—বিকালী, কাল রহিত; তই বিনু—তোমা বিনা; খণহিঁ—ক্ষণমাত্র; ন জীবমি—বাঁচিব না; মুহ—মুখ; খেপহুঁ—ক্ষেপ হইতে, স্বস্থান হইতে উৎক্ষিপ্ত; লেপ ন জাঅ—লিপ্ত হয় না; মণিকুলে—মণিকুল হইতে; ওড়িআণে—উড্ডীয়ানে; মহাসুখচক্রে। সমাঅ—প্রবেশ করে; সাসু—শ্বাস; ঘালি—রুদ্ধ করিয়া; কোঞ্চাতাল—অভেদ্য, বক্রতালা; চান্দ সুজ্জ—চন্দ্র সূর্য—দ্বৈতজ্ঞান; পখা—পক্ষ; ফাল—ফাড়; কুন্দুরে—যোগ বিশেষ; উভিল—উর্ধ্বে তুলিয়া ধরা হইল; চীরা—বস্ত্রখণ্ড অথবা বস্ত্রখণ্ড ধারী।

৫ * R 64

রাগ গুঞ্জরী

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী॥ ধ্রু॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পার গামি লোঅ নিভর তরই॥ ধ্রু॥
ফাড়িঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ।
অদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ॥ ধ্রু॥
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিয়ড্ডি বোহি দূর মা জাহী। ধ্রু॥
জই তুম্‌হে লোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তর সামী॥ [চাটিল]

গীতিটির প্রথম দুই ছত্রের ভিত্তি বৌদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইহার মধ্যে তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতির বর্ণনাই প্রধান। দুই নাড়ীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মধ্য পথের দ্বারা মহা সুখ লাভের বর্ণনাই গীতিটির ব্যঞ্জনা।

ভবণই—ভবনদী ; দু আন্তে—দুই কূলে ; চিখিল—কর্দমাক্ত ; থাহী—ঠাই ; ধামার্থে—ধর্মার্থে ; সাঙ্কম—সাঁকো ; গঢ়ই—গড়ে ; ফাড়িঅ—ফাড়িয়া ; পাটি—পাটা ; জোড়িঅ—জুড়িয়া ; অদঅ—অদ্বয় (অদ্বয় জ্ঞানরূপ কুঠার) ; নিবাণে—নির্বাণে ; কোরিঅ—করিও ; সাঙ্কমত—সাঁকোতে ; হোহী—হইও ; নিয়ড্ডি—নিকটেই ; বোহি—বোধি ; জাহী—যাইও ; জই—যদি ; তুম্‌হে লোঅ—তোমরা সকলে ; পুচ্ছতু···সামী—শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞ অনুত্তর স্বামী চাটিলকে জিজ্ঞাসা কর।

৬

রাগ পটমঞ্জরী

(কাহেরে ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস ॥ ধ্রু ॥
অপণা মাংসে হরিণা বৈরী।
খণহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরি ॥ ধ্রু ॥
তিণ ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলয় ণ জাণী ॥ ধ্রু ॥)
হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো।
এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো ॥ ধ্রু ॥
তরঙ্গতে হরিণার খুর ন দীসই।
ভুসুকু ভণই মূঢ় হিঅহি ন পইসই ॥ ধ্রু ॥ [ভুসুকু]

পদটিতে চর্যাগীতির দার্শনিকতার ভাববাদী স্বরূপ বা Idealism এর প্রকাশ। চঞ্চল, সংবৃতি বোধিচিত্ত এখানে হরিণ এবং প্রকৃতি প্রভাস্বর চিত্ত হরিণী। নিজের মাংসেই হরিণ বৈরী অর্থাৎ চিত্ত 'অবিদ্যাচ্ছন্ন বলিয়া সর্বদা নানা প্রকার বিপর্যয় বেষ্টিত। এ অবিদ্যার জন্য চিত্ত নিজেই দায়ী। শিকারী (অহেরি)—জীবনের নানা দুঃখ বিপর্যয়। এই দুঃখ বিপর্যয়ের সময়ই হরিণীর—নৈরাত্মার বাণী শোনা যায়; এবং মুক্তির উপায় লাভ হয়। দ্রঃ দার্শনিক পটভূমি অধ্যায় পৃঃ ৯৪।

কাহেরে—কাহাকে; ঘিনি—লইয়া; মেলি—মিলিয়া; অচ্ছহু কীস—কি ভাবে আছ; বেঢ়িল……চৌদীস—চৌদিক বেড়িয়া হাক পড়িতেছে; অপণা—আপনার; মাংসেঁ—মাংসের দ্বারা; খণহ—

ক্ষণিকের জন্যও ; ছাড়অ—ছাড়ে ; অহেরি—শিকারী, ব্যাধ ; তিণ—তৃণ ; চ্ছুপই—স্পর্শ করে ; পিবই—পান করে ; ণ জাণী—জানেনা ; হোহু ভান্তো—ভ্রান্ত হও, ভ্রমণশীল হও ; তরঙ্গতে—তূর্ণ গতিতে ; দীসই—দেখা যায় ; হিঅহি—হৃদয়ে ; পইসই—প্রবেশ করে।

পদটিতে হরিণ শিকারের রূপকে তত্ত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে।

৭

রাগ পটমঞ্জরী

আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্ন বিমন ভইলা ॥ ধ্রু ॥
কাহ্ন কহিঁ গই করিব নিবাস।
জো মন গোঅর সো উআস ॥ ধ্রু ॥
তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না।
ভণই কাহ্নু ভব পরিচ্ছিন্না ॥ ধ্রু ॥
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণা গবণে কাহ্নু বিমন ভইলা ॥ ধ্রু ॥
হেরি সে কাহ্নি ণিঅড়ি জিনউর বট্টই।
ভণই কাহ্নু মো হিঅহি ন পইসই ॥ ধ্রু ॥ [কাহ্ন]

আলিএঁ কালিএঁ—আলি কালির দ্বারা ; আলি কালি শব্দ দুইটির বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য ৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য ; বাট—পথ, বর্ত্ম ; রুন্ধেলা—রুদ্ধ করা হইল ; বিমন—বিশুদ্ধ মন ; কহিঁ—কোথায় ; গই—গিয়া ; মনগোঅর—মনগোচর ; উআস—উদাস ; ভব—অস্তিত্ববোধ ; পরিচ্ছিন্না—পৃথক ; অবণা গবণে—আসা যাওয়াতে ; নিঅড়ি—

নিকটে ; জিনউর—জিনপুর, মহাসুখপুর ; বট্টই—বর্ত্ততে, আছে।

গীতিটির প্রথম দুই পংক্তির ব্যাখ্যা দুই ভাবে করা যাইতে পারে ; আলি কালির দ্বারা অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞান দ্বারা পথ অর্থাৎ পরমার্থের পথ রুদ্ধ হইল। অন্যভাবে অর্থ করা যায়—আলি কালির দ্বারা পথ রুদ্ধ করা হইল অর্থাৎ আলি কালিকে একীকৃত করিয়া অবধূতি-পথ রুদ্ধ (দৃঢ়) করা হইল। পরবর্তী পংক্তিদ্বয়ের ব্যঞ্জনা,—মন পরিশুদ্ধ হইলে সুখ লাভের জন্য অন্যত্র গমনের প্রয়োজন হয় না। যাঁহারা মনগোচর অর্থাৎ যুক্তি তর্ক ইত্যাদি জ্ঞান মার্গের উপর নির্ভরশীল তাঁহারা সত্যপথ সম্পর্কে উদাস অর্থাৎ অজ্ঞ। পরবর্তী অংশের ব্যাখ্যার জন্য ৮৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

রাগ দেবক্রী

(সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ॥ ধ্রু ॥
বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ।
গেলী জাম বহুড়ই কইসেঁ ॥ ধ্রু ॥
খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি ॥ ধ্রু ॥)
মাঙ্গত চড়িলে চউদিসে চাহঅ।
কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ ॥ ধ্রু ॥
বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা
বাটত মিলিল মহাসুহ সঙ্গা। ধ্রু ॥ [কম্বলাম্বর পদ]

সোনে—স্বর্ণে, শূন্যতায় ; ভরিতী—ভরা, পূর্ণ ; রূপা—রৌপ্য,

রূপজ্ঞান ; ঠাবী—ঠাই ; গঅণ উবেসেঁ—গগন উদ্দেশে, শূন্যতা অভি-মুখে ; গেলীজাম—গতজন্ম ; বহুড়ই—পুনরাবর্তিত ; খুন্টি—খুঁটি ; মাঙ্গত—পথে, বিরমানন্দ মার্গে ; কেড়ুআল—বৈঠা ; বাহবকে—বাহিতে ; বাম দাহিণ—বাম দক্ষিণ ; ইড়া পিঙ্গলা ; চাপী—চাপিয়া ; মাঙ্গা—পথ, মার্গ ; বাটত—পথে, অবধূতিকাপথে।

গীতিটিতে নৌকা বাহিবার উৎপ্রেক্ষায় তত্ত্বকথা বর্ণনা করা হইয়াছে। সোণে ও রূপা শব্দ দুটি দ্ব্যর্থক ; শূন্যতার দ্বারা—করুণা নৌকা পূর্ণ হইয়াছে ; বাহ্য জগতের মিথ্যা অস্তিত্বের (রূপের) জ্ঞান দূরীভূত হইয়াছে। শূন্যতারূপ গগন উদ্দেশ্যে নৌকা চালাও, জন্মহীন নির্বাণ লাভ হইবে। খুঁটি, আভাস দোষ অর্থাৎ সংবৃতি বোধিচিত্ত স্বষ্ট মিথ্যাজ্ঞান অর্থে এবং কাছি—শাস্ত্রাদির জ্ঞান সূত্র অর্থে ব্যবহৃত। পদটির ব্যঞ্জনা—জগৎ সংসারের অস্তিত্ব সম্পর্কিত মিথ্যাজ্ঞান এবং শাস্ত্রাদিতে প্রচারিত বিদ্যাসূত্র—মুক্তির প্রতিবন্ধক। এই বন্ধন গুলি হইতে মুক্ত করিয়া চিত্ত নৌকা প্রবাহিত কর। সদগুরুর বচন বৈঠা। শেষ পংক্তি দ্বয়ে তান্ত্রিক পন্থার নির্দেশ।

৯

রাগ পটমঞ্জরী

এবং কার দৃঢ় বাখোড় মোড়িউ।
বিবিহ বিআপক বান্ধন তোড়িউ ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নু বিলাসঅ আসব মাতা।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা ॥ ধ্রু ॥
জিম জিম করিণা করিণিরেঁ রিসঅ।
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ ॥ ধ্রু ॥

ছড়গই সঅল সহাবে সুধ।
ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ ॥ ধ্রু ॥
দশবল রঅণ হরিঅ দশদিসেঁ।
[অ] বিজ্জা করিকুঁ দম অকিলেসেঁ ॥ ধ্রু।

[কাহ্নুপাদ]

মত্তহস্তীর রূপকে এখানে তত্ত্বকথা বর্ণিত। গ্রাহ্য গ্রাহক ভাব রূপ দুইটি স্তম্ভ এবং নানা প্রকার ব্যাপক বন্ধন ছিন্ন করিয়া মত্ত হস্তীরূপ কাহ্নুপাদ মহাসুখ কমল বনে প্রবেশ করিয়া নির্বৃত্তি লাভ করিলেন। করিণীকে দেখিয়া করী যেমন মদকল বর্ষণ করে কাহ্নুপাদও সেইরূপ নৈরাত্মা রূপিণী করিণীকে দেখিয়া তথতারূপ মদকল বর্ষণ করিতেছেন। বিশ্বের সমস্ত কিছুই মূলতঃ পরিশুদ্ধ। আমাদের অবিদ্যাজনিত অভ্যাস বশে বস্তুনিচয়ের মূল তথতা স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছি। সুতরাং অবিদ্যাকরীকে দমন কর। গীতিটিতে চিত্ত মত্ত হস্তীরূপে কল্পিত হইয়াছে।

অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্ত তথতা জ্ঞান ভুলিয়া যায়। সেই চিত্তই নৈরাত্মা রূপিনী করিণীর প্রেমে তথতা মদবর্ষণ করে এবং মহাসুখ কমল বনে প্রবেশ করিয়া নির্বৃত্তি লাভ করে।

‘এ’ এবং ‘বং’—ব্যাখ্যার জন্য ৫৬ পৃঃ দ্রঃ ; বাখোড়—স্তম্ভ ; মোড়িউ—মর্দন করিবা ; বিবিহ—বিবিধ ; বিআপক—ব্যাপক ; তোড়িউ—ভাঙ্গিয়া ; বিলসঅ—বিলাস করে ; আসব মাতা—আসব মত্ত ; পইসি—প্রবিষ্ট হইয়া ; নিবিতা—নির্বৃত্তি লাভ করিলেন, নির্বিকল্পাকারে ক্রীড়া মত্ত হইলেন ; জিম জিম—যেমন যেমন ; রিসঅ মদ বর্ষণ করে, প্রেম করে ; তিম তিম—তেমন তেমন ; মঅগল—

মদকল ; বরিসঅ—বর্ষণ করে ; ছড়গই—ষড়গতি ; ষড় উপায়ে সৃষ্ট যাবতীয় বস্তু জগৎ : "অণ্ডজা জরায়ুজা উপপাদুকাঃ সংস্বেদজা দেবাসুরাদি প্রকৃতিকাঃ"—টীকা ; সহাবে সুধ—স্বভাবে শুদ্ধ, মূলতঃ পরিশুদ্ধ ; ভাবাভাব—অস্তিত্ব অনস্তিত্ব ; বলাগ—কেশাগ্র, অণুমাত্র ; নচ্ছুধ—কিঞ্চিৎ মাত্র অশুদ্ধ নহে ; দশবল রঅণ—দশবল রত্ন ; হরিঅ—হারাইয়া গিয়াছে ; অবিদ্যা করিকুঁ দম অকিলেসেঁ—অবিদ্যা করীকে অক্লেশে দমন কর।

১০

রাগ দেশাখ

নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাইসো ব্রাহ্ম নাড়িআ॥ ধ্রু॥
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ॥ ধ্রু॥
এক সো পদমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥ ধ্রু॥
হালো ডোম্বী তো পুছমি সদ্‌ভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ॥ ধ্রু॥
তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবর না চাঙ্গেড়া।
তোহার অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া॥ ধ্রু॥
তুলো ডোম্বী হাউ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী॥ ধ্রু॥
সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ॥ ধ্রু। [কাহ্ন]

ছোই ছোই জাইসো—ছুয়ে ছুয়ে যাও ; ব্রাহ্মনাড়িআ—নেড়া (শুদ্ধাচারী) ব্রাহ্মণকে, সাঙ্গ—সাঙ্গ', মিলন, স্বামী স্ত্রীরূপে বাস ; নিঘিণ—নির্ঘৃণ্য ; জোই—যোগী ; লাঙ্গ—উলঙ্গ নাঙ্গা ; পাখুড়ী—পাপড়ি ; এক সো…পাখুড়ী—তন্ত্রের সাদৃশ্যে মহাযানীদের কায় পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া কল্পিত পদ্ম ; (দ্রঃ ধর্মমত অধ্যায় পৃঃ ৬৩)। ডোম্বী নির্মাণচক্রের চৌষট্টি দলযুক্ত পদ্মের উপর নর্তনশীল। বাপুড়ী—বাপুটি, কাহ্ন নিজে ; কাহ্ন কপালী হইয়াছেন। টীকার মতে কপালী শব্দের অর্থ,—'ক' অর্থাৎ মহাসুখ পালন করেন যিনি ; তাই কাহ্ন ডোম্বীর সহিত সাঙ্গা করিতে পারেন এবং পদ্মের উপর নৃত্য করিতে পারেন। হালো…নাবেঁ—ডোম্বী তোমাকে সদ্ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি কাহার নায়ে যাতায়াত কর ? তাৎপর্য—তুমি সংবৃতি বোধিচিত্ত রূপ নৌকায় যাতায়াত কর না। তান্তি—তাঁত, তন্ত্রী অর্থাৎ মিথ্যা মানস-সৃষ্ট সূত্র ; বিকাণঅ—বিক্রয় করেন ; অবরনা—আবরণকারী ; চাঙ্গেড়া—বিয়য়াভাষরূপ ঝুড়ি ; তোহোর অন্তরে—তোমার জন্যে ; নড়এড়া—নট পেটা—সাজ পোষাকের পেটিকা ; তান্তি… নড়এড়া—পদকর্তা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাই ডোম্বী যিনি অবিদ্যারূপ তন্ত্রী এবং বিষয়াভাস রূপ ঝুড়ি বিক্রয় করেন তিনি কাহ্নের নিকট আর তাহা করিতেছেন না। পদকর্তা সংসারের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন তাই মিথ্যা অভিনয়ের নট পেটিকা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তুলো…মালী—তুই ডোম্বী, আমি কপালী তোর জন্য আমি হাড়ের মালা গ্রহণ করিয়াছি, কাপালিক সাজিয়াছি ; সরবর—দেহ সরোবর ; ভাঞ্জীঅ—ভাঙ্গিয়া ; মোলাণ—মৃণাল ; মারমি—মারিব ; লেমি—লইব ; পূর্বে যে ডোম্বীর কথা বলা

হইয়াছে তিনি পরিশুদ্ধ অবধূতিকা ; শেষ পদে যে ডোম্বীর কথা বলা হইয়াছে তিনি অসংযত অপরিশুদ্ধ চিত্তপবন। টীকাতেও বলা হইয়াছে —'ডোম্বিনী দ্বিধা ভেদমাহ'। এই অপরিশুদ্ধ ডোম্বী দেহ সরোবর ভাঙ্গিয়া বোধিচিত্তরূপ মৃণাল ভক্ষণ করে, সুতরাং তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার প্রাণ লইতে হইবে অর্থাৎ নিঃস্বভাবীকৃত করিতে হইবে। অপরিশুদ্ধ ডোম্বীকে পরিশুদ্ধ অবধূতিকায় পরিণত করিতে হইবে।*

১১

রাগ পটমঞ্জরী

নাড়ি শক্তি দিঢ় ধরিঅ খট্টে।
অনহা ডমরু বাজএ বীরনাদে॥
কাহ্ন কাপালী যোগী পইঠ অচারে।
দেহ নঅরী বিহরএ একাকারেঁ॥ ধ্রু॥
আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
রবিশশী কুণ্ডল কিউ আভরণে॥ ধ্রু॥
রাগ দেশ মোহ লাইঅ ছার।
পরম মোখ লবএ মুত্তাহার॥ ধ্রু॥
মারিঅ শাসু নণন্দ ঘরে শালী।
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালী॥ ধ্রু॥ [কাহ্ন]

* মূল গীতি সংগ্রহে দশম গীতিটির পর আর একটি গীতি ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ ঐ গীতিটির টীকাশেষে উল্লিখিত আছে—লাড়ী ডোম্বী পাদানাম্ সুনেত্যাদি চর্য্যায়া ব্যাখ্যানাস্তি। মুনিদত্ত যে কোন কারণেই হউক পদটির ব্যাখ্যা করেন নাই। লিপিকরও তাই পদটি উদ্ধৃত করেন নাই। দ্রঃ পৃঃ ৪।

নাড়ি শক্তি—বত্রিশ নাড়ী—তন্মধ্যে প্রধানা অবধুতিকা; খট্টে—খাটে, শূন্যতায়,—'খ'ত্বে; অনহাডমরু—অনাহতডমরু, যৌগিক পদ্ধতিতে যখন সমস্ত ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করা হয়, সমস্ত নাড়ি আয়ত্তে আনা হয় তখন দেহের মধ্যেই একটি ধ্বনি উত্থিত হয় তাহার নাম অনাহত ধ্বনি। কাহ্ন কাপালিক যোগাচারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি অবধূতিকাকে, শূন্যতায় দৃঢ় করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন; অনাহত ধ্বনি উঠিতেছে। কাহ্ন অদ্বয়ভাবে (একাকারে) দেহনগরী বিচরণ করিতেছেন। আলি কালি, রবিশশী—ব্যাখ্যার জন্য ধর্মমত অধ্যায় পৃঃ ৫৬ দ্রষ্টব্য। আলি কালিকে চরণের ঘণ্টানুপূর এবং রবিশশীকে কর্ণাভরণ করা হইয়াছে; অর্থাৎ উহারা সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসিয়াছে। রাগ দ্বেষ ইত্যাদি পোড়াইয়া ক্ষার (ছার) করা হইয়াছে। কাহ্ন পরম মোক্ষরূপ মুক্তাহার পরিয়াছেন। শাস—শ্বাস অথবা শাশুড়ী; নণন্দ—নন্দনকারী অথবা ননদ; শালী—বন্ধ করিয়া; মাঅ—মায়া।

গীতিটিতে কাহ্ন কি প্রকারে কাপালিক হইয়াছেন সেই পদ্ধতির বর্ণনা। কায়সাধনা, যোগাচার, নাড়ীগুলিকে আয়ত্তে আনা, রাগ দ্বেষ মোহাদি বিনষ্ট করা, শ্বাস সংযম, চক্ষুরাদি আনন্দ বিধায়ক ইন্দ্রিয় দমন ইত্যাদি পদ্ধতির মধ্যদিয়া মায়াকে ধ্বংস করিয়া কাহ্ন কাপালিক হইয়াছেন। কাপালিকেরা দেহসজ্জার জন্য নুপূর ইত্যাদি ধারণ করেন। রূপকের মধ্য দিয়া এখানে তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে,—আলিকালি ইত্যাদি নুপূর আভরণ, রাগদ্বেষাদির ভস্ম দেহাচ্ছাদন, এবং মোক্ষ মুক্তাহার গলার মালা।

১২

রাগ ভৈরবী

(করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅবল।
সদগুরু বোহেঁ জিতেল ভববল॥
ফীটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর।
উআরি উএসেঁ কাহ্ন ণিঅড় জিনউর॥)
পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মারিউ।
গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা ঘালিউ॥)
(মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিতা।
অবশ করিঅ ভববল জিতা॥
ভণই কাহ্নু আহ্মে ভাল দান দেহু।
চউষট্‌ঠি কোঠা গুণিআ লেহু॥) [কাহ্ন]

গীতিটিতে দাবা খেলার রূপকে তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

করুণা···ভববল—করুণা পিড়িতে নববল (দাবা) খেলি, সদ্‌গুরুর বোধে ভববল (বিষয়াভাস) জয় করিলাম। ফীটউ—স্ফীটিত—নিঃস্বভাবীকৃত ; দুঅ—দুই, প্রথম দুই শূন্য ; চিত্তকে—শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য ও সর্বশূন্য এই চারি স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম তিনটি প্রকৃতি দোষযুক্ত, সমল ; চতুর্থ টি প্রকৃতি প্রভাস্বর, দোষ বিমুক্ত। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দার্শনিক পটভূমি অধ্যায় পৃঃ ৯৯-১০৩ দ্রষ্টব্য। ঠাকুব—তৃতীয় শূন্য বা মহাশূন্য। প্রথমে দুইটি শূন্যকে মারিয়া পরে তৃতীয় শূন্যকে মারা হইল। এই তিনটি শূন্য বিনষ্ট হইলে উপ-কারিক গুরুর উপদেশে নিকটেই জিনপুর মহাসুখের পরমধাম দৃষ্ট হয়। বড়িআ—বোড়ে। টীকা অনুসারে ১৬০ প্রকার প্রকৃতি দোষ।

চিত্তের প্রথম তিনটি স্তরের সহিত যুক্ত ৮০ প্রকার প্রকৃতি দোষ দিবা রাত্রি ভেদে ১৬০ প্রকার হয়। (দ্রঃ পৃঃ ১০০।); গঅবরেঁ—গজবরের দ্বারা, চিত্ত গজেন্দ্র, সর্বশূন্যতারূপ তথতাচিত্ত দ্বারা; পাঞ্চজনা—পাঁচজনকে, পঞ্চস্কন্ধাত্মক পঞ্চ বিষয়ের অহঙ্কারাদি প্রত্যয়কে। চিত্তের চতুর্থ স্তর সর্বশূন্য দ্বারা পঞ্চ স্কন্ধাত্মক পঞ্চবিষয়ের অহঙ্কারাদি প্রত্যয়কে দূর করা হইল। মতিএঁ—মতি বা মন্ত্রীদ্বারা, প্রজ্ঞাদ্বারা; ঠাকুরক—ঠাকুরকে, রাজাকে, সংবৃতি বোধিচিত্তকে; পরিনিবিতা—পরিনিবৃত্ত করিয়া। চউষটঠি কোঠা—দাবার ছকে চউষটঠী কোঠা থাকে। এখানে চউষটঠী—চতুষষ্ঠী দলযুক্ত নির্মান চক্রের পদ্মকে বুঝাইতেছে। তুং একসো পদমা চউষটঠী পাখুড়ী (১০)।

১৩

রাগ কামোদ

তিশরণ নাবী কিঅ অঠক মারী।
নিঅ দেহ করুণা শূণমে হেরী॥ ধ্রু॥
তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা।
মঝ বেণী তরঙ্গ ম মুনিআ॥ ধ্রু॥
পঞ্চ তথাগত কিঅ কেড়ুআল।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল॥ ধ্রু॥
গন্ধ পরস রস জইসোঁ তইসোঁ।
নিংদ বিহুনে সুইনা জইসো॥ ধ্রু॥
চিঅ কণ্ণ হার সুণত মাঙ্গে।
চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে॥ [কাহ্ন]

তিশরণ—ত্রিশরণ, লতঃ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ। সহজযানে—

কায়, বাক্, চিত্তের শরণ অর্থাৎ মহাসুখকায় ; অঠক্ মারী—আটকে মারিয়া ; টীকা অনুসারে অঠ কুমারী—অষ্ট কুমারী অর্থাৎ অষ্টপ্রকার বুদ্ধৈশ্বর্যাদি সুখ। তিশরণ…হেরী—মহাসুখকায়কে নৌকা করা হইল ; নিজদেহে করুণা ও শূন্যের যুগনদ্ধ রূপ দেখিয়া বুদ্ধৈশ্বর্য সুখ অনুভূত হইল। তরিত্তা—তরিয়া, উত্তীর্ণ হইয়া ; মাঅ সুইনা—মায়া, স্বপ্ন ; মঝ বেণী—মধ্যবেণী ; মুনিআ—উপলব্ধি করিয়া ; তরিত্তা… মুনিআ—মায়াময় স্বপ্নসদৃশ ভবজলধি পূর্বোক্ত নৌকায় পার হইয়া মধ্যবেণীতে অর্থাৎ অবধূতিকায় (মহাসুখ)-তরঙ্গ উপলব্ধি করা গেল। 'পঞ্চ তথাগত—পঞ্চ ধ্যানি বুদ্ধ। বাংলা দেশে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্মের আদি দেবতা—ব্রজ্রসত্ত্ব। ব্রজ্রসত্ত্বের জ্ঞানময় দেহের ভিতরে পাঁচটি গুণস্বরূপ পাঁচটি জ্ঞানের কল্পনা করা হয়। এই পাঁচটি জ্ঞান সম্পর্কে বজ্রসত্ত্বের সচেতনতা—পঞ্চধ্যান। এই পঞ্চধ্যান হইতে পঞ্চস্কন্ধাত্মক জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি। এই পঞ্চধ্যান—পাঁচটি দেবতারূপে কল্পিত হইয়া হন পঞ্চধ্যানি বুদ্ধ—পঞ্চ তথাগত। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম মতে এই পঞ্চ দেবতা দেহের মধ্যেই অবস্থিত। দেহের মধ্যে এই পঞ্চতথাগতের উপলব্ধিই দেহের আসল রূপকে চেনা। ইহাতেই দেহের বিশুদ্ধি। কেড়ুআল—দাঁড় ; পঞ্চতথাগত……মাআজাল—কাহ্ন নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, দেহ মায়াজাল বাহিতে হইলে পঞ্চ-তথাগতকে দাঁড় করিয়া লও অর্থাৎ দেহের মধ্যে তাহাদের তত্ত্ব অবগত হও। গন্ধ পরস…জইসো—এমতাবস্থায় গন্ধস্পর্শাদি যেমন তেমনি থাকে কিন্তু আমাদের নিকট তাহা জাগ্রৎ স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। চিঅ—চিত্ত ; কণ্ণহার—কর্ণধার ; সুণত—শূন্যের ; মাঙ্গে—পথে ; সাঙ্গে—মিলনে।

১৪ '৬৪

ধনসী রাগ

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী পোইআ লীলেঁ পার করেই ॥ ধ্রু ॥
বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদ্‌গুরু পাঅপএ জাইব পুণু জিণউরা ॥ ধ্রু ॥
পাঞ্চ কেড়ু্‌আল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিঠত কাচ্ছী বান্ধী।
গঅণ দুখোলেঁ সিঞ্চহু পাণী নঁ পইসই সান্ধি ॥ ধ্রু ॥
চান্দ সূজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিন্দা।
বাম দাহিণ দুই মাগ ন রেবই বাহতু ছন্দা ॥ ধ্রু ॥
কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করেই।
জো রথে চড়িলা বাহবা ন জাই কুলে কুলে বুলই ॥ ধ্রু ॥

[ডোম্বী]

নৌকা বাহিবার রূপকে এখানে তান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধিলাভের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে।

গঙ্গজউনা—গঙ্গাযমুনা, দুই দিকের দুই নাড়ী; **মাঝেঁরে বহই নাঈ**—মধ্যবর্তী নাড়ী অবধূতিকা; **তহিঁ**—সেখানে; **বুড়িলী**—ডুবন্ত; **মাতঙ্গী**—প্রমত্তাঙ্গী, হস্তিনী সদৃশ (নৈরাত্মা) **লীলে**—অবলীলায়; **পোইআ**—পো (পুত্র) কে অর্থাৎ যোগীদের; নৈরাত্মা মধ্যপথের দ্বারা সহজেই যোগীদের মহাসুখের পারে লইয়া যান। **বাটত**—পথে; **ভইল উছারা**—বেলা বাড়িল; **পাঅপএ**—পাদপদ্মে; **বাহতু···জিনউরা**—বেলা বাড়িল, ডোম্বি! বাহিয়া চল; সদ্‌গুরু পাদপদ্মের প্রসাদে জিনপুর (মহাসুখপুরে) যাইব। **পঞ্চকেড়ুআল**—১৩ সং গীতি দ্রঃ;

পিঠত—পীঠে, মণিমূলে ; কাচ্ছি—নৌকার দড়ি (বোধিচিত্ত) ; বোধিচিত্তকে দৃঢ়রূপে মণিমূলে বাঁধিয়া রাখ ; গঅণ দুখোলেঁ—শূন্যতা রূপ সেচনীদ্বারা ; পাণী—(বিষয়রূপ) জল ; ন পইসই সান্ধি—বিষয়রূপ জল যেন সন্ধিপথে দেহে প্রবেশ করিতে না পারে ; চান্দসূজ্জ ......পুলিন্দা—চন্দ্র সূর্য, সৃষ্টি সংহারের তত্ত্ব, নৌকার দুই চাকা, মধ্যবর্তী মাস্তুল অদ্বয়ের প্রতীক ; ন রেবই—দেখা যায় না ; বাহতু—বাহিয়া যাও ; ছন্দা—স্বচ্ছন্দে ; কবড়ী—কড়ি ; বোড়ী—বুড়ি ; বুলই—ভ্রমণ করে ; কবড়ী···বুলই—পার করিবার জন্য (নৈরাত্মা) কোন কড়ি বুড়ি লয় না, অর্থাৎ ইহার জন্য কোন কৃচ্ছসাধনার প্রয়োজন হয় না , কিন্তু যাহারা বাহিতে জানে না তাহারা শরীরের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায় ।

১৫

রাগ রামক্রী

সঅ সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁতে অলক্খ লক্খ ন জাই ।
জে জে উজূবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোঈ ॥ ধ্রু ॥
কুলেঁ কুল মা হোই রে মূঢ়া উজুবাট সংসারা ।
বাল ভিণ একু বাকু ণ ভুলহ রাজ পথ কন্ধারা ॥ ধ্রু ॥
মাআমোহা সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা ।
আগে নাব ন ভেলা দীসই ভান্তি ন পুচ্ছসি নাহা ॥ ধ্রু ॥
সুনা পান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে ।
এষা অট মহাসিদ্ধি সিঝএ উজুবাট জাঅন্তে ॥ ধ্রু ॥
বাম দাহিণ দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলেথউ সংকেলিউ ।
ঘাট ণ গুমা খড়তড়ি ণ হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ ॥ ধ্রু ॥

[শান্তিপাদ]

গীতিটিতে সহজানন্দের স্বরূপ ও তাহা লাভের উপায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

সঅ সম্বেঅণ—স্বসংবেদ্য ; সহজানন্দ-স্বরূপ ব্যাখ্যাদ্বারা উপলব্ধ হয় না, তাহা স্বসংবেদ্য। সরুঅ—স্বরূপ ; বিআরেঁতে—বিচারে ; অলকৃখ লকৃখ—অলক্ষ্য লক্ষ্য ; উজুবাটে—ঋজুবর্ত্মে, সহজপথে ; অনাবাটা—অনাবর্ত—ফিরিয়া না আসা, সিদ্ধির পরপারে পৌছানো ; কুলে···সংসারা—কূলে কূলে ঘুরিও না, মূর্খ, সংসার সহজপথ ; বাল—হে বাল যোগিন্ ; ভিণ—ভিন্ন (ভব এবং নির্বাণ যে পৃথক) ; একু বাকু—এক বাক্যে (এরূপ বাক্যে) ; কন্ধারা—কনক ধারা ; বাল···কন্ধারা—মূর্খ, ভবনির্বাণ পৃথক এরূপ বাক্যে ভুলিও না ; রাজার ন্যায় কনকধারা পথে (অবধূতি মার্গ ধরিয়া) মহাসুখ কমল বনে প্রবেশ কর। মাআমোহ সমুদারে—মায়ামোহ রূপ সমুদ্রে ; মাআ··· নাহা—মায়ামোহ রূপ সমুদ্রে অন্ত এবং ঠাই যদি না বুঝিতে পার, যদি সম্মুখে নৌকা বা ভেলা না দেখ অর্থাৎ পারে যাইবার পথ যদি না পাও তবে ভ্রান্তি বশতঃ কেন নাথকে (সদ্‌গুরুকে) জিজ্ঞাসা করিতেছ না ? সুনা পান্তর—শূন্য প্রান্তর ; উহ ন দীসই—উদ্দেশ না দেখা যায় ; ভান্তি ন বাসসি জান্তে—যাইতে ভুল করিও না ; এষা···জাঅন্তে— এই সহজপথে গেলে অষ্ট মহাসিদ্ধি সিদ্ধ হয় (লাভ হয়) ; বাম দাহিণ ইত্যাদি—ইড়া পিঙ্গলাকে পরিত্যাগ করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া ; বুলেথউ—বেড়াইতেছেন ; সংকেলিউ—কেলি করিতে করিতে, আনন্দের সহিত ; গুমা—গুল্ম ; খড়তড়ি—খাদ, তড় ; ঘাটগুল্ম··· জাইউ—পথে বাধাবিঘ্ন কিছুই নাই ; চোখ বুজিয়া চলা যায়।

১৬

রাগ ভৈরবী

তিনি এঁ পাটেঁ লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই।
তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে বিসঅ মণ্ডল সএল ভাজই ॥ ধ্রু ॥
মাতেল চীঅ গএন্দা ধাবই।
নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই ॥ ধ্রু ॥
পাপ পুণ্য বেণি তোড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা।
গঅণ টাকলি লাগিরে চিত্ত পইঠ নিবাণা ॥ ধ্রু ॥
মহারস পানে মাতেল রে তিহুঅন সএল উএখী।
পঞ্চবিসঅ নায়ক রে বিপখ কোবি ন দেখি ॥ ধ্রু ॥
খররবি কিরণ সন্তাপেঁ রে গঅণাঙ্গণ গই পইঠা।
ভণন্তি মহিত্তা মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা ॥ ধ্রু ॥

[মহীধর পাদ]

আলোচ্য গীতিটিতে সহজানন্দে প্রবিষ্ট চিত্তকে মত্ত গজেন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়া মহাসুখের স্বরূপ আলোচনা করা হইযাছে। তুঃ ৯সং গীতি।

তিনি এ পাটে—তিন পাটে, টীকা অনুসারে কায়, বাক, চিত্ত—এই তিন, পীঠে অর্থাৎ সহজানন্দে যুক্ত হইল। অন্য অর্থে বাম দক্ষিণের দুই নাড়ী—মধ্য নাড়ীতে যুক্ত হইল। ("The three planks or the principal nādis ; P 83 Studies in the Tantras.) অণহ—অনাহত ধ্বনি ১১ সং গীতি দ্রঃ ; কসণ—কৃষ্ণ, ভয়ানক; গাজই—গর্জন করিতেছে ; মার—হিন্দু পুরাণের মদনের সাদৃশ্যে কল্পিত সাধনার প্রধান শত্রু ; বিসঅ মণ্ডল—বিষয় আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি ; ভাজই—ভঙ্গ

হইল ; মাতেল—মত্ত, সহজানন্দে মত্ত ; চীঅ-গএন্দা—চিত্ত গজেন্দ্র ; গঅণন্ত—গগনান্তে, শূন্যতা শিখর প্রান্তে ; তুসেঁ—তৃষ্ণাকে, টীকা অনুসারে দ্বৈত চেতনাকে ; ঘোলই—ঘোলাইয়া দিতেছে। পাপপুণ্য··· খম্ভাঠাঁনা—পাপপুণ্যের যুক্ত শিকল ছিড়িয়া স্তম্ভস্থান (অবিদ্যাস্তম্ভ) মর্দন করিয়া। গঅণ টাকুলি—গগন শিখর, শূন্যতার শেষ স্তর ; পইঠ—প্রবিষ্ট ; নিবাণা—নির্বাণে ; মহারস···দেখি—ত্রিভুবনের সকল কিছু উপেক্ষা করিয়া (উএখী) সে এখন মহারস পানে মত্ত হইল ; এখন সে পঞ্চ বিষয়ের (পঞ্চ স্কন্ধাত্মক পঞ্চবিষয়) নায়ক ; ত্রিভুবনে তাহার বিপক্ষে (বিপখ) কাহাকেও দেখিনা। খররবি কিরণ—মহাসুখরূপ রবির খরতাপে ; বুড়ন্তে—নিমজ্জিত ; ভণন্তি···ন দিঠা—মহিত্তা বলিতেছেন তিনি ইহাতে নিমজ্জিত হইয়া কিছুই দেখেন না।

১৭ '৬৪

রাগ পটমঞ্জরী

(সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী ।
অণহা দাণ্ডী একি কিঅত অবধূতী ॥ ধ্রু ॥
) বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা ।
সুন তান্তি ধ্বনি বিলসই রুণা ॥ ধ্রু ॥
আলি কালি বেণি সারি সুণিআ ।
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ ॥ ধ্রু ॥)
জবে করহা করহকলে চাপিউ ।
বতিশ তান্তি ধনি সএল বিআপিউ ॥ ধ্রু ॥
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী ।
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই ॥ ধ্রু ॥ [বীণাপাদ]

আলোচ্য গীতিটিতে বীণা বাদনের রূপকে তান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা সহজানন্দলাভের কথা আলোচনা করা হইয়াছে।

সুজ—সূর্য; সসি—শশী; তান্তী—তন্ত্রী; অণহা—১১ সং গীতি দ্রঃ; দাণ্ডী—দণ্ডী; একি—একীকৃত; কিঅত—<কৃত; সুজলাউ··· অবধূতী—সূর্যকে লাউ এবং চন্দ্রকে তন্ত্রী এবং অবধূতীকে দণ্ড করিয়া অনাহতধ্বনিকারী বীণা প্রস্তুত করা হইল। চন্দ্র সূর্য বাম দক্ষিণের দুই নাড়ী দণ্ড অর্থাৎ মধ্যপথ অবধূতিকার সহিত যুক্ত হইলে অনাহত ধ্বনি উত্থিত হয়। স্পষ্টত তান্ত্রিকপদ্ধতির ব্যঞ্জনা। হেরুঅ বীণা—শ্রীহেরুক বৌদ্ধধর্মের দেবতা, বীণার নাম তাই হেরুক বীণা। সুন তান্তি···রুণা—শূন্যতার তন্ত্রধ্বনি করুণায় ব্যাপ্ত হইতেছে। আলি কালি—স্বরও ব্যঞ্জন (পৃঃ ৫৬ দ্রঃ); বেণি—যুক্ত; সারি—সা,রি—সরগম; সমরস সান্ধি—সুরের সমতা রক্ষার জন্য সন্ধি বা ঘাটগুলি; করহা—করভ, গজশিশু, চিত্ত গজেন্দ্রের ভাব বা চঞ্চলতা গজ শিশু রূপে কল্পিত; করহ্‌কলে—করভকল—করভ কলন (ধ্বংস) করে যে; বতিশ তান্তি ধনি—বত্রিশ তন্ত্রীধ্বনি, বত্রিশ নাড়ী হইতে উত্থিত শূন্যতা ধ্বনি; সএল বিআপিউ—সমস্তকে ব্যাপ্ত করিল। আলিকালি······বিআপিউ—আলি কালির যুক্ত স্বর শুনিয়া, সমরস সন্ধিতে আঙ্গুল গুনিয়া গজবর যখন করভকে (চিত্ত চাঞ্চল্যকে) করভকলে দমন করিলেন, তখন বত্রিশ তন্ত্রীধ্বনি সমস্তদিক ব্যাপ্ত করিল। চিত্তচাঞ্চল্য দমন করিয়া বাম দক্ষিণের দুই নাড়ীকে আয়ত্তে আনিলে শূন্যতাধ্বনি উত্থিত হয়। বাজিল—বজ্রধর; দেবী—নৈরাত্মা; বিসমা—পরিসমাপ্তি; নাচন্তি···হোই—বজ্রধর নাচেন, নৈরাত্মা গান করেন—এই ভাবে বুদ্ধ নাটকের পরিসমাপ্তি হয়।

১৮

রাগ গউড়া

তিণি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।
হাঁউ সুতেলি মহাসুহ লীলেঁ ॥ ধ্রু ॥
কইসনি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরি আলী।
অন্তে কুলিণ জন মাঝে কাবালী ॥ ধ্রু ॥
তঁইলো ডোম্বী সঅল বিটালিউ।
কাজণ কারণ সসহর টালিউ ॥ ধ্রু ॥
কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।
বিদুজন লোঅ তোরে কণ্ঠ ন মেলঈ ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নে গাই তু কাম চণ্ডালী।
ডোম্বিত আগলি নাহি চ্ছিণালী ॥ ধ্রু ॥ [কাহ্ন]

আলোচ্য গীতিটিতে ডোম্বীর সাহচর্যে লব্ধ মহাসুখের স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

তিণিভুঅণ—ত্রিভুবন, কায়, বাক, চিত্তের ত্রিভুবন; মই বাহিঅ হেলেঁ—আমাকর্তৃক হেলায় বাহিত হইল; হাঁউ সুতেলি···লীলেঁ—আমি এখন মহাসুখ লীলায় শুইয়া আছি; কায় বাক চিত্তের ত্রিভুবন অতিক্রম করিলে অদ্বয় প্রতিষ্ঠা হয়—তখনই মগ্ন হওয়া যায় মহাসুখে। কইসনি—কেমন, তোহোরি—তোর; ভাভরিআলী—চালাকি; কুলিণ—কুলীন, পাণ্ডিত্যাভিমানী ও কুতে (দেহে) লীন এই দুই অর্থই উদ্দিষ্ট; কাবালী—কাপালিক—১০ সং গীতি দ্রঃ। মহাসুখ-রূপিনী ডোম্বীর দুই রূপ—শুদ্ধা ও অপরিশুদ্ধা; শুদ্ধারূপে তিনি কাপালিকের অন্তরে এবং অশুদ্ধারূপে তিনি কুলীনজনের বাহিরে

লীলা করেন। তঁইলো ডোম্বী—তুই ডোম্বী (অপরিশুদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে) ; সঅল বিটালিউ—সমস্ত নষ্ট করিস ; কাজণ কারণ—কার্যের কারণ ; সসহর—বোধিচিত্ত (উষ্ণীষ কমলে চন্দ্ররূপে অবস্থিত) ; কেহো কেহো···মেলঈ—যাহারা জানে না তাহারা তোমাকে বিরূপ মন্দবাক্য বলে ; কিন্তু 'বিদুজন'—তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি তোমাকে কণ্ঠ (সম্ভোগ চক্র) হইতে বিচ্ছিন্ন করেন না (দ্রঃ ধর্মমত অধ্যায়) ; কাহ্নে গাই···চ্ছিণালী—কাহ্ন গান করিতেছেন—তুমি কামচণ্ডালী, তোমা অপেক্ষা অধিক চপল মতি আর কেহ নাই।

১৯

রাগ ভৈরবী

ভব নির্বাণে পড়হ মাদলা।
মণ পবণ বেণি করণ্ড কশালা॥ ধ্রু॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিলা।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিলা॥ ধ্রু॥
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম॥ ধ্রু॥
অহণিসি সুরঅ পসঙ্গে জাঅ।
জোইণি জালে রএণি পোহাঅ॥ ধ্রু॥
ডোম্বী এর সঙ্গে জো জোই রত্তো।
খণহ. ন ছাড়অ সহজ উন্মত্তো॥ [কাহ্ন]

আলোচ্য পদটিতে বিবাহের রূপকে—ডোম্বীর সহিত মিলন ও তাহার ফল স্বরূপ মহাসুখ লাভের ক''' বলা হইয়াছে। পদটির মধ্যে তৎকালীন সমাজ পরিবেশে বিবাহ যাত্রা কিরূপ হইত তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ভবনির্বাণে—ভব ও নির্বাণ ; পড়হ মাদলা—পটহ ও মাদল ; মণ পবণ বেণি—মন এবং পবন এই দুইটি ; করণ্ডকশালা—ঢোল ও কাঁসি; জঅ জঅ···উছলিলা—জয় জয় দুন্দভি শব্দ উচ্ছলিত হইল। ভব নির্বাণে···বিবাহে চলিলা—পটহ, মাদল, ঢোল, কাঁসি দুন্দুভি ইত্যাদি বাদ্যভাণ্ডের সহযোগে বিপুল আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যে—কাহ্ন ডোম্বীকে বিবাহ করিতে চলিল। ডোম্বী বিবাহিআ···আণুতুধাম—ডোম্বীকে বিবাহ করিয়া জন্ম আহার করিল—এবং যৌতুকে অনুত্তরধাম লাভ হইল। ডোম্বীর সহিত মিলনে পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ হয় না অর্থাৎ নির্বাণ লাভ হইল। অহনিসি···পোহাঅ—অতঃপর অহর্নিশি সুরত প্রসঙ্গে অতিবাহিত হয় এবং যোগিনীজালে রাত্রি পোহায় অর্থাৎ যোগিনীর সাহচর্যে সহজ জ্ঞান লাভ হওয়ায় অজ্ঞান-রাত্রি দূরীভূত হয়। ডোম্বীএর···উম্মত্তো—যে যোগী একবার যোগিনীর সহিত রত হইয়াছে—'সহজ'-উন্মত্ত সে আর ক্ষণ মাত্রও তাহাকে ছাড়িতে পারে না।

২০

রাগ পটমঞ্জরী

হাঁউ নিরাসী খ-মণ সাঈঁ।
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই॥ ধ্রু॥
ফিটেলসু গো মাএ অন্তউড়ি চাহি।
জা এথু চাহমি সো এথু নাহি॥ ধ্রু॥
পহিল বিআণ মোর বাসন পূড়।
নাড়ি বিআরন্তে সেব বা পূড়া॥ ধ্রু॥
জাণ যৌবন মোর ভইলেসি।
মূল ন খলি বাপ সংঘারা॥ ধ্রু॥
ভণথি কুক্কুরী পা এ ভব থিরা।
জো এথু বুঝএ সো এথু বীরা॥ ধ্রু॥ [কুক্কুরীপাদ]

আলোচ্য পদটিতে নৈরাত্মা নিজেই নিজের সম্বন্ধে বলিতেছেন।

নিরাসী—আশা শূন্য; খ-মণ-সাইঁ—শূন্য-মন (প্রবুদ্ধ মন) আমার স্বামী; মোহোর—আমার; বিগোআ—বিশিষ্ট সংযোগাক্ষর সুখানুভবঃ—টীকা, (মিলন সুখ?)—সহজানন্দ, মহাসুখ; কহণ ন জাই—বলা যায় না। ফিটেলসু—মুক্ত হইলাম; অন্তউড়ি চাহি—অন্তকুটী মহাসুখ চক্ররূপ অন্তঃপুরের দিকে চাহিয়া দেখি। ফিটেলসু··· এথু নাহি—মহাসুখচক্ররূপ অন্তপুরে চাহিয়া দেখি—আমি বিষয়াদি মুক্ত। বাহ্য জগতের বিষয়রূপ শত্রু এখানে নাই। পহিল···বাসনপূড় এই বাসনা পুট (দেহ) আমার প্রথম প্রসব। অর্থাৎ বাসনা সমষ্টি আমার মনের সৃষ্টি। নাড়ি···বাপূড়া—নাড়ী বিচার করিয়া দেখিলাম—ইহা অতি নীচ অপদার্থ। জাণ যৌবন···সংঘারা—আমার জ্ঞান

অথবা নব যৌবন হইলে পর দেখিলাম সংবৃতি বোধি চিত্ত সমস্ত বাসনার মূল, এবং তাহাকে হত্যা করিলাম। ভণথি···বীর—সংবৃতি বোধি চিত্তই ভব; তাহা প্রজ্ঞা দ্বারা স্থির হয়—এই তত্ত্ব যিনি জানেন—তিনি বীর অর্থাৎ বিষয় শত্রুকে হত্যা করিতে পারেন।

পদটিতে হেঁয়ালি ভাষার প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রাম্যনারীর প্রসব বর্ণনার রূপকে এখানে আধ্যাত্মিকতার কথা বলা হইয়াছে।

২১

রাগ বড়ারী

নিসি অন্ধারী মুসা অচারা।
অমিঅ ভখঅ মুসা করঅ অহারা॥ ধ্রু॥
মাররে জোইআ মুসা পবণা।
জেণ তুটঅ অবণা গবণা॥ ধ্রু॥
ভব বিন্দারঅ মুসা খণঅ গাতি।
চঞ্চল মুসা কলিআঁ নাশক থাতী॥ ধ্রু॥
কাল মুসা উহ ণ বাণ।
গঅণে উঠি করঅ অমিঅ পাণ॥ ধ্রু॥
তাব সে মুসা উঞ্চল পাঞ্চল।
সদগুরু বোহে করহ সো নিচ্চল॥ ধ্রু॥
জবেঁ মুসাএর অচার তুটঅ।
ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ॥ ধ্রু॥ [ভুসুকু]

চিত্তের দুইটিরূপ,—সংবৃতি অর্থাৎ প্রকৃতি দোষযুক্ত, চঞ্চল এবং পারমার্থিক অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত প্রকৃতি প্রভাস্বর। চিত্তের এই দুই অবস্থার কথা আলোচিত হইয়াছে ৬সং পদে। এখানেও মূষিকের রূপকে চিত্তের দুই অবস্থার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে।

রাত্রির (অজ্ঞানতার) অন্ধকারে মূষিকের (চঞ্চল চিত্তের) আনাগোনা। এই চঞ্চলচিত্ত (মূষিক) দেহভাণ্ডে অবস্থিত সমস্ত অমৃত আহার করে। পবনরূপ চিত্ত মূষিককে হত্যা কর, যোগী। (পবন অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস বায়ুই চিত্তের বাহন।) এই মূষিকই ভব-জ্ঞান বিস্তার করে এবং আমাদের পতনের জন্য গর্ত খনন করে। চঞ্চল মূষিকের স্বরূপ বুঝিয়া (কলিঅঁা) যোগীরা তাহার নাশক হন (তাহাকে হত্যা করেন)। কাল মূষিক, ইহার উদ্দেশও নাই বর্ণও নাই। গগনে উঠিয়া (মহাসুখ কমলে উপস্থিত হইয়া) মূষিক অমৃত পান করে। সুতরাং সেই চঞ্চল মূষিককে সদগুরুবচনে নিশ্চল কর। মূষিকের চঞ্চলতা দূর হইলে বন্ধন দূর হয়।

মূষিকের রূপকে এখানে তত্ত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে। অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যেই চঞ্চল চিত্তরূপ মূষিকের সক্রিয়তা। এই চঞ্চল চিত্ত মূষিকই ভবরূপ মিথ্যাজ্ঞান সৃষ্টিকরে এবং নানা প্রকার দুঃখ বিপর্যয় আনয়ন করে। ইহাই আবার সদগুরুবচনে স্থিরতা লাভ করে এবং মহাসুখ কমলে অমৃত পান করে।

২২

রাগ গুঞ্জরী

অপণে রচি রচি ভব নির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা॥ ধ্রু॥
অম্হে ণ জাণহুঁ অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসন হোই॥ ধ্রু॥
জইসে জাম মরণবি তইসো।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেসো॥ ধ্রু॥
জা এথু জাম মরণে বি সঙ্কা।
সো করউ রস রসানেরে কংখা॥ ধ্রু॥
জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি।
তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি॥ ধ্রু॥
জামে কাম কি কামে জাম।
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম॥ ধ্রু॥ [সরহ]

বৌদ্ধ দর্শনের ভাববাদ (Idealism) চর্যাগীতির মধ্যেও লক্ষণীয়। দ্রঃ দার্শনিক পটভূমিকা অধ্যায়। আলোচ্য পদটিতেও এ সংসারের জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞানই যে চিত্তের সৃষ্টি—এই কথাই বলা হইয়াছে।

অপণে—নিজে; লোঅ—লোক; বন্ধাবএ—বন্ধনগ্রস্ত করে। অচিন্ত জোই—অচিন্ত্য যোগী, তত্ত্বজ্ঞানী; জাম—জন্ম; কইসন—কেমন করিয়া; হোই—হয়; জইসে—যেমন; তইসো—তেমন; জীবন্তে মইলেঁ—জীবন্তে ও মৃতে; নাহি বিশেষো—পার্থক্য নাই; জা এথু …কংখা—যাহারা এখানে জন্মকে সত্য বলিয়া জানে তাহারাই মরণে

ভীত হয় এবং তাহারাই রস রসায়নের আকাঙ্ক্ষা করে। রস রসান—রস রসায়ন। যৌগিকপন্থায় রসায়নবাদী একটি সম্প্রদায় ছিল যাহারা রস রসায়ন অর্থাৎ ওষধি ইত্যাদির সাহায্যে মৃত্যু অতিক্রম করিয়া সিদ্ধিলাভের কল্পনা করিত। এই রসায়নবাদ একদিকে যেমন ভারতীয় নাথ সিদ্ধাদের সাধনার সহিত যুক্ত অন্যদিকে চীন তিব্বত ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায়। জে সচরাচব···সো ধাম—যাহারা সর্বদা দেবমন্দির আদিতে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহারা কেহই নির্বাণ লাভ করে না। জন্ম ও কর্ম—কোনটি হইতে যে কিসের উৎপত্তি তাহা জানা যায় না। অর্থাৎ জন্ম ও কর্ম উভয়ই চিত্ত ভ্রান্তি।

২৩

রাগ বড়ারী

জই তুহ্মে ভুসুকু অহেরি জাইবেঁ মারিহসি পঞ্চজনা।
নলিনীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা॥ ধ্রু॥
জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল ণঅলি।
হণ বিণু মাঁসে ভুসুকু পদ্মবণ পইসহিলি॥ ধ্রু॥
মাআজাল পসরিউ রে বাধেলি মাআ হরিণী।
সদগুরু বোহেঁ বুঝিরে কাসু কদিনি॥ ধ্রু॥ [ভুসুকু]*

ভুসুকু যদি তুমি শিকারে যাও তবে পাঁচজনকে অর্থাৎ পঞ্চ স্কন্ধের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা পঞ্চতথাগতকে হত্যা করিবে। (দ্রঃ ১৩ সং গীতি।) মহাসুখ কমলবনে প্রবেশ করিতে একমন হইও। জীবন্তে

* ইহার পর পুথির চারিটি পাতা নাই। ৩৪ পাতার পর ৩৯ পাতা। তাই, এই পদটির শেষাংশ এবং পরবর্তী (২৪ ও ২৫ সং) পদদুটির সম্পূর্ণ এবং টীকা পাওয়া যায় নাই।

প্রভাত হইল, মরণে হইল রজনী। মায়া জাল প্রসারিত করিয়া মায়া হরিণী বাঁধা হইল। সদ্‌গুরুবচনে বুঝিলাঃ কিসের কি তত্ত্ব।

পদটি খণ্ডিত। পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। শিকারের উৎপ্রেক্ষায় এখানে তত্ত্ব জ্ঞানের ইঙ্গিত। পঞ্চ স্কন্ধের দেবতা পঞ্চতথাগতকে বিনাশ, মহাসুখ কমলে প্রবেশ, গুরুর উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি বিষয় লক্ষণীয়।

২৬

রাগ শবরী

তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু।
আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু॥ ধ্রু॥
তউসে হেরুঅ ন পাবিঅই।
শন্তি ভণই কিণ স ভাবিঅই॥ ধ্রু॥
তুলা ধুণি ধুণি সুণে অহারিউ।
শূণ লইআঁ অপণা চটারিউ॥ ধ্রু॥
বহল বাট দুই আর ন দিশঅ।
শান্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ॥ ধ্রু॥
কাজ ন কারণ জ এহু জুঅতি।
সএঁ সম্বেঅণ বোলথি সান্তি॥ ধ্রু॥ [শান্তি]

মায়াবাদী চর্যাকারেরা এই বিশ্বকে অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্তের সৃষ্টি বলিয়া মনে করিতেন। এখানে তুলা ধুনার রূপকে সেই অবিদ্যাচ্ছন্ন মনকে নিষ্ক্রিয় করিবার পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। (দ্রঃ দার্শনিক পটভূমিকা অধ্যায়) চিত্ত তুলার মত। তাহাকে ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ করা হইল। আঁশ ধুনিয়া নিরবয়ব করা হইল। তবুও তাহার হেতুরূপ (=হেরুঅ) পাওয়া গেল না। অর্থাৎ প্রাতিভাসিক জগৎ সৃষ্টির কারণ চিত্তকে বিশ্লেষণ করিয়াও জানা গেল

না। বস্তুত জগৎ সৃষ্টি চিত্ত দ্বারা হইলেও ইহা চিত্তের স্বরূপ বা ধর্ম নহে, ইহা অবিদ্যাশ্রিত একটি আগন্তুক ধর্ম। তাই চিত্তকে বিশ্লেষণ করিয়া ইহাকে পাওয়া যায় না। শান্তি তাই বলিতেছেন ভাবিয়া লাভ নাই। তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া শূন্য আহরণ করিলাম; শূন্যকে লইয়া নিজেকে, অহংবোধকে নিঃশেষ করিলাম। দীর্ঘ এই পথ। দ্বৈত ভাব এখানে দেখা যায় না। শিশু ও অজ্ঞ এখানে প্রবেশ করিতে পারে না। (কারণ) তর্কাতীত স্বসংবেদ্য এই মহাসুখ।

আঁশু—অংশু, আঁশ; নিরবর—নিরবয়ব; সেসু—শেষ। তউসে—তথাপি। হেরুঅ—হেতুরূপ; ন পাবিঅই—পাওয়া যায় না; অহারিউ—আহরণ করিলাম। চটারিউ—নিঃশেষ করিলাম; বহল—দীর্ঘ; বাট—বর্ত্ম, পথ; ন দিশঅ—দেখা যায় না; বালাগ—বালক ও অজ্ঞ; জুঅতি—যুক্তি; সএঁ সম্বেঅণ—স্ব-সংবেদ্য।

২৭

রাগ কামোদ

অধরাতি ভর কমল বিকসিউ।
বতিস জোইণী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ॥ ধ্রু॥
চালিঅ সসরহ মাগে অবধূই।
রঅণহু সহজে কহেই সোই॥ ধ্রু॥
চালিঅ সসহর গউ নিবাণেঁ।
কমলিনি কমল বহই পণালেঁ॥ ধ্রু॥
বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ।
জো এথু বুঝই সো এথু বুধ॥ ধ্রু॥
ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেঁ।
সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ॥ ধ্রু॥ [ভুসুকু]

অধরাত্তি—প্রজ্ঞা জ্ঞানাদি অভিষেক সময়; কমল—মহাসুখ কমল; বিকসিউ—বিকশিত হইল; বতিস…উহ্লসিউ—ললনা রসনা ইত্যাদি বত্রিশ নাড়ী আনন্দে উল্লসিত হইতেছে; চালিঅ…অবধূই —চিত্ত শশধর অবধূতী মার্গে চালিত হইল, সদ্‌গুরু বচন রূপ রত্নের দ্বারা সহজানন্দের কথা কহিতে লাগিল; চালিঅ…পণালেঁ—চিত্ত-শশধর (অবধূতী মার্গে) চালিত হইয়া নির্বাণে উপস্থিত হইল, কমলিনী, পরিশুদ্ধাবধূতিকা নৈরাত্মা, কমল প্রণালে (মহাসুখের পথে, প্রবাহিত হইল। বিরমানন্দ…বুধ—বিরমানন্দ বিলক্ষণ শুদ্ধ; (বিরমানন্দ —শূন্যাভিমুখী চিত্তের তৃতীয় শূন্যে অবস্থিতিতে যে আনন্দ তাহার নাম বিরমানন্দ। দ্রঃ ধর্মমত অধ্যায়। পৃঃ ৬৭) যে একথা বুঝে সেই জ্ঞানী। ভুসুকু…লীলেঁ—ভুসুকু বলিতেছেন আমি (প্রজ্ঞা ও উপায়ের) মিলনের দ্বারা সহজানন্দ মহাসুখকে অবলীলাক্রমে বুঝিয়াছি। সহজানন্দ—বোধি চিত্তের চতুর্থ শূন্য অর্থাৎ সর্বশূন্যে উপস্থিতিতে যে আনন্দ তাহাই সহজানন্দ।

আলোচ্য পদটিতে বোধিচিত্তের নির্বাণ লাভের বর্ণনা। সদগুরু-বচনে ও তান্ত্রিক পন্থা দ্বারা বোধিচিত্তকে স্বস্থান অর্থাৎ মণিমূল হইতে ক্রমে ঊর্ধ্বে প্রেরণ করা এবং মহাসুখ লাভের কথাই পদকর্তা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

২৮

রাগ বলড্ডি (বরাড়ি)

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী॥ ধ্রু॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি।
ণিঅ ঘরণী নামে সহজ সুন্দরী॥ ধ্রু॥
ণাণা তরুবর মৌলিলরে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডল বজ্রধারী॥ ধ্রু॥
তিঅধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবর ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী॥ ধ্রু॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুখে কাপুর খাই।
সুণ নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুখে রাতি পোহাই॥ ধ্রু॥
গুরুবাক্ পুঞ্চআ বিন্ধ ণিঅমণ বাণে।
একে শর সন্ধানেঁ বিন্ধহ পরম নিবাণেঁ॥ ধ্রু॥
উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে॥ ধ্রু॥

[শবরপাদ]

আলোচ্য পদটিতে শবর শবরীদের জীবন যাত্রার একটি মিলন মধুর চিত্রের রূপকে তত্ত্বকথার অবতারণা করা হইয়াছে। তৎকালীন সমাজ পরিবেশ আলোচনা এবং তত্ত্ব নিরপেক্ষ কাব্যরস আস্বাদনের পক্ষেও পদটির মূল্য অনস্বীকার্য।

পাবত—পর্বত; সবরী বালী—শবরী বালিকা; মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ—ময়ূর পুচ্ছ পরিহিত; গীবত গুঞ্জরী মালী—গ্রীবায় গুঞ্জামালা;

উমত -- উন্মত্ত ; গুলী—গোলমাল ; গুহাড়া তোহোরি—তোমাকে অনুরোধ ; ণিঅ···সুন্দরী—তোমার ি·জ ঘরণী নাম সহজ সুন্দরী ; ণাণা তরুবর—বিভিন্ন বৃক্ষ ; মৌলিলরে—মুকুলিত হইল ; গঅণত লাগেলী ডালী—শাখা গগনে লাগিল ; একেলী···বজ্রধারী—কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী শবরী একাকী এই বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; তিঅ ধাউ খাট—তিন ধাতুর খাট,—কায়, বাক, চিত্ত তিনধাতু ; সেজি ছাইলী—শয্যা বিছাইল ; পেহ্ম—প্রেমে, মহাসুখে ;, হিঅ তাঁবোলা—হৃদয় রূপ তাম্বুল ; মহাসুখে কাপুর – মহাসুখরূপ কর্পূর ; সুণ নৈরামণি······ রাতি পোহাই—শূন্য নৈরামণিকে কণ্ঠে (সম্ভোগচক্রে) লইয়া মহা সুখে রাত্রি (ক্লেশান্ধকার) পোহাইল। গুরুবাক্···ণিবাণেঁ—গুরু-বাক্যকে ধনু, নিজমনকে বাণ করিয়া এক শর সন্ধানে নির্বাণকে বিদ্ধ কর। উমত সবরো······লোড়িব কইসে—উন্মত্ত শবর পরম রোষে গিরিবর শিখরের সন্ধিদেশে প্রবেশ করিলে কেমন করিয়া ফিরিবে ?

পদটিতে তান্ত্রিক সাধনার ইঙ্গিত অতি স্পষ্ট। দেহ সুমেরুর শিখর দেশে শবরীর বাসস্থান,—মহাসুখচক্র। শবরীই শবরের সহজ-সুন্দরী গৃহিণী। মিলন একমাত্র তাহার সহিতই হওয়া উচিত। অর্থাৎ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মহাসুখলাভ। শবরীর বাসস্থান আনন্দোচ্ছল ; গগন (শূন্যতা)-স্পর্শী নানা তরু সেখানে মুকুলিত হইয়াছে। শবরও শবরীর আহ্বানে কায়বাক্‌চিত্ত তিনধাতুর খাট পাতিয়া সম্ভোগচক্রে শবরীর সহিত মিলিত হইল। অর্থাৎ বোধিচিত্তই ঊর্ধ্বমুখী হইয়া সম্ভোগ চক্রে উন্নীত হইল। গুরুবাক্যরূপ ধনু এবং নিজ মন রূপ বাণে নির্বাণকে বিদ্ধ করা হইল ফলে মহাসুখরূপ সিদ্ধিপ্রাপ্ত শবর সুমেরু শিখর হইতে বিষয় ক্লেশদুষ্ট জীবনে ফিরিল না।

২৯

রাগ পটমঞ্জরী

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই।
অইস সংবোহেঁ কো পতি আই ॥ ধ্রু ॥
লুই ভণই বট দুলক্‌খ বিণাণা।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ লাগে ণা ॥ ধ্রু ॥
জাহের বাণ চিহ্ন রূব ণ জাণী।
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী ॥ ধ্রু ॥
কাহেরে কিষ ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা।
উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা ॥ ধ্রু ॥
লুই ভণই (মই) ভাইব কীষ।
জা লই আছম তাহের উহ ণ দিস ॥ ধ্রু ॥ [লুই]

পদটির মধ্যে বিজ্ঞানবাদী মতের প্রভাব লক্ষণীয়। ভাব অভাব অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব প্রভৃতির কিছুই সত্যও নহে মিথ্যাও নহে—সত্য শুধু একমাত্র দুর্লক্ষ্য বিজ্ঞান। সেই সত্য জ্ঞান কায় বাক্ চিত্তের মধ্যেই লীলা করে কিন্তু তাহাতে সংলগ্ন হয় না। এই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের কোন বর্ণ চিহ্ন রূপ নাই—সুতরাং আগম বেদে তাহার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান কিরূপ এ প্রশ্নের কিই বা উত্তর দেওয়া চলে? যেমন উদক চন্দ্র, সত্যও নহে মিথ্যাও নহে। যিনি মহাসুখ লাভ করিয়াছেন (লুই) তিনি ভাবিয়াই বা কি করিবেন? তিনি যাহা লইয়া আছেন (মহাসুখ) তাহারই হদিশ পাইতেছেন না। (দ্রঃ দার্শনিক পটভূমিকা অধ্যায়।)

ভাব…জাই—এই জগৎ সংসারের অস্তিত্বও নাই অনস্তিত্বও

নাই; অইস……পতিআই—এই রূপ সংবোধে কে (সত্যকে) বোঝে; তিঅ ধাএ…লাগেণা—সত্য-জ্ঞান কায় বাক্ চিত্ত তিন ধাতুতে ক্রীড়া করে—কিন্তু কোনটিতেই সংলগ্ন হয় না। জাহের—যাহার; বাণ—বর্ণ; রূব—রূপ; বেএঁ—বেদে; জাহের…বখাণী—যাহার বর্ণ চিহ্ন রূপ নাই তাহাকে আগম বেদে কিরূপে ব্যাখ্যা করে? সহজিয়ারা জ্ঞান মার্গের বিরোধী। কাহেরে কিষ ভণি—কাহাকে কি বলি; মই দিবি পিরিচ্ছা—আমি দেব সমাধান; জিম—যেমন; সাচ—সত্য; উহন দিস—উদ্দেশ পাই না।

৩০

রাগ মল্লারী

করুণ মেহ নিরন্তর ফরিআ।
ভাবাভাব দ্বন্দল দলিআ॥ ধ্রু॥
উইএ গঅণ মাঝেঁ অদভুআ।
পেখরে ভুসুকু সহজ সরুআ॥ ধ্রু॥
জাসু সুণন্তে তুট্টই ইন্দিআল।
নিহুরে ণিঅমন দে উলাস॥ ধ্রু॥
বিসঅ বিশুদ্ধিঁ মই বুজ্‌ঝিঅ আনন্দে।
গঅণহ জিম উজোলি চান্দে॥ ধ্রু॥
এ তৈলোএ এত বিসারা।
জোই ভুসুকু ফেটই অন্ধকারা॥ ধ্রু॥ [ভুসুকু]

প্রকৃতি-চিত্রের মধ্য দিয়া সহজাবস্থার বর্ণনা করা আলোচ্য পদটির উদ্দেশ্য। মহাযান মতে শূন্যতা ও করুণার অভিন্নাবস্থা লাভই বোধিচিত্ত লাভ—এবং বোধিচিত্ত লাভের উপায়ও ঐ অভিন্নাবস্থা সৃষ্টি। এই

ধারণার সহিত পরবর্তী কালে তান্ত্রিকতা মিশিয়া চর্যার ধর্মের ভিত্তি রচনা করিয়াছে। (দ্রঃ ধর্মমত অধ্যায়।)। আলোচ্য পদটিতে প্রকৃতি বর্ণণার মধ্যদিয়া সেই তত্ত্বই প্রকাশিত।

গগন = শূন্যতা; মেঘ—করুণা; সহজানন্দ এখানে চাঁদরূপে কল্পিত। এই সহজ স্বরূপ চাঁদকে দেখিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়পাশ টুটিয়া যায় এবং নিভৃতে নিজমন উল্লসিত হয়। চাঁদ উঠিলে যেমন সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হয়, সহজ স্বরূপ চাঁদ উঠিলেও সেইরূপ বিষয় সকলের বিশুদ্ধি দ্বারা পরমানন্দ লাভ করা যায় অর্থাৎ অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়। জাসু—যাহা; সুনন্তে—শুনিয়া; সম্ভবত শব্দটি গুণন্তে হইবে। টীকায় আছে 'প্রতীক্ষণে'; পূর্বের পদের সহিত মিলাইয়া 'দেখিয়া' অর্থই সমীচীন মনে হয়। তুট্টই—টুটে; ইন্দিআল—ইন্দ্রিয়জাল; ছন্দের অনুরোধে—ইন্দিপাশ হওয়া উচিত। টীকায় ইন্দ্রিয়সমূহ বলা হইয়াছে। বিসঅ বিশুদ্ধি—বিষয় বিশুদ্ধি দ্বারা অর্থাৎ বিষয় জ্ঞান যে মিথ্যা এই তত্ত্ব লাভ করিয়া। বিসঅ·· অন্ধকারা —বিষয় জ্ঞান যে মিথ্যা এই সত্যলাভ করিয়া আমি সহজানন্দকে বুঝিয়াছি তাই গগনে চাঁদ উদিত হইলে যেমন ত্রিলোকের অন্ধকার দূর হয় সেইরূপ আমার (ভুসুকুর) অজ্ঞান অন্ধকার দূর হইয়াছে।

৩১

রাগ পটমঞ্জরী

জহি মন ইন্দিঅ পবণ হো ণঠা।
ণ জানমি অপা কহিঁ গই পইঠা॥ ধ্রু॥
অকট করুণা ডমরুলি বাজঅ।
আজদেব নিরাসে রাজঅ॥ ধ্রু॥
চান্দরে চান্দকান্তি জিম পতিভাসই।
চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসই॥ ধ্রু॥
ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লো আচার।
চাহন্তে চাহন্তে সুণ বিআর॥ ধ্রু॥
আজদেবেঁ সঅল বিহারিউ।
ভয় ঘিণ দুর নিবারিউ॥ ধ্রু॥ [আজদেব]

যেখানে মন, ইন্দ্রিয়, পবন নষ্ট হয়—অর্থাৎ বোধিচিত্ত যখন প্রকৃতি-প্রভাস্বর পারমার্থিক বোধিচিত্তে পরিণত হয়—তখন নিজে কোথায় যাই জানি না। সংবৃতি বোধিচিত্তই যে কেমন করিয়া পারমার্থিক বোধিচিত্তে পরিণত হয় তাহা যেন বুঝা যায় না। সেই অবস্থায় অদ্ভুত করুণা-ডমরুধ্বনি উত্থিত হয় এবং পদকর্তা বিষয়াসক্তিহীন হইয়া অবস্থান করেন। চাঁদ অস্তমিত হইলে যেমন চাঁদের কিরণও অন্তর্হিত হয় সেইরূপ বোধিচিত্ত বিনষ্ট হইলে—তাহার প্রকাশ বিষয় জ্ঞানও অন্তর্হিত হয়। পদকর্তা তাই ভয় ঘৃণা লোকাচার ইত্যাদি ছাড়িয়া সমস্ত সংসার দূষণকে বিফল করিয়া, দেখিয়া দেখিয়া শূন্য বিচার করিতেছেন।

সংবৃতি বোধিচিত্তই যে পারমার্থিক বোধিচিত্তে পরিণত হয়, এবং অতঃপর যে বিষয়জ্ঞান থাকে না সেই তত্ত্বই পদটিতে বর্ণিত হইয়াছে।

৩২

রাগ দেশাখ

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশি মণ্ডল।
চিঅরাঅ সহাবে মুকল ॥ ধ্রু ॥
উজু রে উজু ছাড়ি মা লেহু রে বাঙ্ক।
নিঅড়ি বোহি মা জাহু রে লাঙ্ক ॥ ধ্রু ॥
হাথেরে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ।
অপণে অপা বুঝতু নিঅ মণ ॥ ধ্রু ॥
পার উআরে সোই গজিই।
দুজ্জন সাঙ্গে অবসরি জাই ॥ ধ্রু ॥
বাম দাহিণ জো খাল বিখলা।
সরহ ভণই বপা উজুবাট ভাইলা ॥ ধ্রু ॥ [সরহ]

পদটিতে চর্যাকারদের সাধনতত্ত্বের কথা আছে। বাম দক্ষিণ দুই পথ ছাড়িয়া মধ্যপথ অবলম্বনই সহজ পথ অর্থাৎ সহজানন্দ সিদ্ধিলাভের পথ। চর্যার ধর্মের সেই তান্ত্রিক সহজিয়া সাধন পদ্ধতির কথাই সরহপাদ পদটির মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। (দ্রঃ ধর্মমত অধ্যায়।)

নাদ ন···মুকল—নাদ নাই, বিন্দু নাই, শশি নাই, রবি নাই, আছে শুধু অদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত স্বভাবমুক্ত চিত্তরাজ। বৌদ্ধতন্ত্রে নাদ, বিন্দু এবং রবি শশী ইত্যাদি যেমন বাম দক্ষিণ দুই নাড়ীকে বুঝাইয়াছে তেমনি সর্বপ্রকার দ্বৈত ভাবকেও বুঝাইয়াছে। সমস্ত প্রকার দ্বৈত-বিবর্জিত হইয়া সহজানন্দে প্রতিষ্ঠিত থাকাই সহজিয়াদের সাধনা। পূর্বোক্ত পংক্তিদ্বয়ে ইহারই ব্যঞ্জনা। উজুরে···লাঙ্ক—এ পথ ঋজু, সহজ পথ; এ পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথ অর্থাৎ নানা আচার অনুষ্ঠানের

জটিল পথ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। হাথেরে···দাপণ—হাতের কঙ্কন দেখিবার জন্য দর্পণ লইও না। পূর্বোক্ত পংক্তিদ্বয়ে বলা হইয়াছে এ পথ সহজ পথ। পদকর্তা উপমার সাহায্যে সেই বক্তব্য পরিস্ফুট করিতেছেন। হাতে কঙ্কন আছে কিনা দেখিবার জন্য দর্পণ লওয়া মানেই সহজ জিনিষকে অকারণ জটিল করা। অপণে···নিঅমণ—নিজের মনে তুমি নিজেই বোঝ। পার···গজিই —যোগী বোধিচিত্তের স্বরূপ বুঝিয়া তাহার অনুগামী হইয়া পারে অর্থাৎ সিদ্ধির পারে যায়। দুজ্জন···জাই—কিন্তু সেই আবার দুর্জন মোহাদির সাহচর্যে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। দুর্জন এখানে মোহাদি অর্থে উদ্দিষ্ট। বাম···ভাইলা--বাম দক্ষিণের পথ খাল-বিখাল অর্থাৎ বিপথ ; সরহ বলিতেছেন সোজা পথে চল।

৩৩

রাগ পটমঞ্জরী

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥ ধ্রু॥
বেঙ্গ সংসার বড্হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামায়॥ ধ্রু॥
বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে॥ ধ্রু।
জো সো বুধী শোধ নিবুধী।
জো সো চোর সোই সাধী॥ ধ্রু॥
নিতি নিতি ষিআলা ষিহে সম জুঝঅ।
ঢেণ্টণ পাএর গীত বিরলে বুঝঅ॥ ধ্রু॥ [ঢেণ্টণ পাদ]

গীতিটির মধ্যে চর্যার ধর্মমত, সাধন-পদ্ধতি ইত্যাদির সাধারণ কথাই অত্যন্ত হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। ভাষার হেঁয়ালিপনার দিক দিয়া পদটি ২সং পদের সহিত তুলনীয়। আপাতদৃষ্টিতে পদটির মধ্যে দরিদ্র গ্রাম্য-জীবনের একটি বিপর্যস্ত চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে। সেইদিক দিয়া পদটির মধ্যে তৎকালীন সমাজ-পরিবেশের আভাস পাওয়া যায়।

টালত—টীলার উপর; সন্ধা ভাষায় 'টা'-মহাসুখচক্র, প্রকৃতি দোষহীন সর্বশূন্য স্তর। (দ্রঃ দার্শনিক পটভূমি অধ্যায় পৃঃ ১০১।); পড়বেষী—প্রতিবেশী; এখানে দ্বৈতভাব। হাড়ীত=হাড়ীতে, দেহ-ভাণ্ডে; নিতি—নিত্য; ভাত=এখানে প্রকৃতি দোষযুক্ত সংবৃতি বোধিচিত্ত; আবেশী—আসে; টালত···আবেশী—চিত্ত যখন মহাসুখ চক্রে ঊর্ধ্বগামী হয় তখন সমস্ত দ্বৈতভাব চলিয়া যায়; দেহের মধ্যে সংবৃতি বোধিচিত্তের আর সন্ধান পাওয়া যায় না তাই পারমার্থিক বোধিচিত্ত নিত্যই আসে। বেঙ্গ—বিগত অঙ্গ; বড়হিল যায়—বাড়িয়া যায়; সংসারের অঙ্গহীনতার জ্ঞান অর্থাৎ শূন্যতার জ্ঞান দিন দিন বাড়িয়া যায়। দুহিল দুধ—দোহা দুধ, এখানে বোধিচিত্ত; বেণ্টে—বাঁটে, মহাসুখ চক্রপথে; সামায়—প্রবেশ করে। বলদ—সংবৃতি বোধিচিত্ত; সংবৃতি বোধিচিত্তই জগৎ-সংসারের ধারণা সৃষ্টি করে তাই বলা হইয়াছে বলদ প্রসব করে; গবিআ—গাভী; বাঁঝে—বন্ধ্যা; নৈরাত্মারূপী শূন্যতাকে গাভী বলা হইয়াছে। এই অবস্থায় জগৎসংসারের ধারণা থাকে না, তাই বন্ধ্যা। পিটা দুহিএ ইত্যাদি—পিটা=বাঁট; ত্রিসন্ধ্যা পিট দোহন করি। প্রকৃতিদোষকেই বাঁট বলা হইয়াছে। দোহন করা অর্থ নিঃস্বভাবীকৃত করা।

ত্রিসন্ধ্যা প্রকৃতিদোষগুলিকে নিঃশেষ করা হইয়াছে। জোসো বুধী ইত্যাদি—বুধী—বুদ্ধি, অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তিগণের বুদ্ধি; শোধ—শুদ্ধচিত্ত যোগী; নিবুধী—নির্বুদ্ধি। অজ্ঞ ব্যক্তিগণের যাহা বুদ্ধি—শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের নিকট তাহা নির্বুদ্ধি। চোর—চিত্তকেই এখানে চোর বলা হইয়াছে—কারণ চিত্ত বিষয় সুখের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকা সত্ত্বেও তাহা আহরণ করে। অথবা চিত্ত প্রকৃতিদোষ অপহরণ করে তাই সে চোর—আবার সে-ই সাধু। ষিআলা—শৃগাল। চিত্তই শৃগাল, কারণ ইহা সর্বদা মৃত্যুভয়ে ভীত। এই চিত্তই আবার মুক্ত হইয়া যুগনদ্ধরূপ সিংহের সহিত যুদ্ধ করে। গোপনীয়তা তান্ত্রিক সাধকদিগের বৈশিষ্ট্য ছিল। গীতিটি হেঁয়ালিপূর্ণ। পদকর্তাও তাই বলিয়াছেন—ঢেণ্ঢণ পাদের গীতি বিরলে বুঝ।

৩৪

রাগ বরাড়ী

সুন করুণরি অভিনচারেঁ কাঅ বাকচিঅ
বিলসই দারিক গঅণত পারিম কুলেঁ ॥ ধ্রু ॥
অলক্ষলখ চিত্তা মহাসুহে
বিলসই দারিক গঅণত পারিম কুলেঁ ॥ ধ্রু ॥
কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তোরে ঝাণ বখানে।
অপইঠান মহাসুহ লীলেঁ দুলখ পরম নিবাণে ॥ ধ্রু ॥
দুঃখেঁ সুখে একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দীজানী।
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তর মানী ॥ ধ্রু ॥
রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।
লুই পাঅপএ দারিক দ্বাদশ ভুঅণেঁ লধা ॥ ধ্রু ॥ [লুই]

পদকর্তা এখানে শূন্যতা ও করুণার অভিন্নতার দ্বারা গগনের পরমকুলে অর্থাৎ সর্বশূন্য স্তরে বিহার করেন—ইত্যাদি উক্তির মধ্য দিয়া সহজিয়া সাধনার সিদ্ধির কথা নির্দেশ করিয়াছেন এবং অতঃপর চিত্তের কি অবস্থা হইয়াছে তাহাও বর্ণনা করিয়াছেন।

গগনের পরম কুল—তিনশূন্যের পরবর্তী সর্বশূন্য স্তর। এই অবস্থায়—চিত্ত অলক্ষ্য লক্ষণ; চিত্ত যখন সর্বশূন্য স্তরে বিলাস করে তখন চিত্তের কোন লক্ষণ অর্থাৎ প্রাতিভাসিক জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায় না।

কিন্তো মন্তে···নিবাণে—সাধনার পথ সহজ পথ তাই মন্ত্র তন্ত্র ধ্যান ব্যাখ্যান ইত্যাদিতে কিছুই হয় না। যাহারা মহাসুখলীলায় অপ্রবিষ্ট তাহাদের নিকট পরম নির্বাণ দুর্লক্ষ্য।

দুঃখেঁ—মানী—সুখ-দুঃখকে এক করিয়া গুরু উপদেশে ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহ উপভোগ করা। মহাসুখ লাভ করিলে চিত্তের অবস্থা এই-রূপই হয় অর্থাৎ সুখ-দুঃখ তখন একাকার হইয়া যায়। দারিকও তাই আত্ম পর কোন ভেদ করিতে পারেন না, তিনি সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে।

রাআ···লধা—দারিক মহাসুখ লাভ করিয়া রাজা হইয়াছেন; অন্য রাজা যাঁহারা আছেন তাঁহারা বিষয় মোহে বদ্ধ। কিন্তু দারিক লুই-এর পাদপ্রসাদে দ্বাদশ ভুবন লাভ করিয়াছেন—অর্থাৎ সকল-কিছুর উর্ধ্বে উঠিয়া আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছেন।

গীতিটিতে সাধন পদ্ধতির কিছু ইঙ্গিত, সহজিয়া মনোভাব, এবং এবং মহাসুখলব্ধ চিত্তের অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়।

৩৫ ৫৪

রাগ মল্লারী

এতকাল হাঁউ অচ্ছিলোঁ স্বমোহে।
এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরু বোহেঁ ॥ ধ্রু ॥
এবেঁ চিঅরাঅ মকু ণঠা।
গঅণ-সমুদে টলিআ পইঠা ॥ ধ্রু ॥
পেখমি দহদিহ সব্বই শূন।
চিঅ বিহুনে পাপ ন পুণ্ন ॥ ধ্রু ॥
বাজুলে দিল মো লক্‌খ ভণিআ।
মই অহারিল গঅণত পসিআ ॥ ধ্রু ॥
ভাদে ভণই অভাগে লইআ।
চিঅরাঅ মই অহার কএলা ॥ ধ্রু ॥ [ভাদে]

চর্যার সাধকেরা মায়াবাদী। তাঁহারা মনে করেন জগৎ-সংসারের সমস্ত জ্ঞানই চিত্তের সৃষ্টি। সেই চিত্তকে বিনাশ করিতে পারিলে সিদ্ধি লাভ হয়। আলোচ্য পদটিতে সেই চিত্ত বিনাশের কথা বলা হইয়াছে।

এতকাল...পইঠা—এতকাল আমি মোহগ্রস্ত ছিলাম। এবার আমি সদ্‌গুরুর বোধে বুঝিয়াছি (চিত্তের স্বরূপ)। চিত্ত এখন নষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ নিঃস্বভাবীকৃত হইগাছে তাই গগনসমুদ্রে অর্থাৎ সর্বশূন্য স্তরে প্রবেশ করিয়াছে।

পেখমি.. পসিআ—এখন আমি দশদিক শূন্য দেখিতেছি এবং চিত্ত না থাকায় পাপ-পুণ্য কোন বোধই নাই। বজ্রগু আমাকে লক্ষ্য বলিয়া দিয়াছেন, আমি গগনে প্রবেশ করিয়া

অর্থাৎ শূন্যতায় প্রবেশ করিয়া সংবৃতি বোধিচিত্তকে আহার করিয়াছি।

ভাদে…কএলা—পদকর্তা ভাদে বলিতেছেন অভাগকে লইয়া; অর্থাৎ যাহার আর ভাগ হয় না অদ্বয় সত্যকে লইয়া আমি চিত্ত-রাজকে (সংবৃতি বোধিচিত্তকে) আহার করিয়াছি।

৩৬

রাগ পটমঞ্জরী

স্থণ বাহ তথতা পহারী।
মোহ ভণ্ডার লই সঅলা অহারী॥ ধ্রু॥
ঘুমই ন চেবই সপর বিভাগা।
সহজ নিদালু কাহ্নিলা লাঙ্গা॥ ধ্রু॥
চেঅণ ন বেঅণ ভর নিদ গেলা।
সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা। ধ্রু॥
স্বপণে মই দেখিল তিহুবণ স্থণ।
ঘোরিঅ অবণাগমণ বিহুণ॥ ধ্রু॥
শাখি করিব জালন্ধরি পাএ।
পাখি ন রাহঅ মোরি পাণ্ডিআ চাএ। ধ্রু॥ [কাহ্নু]

সমস্ত প্রকৃতিদোষ নিঃশেষে দূর করিয়া সর্বশূন্য স্তরে উন্নীত হইলে সাধকের যে অবস্থা হয় পদটির মধ্যে তাহারই বর্ণনা আছে।

স্থণ = শূন্য, প্রথম তিন শূন্য (দ্রঃ দার্শনিক পটভূমি অধ্যায়—শূন্যের আলোচনা) বাহ = বাহু; তথতা = চতুর্থ শূন্য। মোহ ভণ্ডার = প্রথম তিন শূন্যের সহিত যুক্ত প্রকৃতিদোষই মোহ ভাণ্ডার। চতুর্থ শূন্য তথতা দ্বারা প্রথম তিন শূন্যকে আঘাত করিলাম এবং সমস্ত প্রকৃতিদোষ

আহার করিলাম অর্থাৎ নিঃশেষ করিলাম।

ঘুমই…লাঙ্গা—'সহজ'-নিদ্রালু উলঙ্গ যোগী (সর্বপ্রকার দোষমুক্ত তাই উলঙ্গ) কাহ্ন। সাধারণ অর্থে, নিদ্রিত নহে জাগ্রতও নহে, তাহার আত্মপর ভেদও নাই।

চেঅন…সুতেলা—তাঁহার চেতনাও নাই বেদনাও নাই; তিনি মহাসুখ নিদ্রায় মগ্ন; সকলই তাহার সুফল অর্থাৎ তিনি সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে।

স্বপণে‥ বিহুণ--(এই অবস্থায়) জগৎকে দেখিলাম স্বপ্নবৎ, গমনাগমন, জন্মমৃত্যুহীন।

শাখি…পাণ্ডিআচাএ—এ বিষয়ে সাক্ষী করিব জালন্ধরিপাদকে, কারণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা এ ব্যাপারে আমার পক্ষে নহেন।

১২৭ 66

রাগ কামোদ

অপণে নাহিঁ মো কাহেরি শঙ্কা।
তা মহা মুদেরী টুটি গেলি কংখা॥ ধ্রু॥
অনুভব সহজ মা ভোলরে জোই।
চৌকোটি বিমুকা জইসো তইসো হোই। ধ্রু।
জইসনে অছিলেস তইসন অচ্ছ।
সহজ পথক জোই ভান্তি মা বাস॥ ধ্রু॥
বাণ্ডকুরুণ্ড সন্তারে জানী।
বাক্‌পথাতীত কাঁহি বখানী॥ ধ্রু॥
ভণই তাড়ক এথু নাহিঁ অবকাশ।
জো বুঝই তা গলেঁ গলপাস॥ ধ্রু॥ [তাড়ক]

জগৎ-সংসারের শূন্য স্বরূপতা এবং সহজ পন্থা উপলব্ধিই চর্যাটির বক্তব্য।

অপনে···তইসো হোই—যখন নিজেরই কোন অস্তিত্ব নাই, তখন আর কিসের শঙ্কা। সুতরাং মুদ্রা ইত্যাদি তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের আকাংক্ষাও নাই। জগৎ-সংসারের সমস্ত কিছু চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত—এই পরম অনুভূতিই সহজ অনুভূতি। (জগৎ সংসারের শূন্যতা স্বভাব—আলোচনার জন্য দার্শনিক পটভূমি অধ্যায় দ্রঃ।)

জইসনে···বাস—যেমন ছিলে তেমনি থাক, পথ যে সহজ তাহা ভুলিও না। সহজিয়াদের পন্থা সহজ, অকারণ অনুষ্ঠানবহুল পথ তাহাদের কাম্য নহে।

বাণ্ডকুরুণ্ড···বখানী—যাহারা বাহ্যভয়ে ভীত, তাহারা এই সহজ অনুভূতি লাভের যোগ্য নয়। অনির্বচনীয় এই তত্ত্ব কি করিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। [গীতির পূর্বোক্ত পংক্তিটির সহিত পরবর্তী পংক্তির যোগ খুব স্পষ্ট নয়। টীকা হইতে পূর্বোক্তরূপ অন্বয় অনুমান করা চলে।]

ভণই তাড়ক ··গলপাস—মূর্খ যোগীরা এ ধর্মে প্রবেশ করিতে পারে না। যাহারা বুঝে বলিয়া ভাণ করে তাহাদের গলায় গলপাশ (দড়ি)।

৩৮

রাগ ভৈরবী

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মন কেড়ুআল।
সদগুরু বঅণে ধর পতবাল ॥ ধ্রু ॥
চীঅ থির করি ধরহু রে নাই।
আন উপায়ে পার ণ জাই ॥ ধ্রু ॥
নৌবাহী নৌকা টাণঅ গুণে।
মেলি মেল সহজে জাউ ণ আণেঁ ॥ ধ্রু ॥
বাটত ভঅ খাণ্ট বি বলআ।
ভব উলোলেঁ সব বি বোলিআ ॥ ধ্রু ॥
কুল লই খরে সোন্তেঁ উজাঅ।
সরহ ভণই গঅণেঁ সমাঅ ॥ ধ্রু ॥ [সরহ]

নৌকা বাহিবার রূপকে এখানে সহজ সাধনার ইঙ্গিত। কায়া হইল নৌকা, মন দাঁড়, সদ্‌গুরুবচন হইল হাল। নৌকা বাহিয়া সিদ্ধির পারে যাইবার পক্ষে চিত্তস্থৈর্য অপরিহার্য। নৌবাহিক যেমন নৌকাকে গুণ দ্বারা আকর্ষণ করে সেইরূপ কায়ানৌকাকে সহজের সহিত মিলিত কর, অন্য পথে যাইও না। পথে ভয় আছে—দস্যুও বলবান্। তরঙ্গ ভঙ্গে সবই বিধ্বস্ত হয়। কুল (অবধুতি মার্গ) ধরিয়া খরস্রোতে উজাইয়া চল এবং এই ভাবেই গগনে প্রবেশ কর।

তান্ত্রিক পদ্ধতি কায়সাধনার পদ্ধতি। কায়া তাই নৌকা; পদটিতে আগাগোড়া নৌকা বাহিবার রূপকল্প। কায়া নৌকার সাথে সাথে তাই আসিয়াছে মন দাঁড়, সদ্‌গুরুবচন হাল, সহজ স্বরূপ গুণ। পথে দস্যুভয় আছে, সেই দস্যু হইল দ্বৈত জ্ঞান। ভবজ্ঞান এখানে তরঙ্গ-

রূপে কল্পিত। খরস্রোতে নৌকাকে যেমন কূল ধরিয়া বাহিতে হয় এখানেও কূল—অবধূতি মার্গ। নৌকা বহা ও উজাইয়া চলা—উল্টা সাধনা। মণিমূলের কুণ্ডলিনী শক্তি স্বাভাবিকভাবে নিম্নগা। তাহাকে উর্ধ্বগ করাই সাধনা। সাধনা তাই স্বভাবতঃই উজাইয়া চলা।

৩৯

রাগ মালশী

সুইণা হ অবিদারঅ রে নিঅমন তোহেরেঁ দোসে।
গুরু বঅন বিহারেঁ রে থাকিব তই ঘুণ্ড কইসে ॥ধ্রু॥
অকট হুঁভব গঅণা।
বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাঙ্গেল তোহার বিণাণা ॥ ধ্রু ॥
অদভুঅ ভব মোহা রে দিসই পর অপ্পণা।
এ জগ জলবিম্বাকারে সহজে সুণ অপণা ॥ ধ্রু।
অমিয়া আচ্ছন্তে বিস গিলেসি রে চিঅ পরবস অপা।
ঘরেঁ পরেঁ কা বুঝ্ঝিলেস রে খাইব দুঠ কুণ্ডবা ॥ ধ্রু ॥
সরহ ভণন্তি বর সুণ গোহালী কি মো দুঠ বলন্দেঁ।
একেলেঁ জগ নাশিঅ রে বিহরহু সুচ্ছন্দে ॥ ধ্রু ॥ [সরহ]

জগৎ সংসারের মিথ্যাস্বরূপ এবং সহজ জ্ঞান উপলব্ধিই চর্যাটির বক্তব্য।

সুইণাহ—স্বপ্নের মত; অবিদারঅ—অবিদ্যারত; স্বপ্ন সদৃশ এই মিথ্যা জগৎ, রে অবিদ্যারত নিজ মন, তোর দোষেই সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়।

গুরুবঅন—গুরু বচন ; ঘুণ্ড কইঁসে—কোথায় ঘুরিস ; গুরুবচন-বিহারে থাকিবি, না কোথায় ঘুরিতেছিস।

অকট—অদ্ভুত ; হুঁভব—হুঙ্কারোদ্ভব ; গঅণা—গগন, প্রভাস্বর চতুর্থ শূন্য। বঙ্গে—বঙ্গকে, অদ্বৈতজ্ঞানকে ; ভাঙ্গেল তোহার বিণাণা—তোর বিজ্ঞান (=অবিদ্যাদোষজাত বিষয়বিজ্ঞান) দূর হইল।

অদভুঅ···অপনা=অদ্ভুত এই ভবমোহ, তাই পর আপন ভেদ প্রতিভাত হয় ; জগৎ জলবিম্বাকার (মায়া), এখানে সহজে প্রতিষ্ঠিত শূন্যই কেবল আপন।

অমিয়া······পরবসঅপা—রে পরবশচিত্ত ; অমৃত থাকিতে বিষ গলাধঃকরণ করিতেছিস। চিত্ত যতক্ষণ অবিদ্যাচ্ছন্ন থাকে ততক্ষণ পরবশ। এই চিত্তই যখন সহজজ্ঞান লাভ করে তখন মহাসুখরূপ অমৃত লাভ করে।

ঘরেঁ—গৃহে—অর্থাৎ নিজের দেহে ; পরেক—পরকে অর্থাৎ পরম তত্ত্বকে ; স্বকায়ে পরম তত্ত্ব বুঝিয়া আমি দুষ্ট কুণ্ড (দুঠ কুণ্ড) রাগ দ্বেষ মোহাদির উৎসকে আহার করিব (ধ্বংস করিব)।

সরহ···বলন্দে—সরহ বলিতেছেন—শূন্য গোহাল বরং ভাল ; দুষ্ট বলদে কি হইবে। নিজ দেহকে গোহাল বলা হইয়াছে। গো=ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের আধার বলিয়া দেহ গোহাল ; শূন্য গোহাল অর্থে ইন্দ্রিয়প্রভাব শূন্য। দুষ্ট বলদ=দুষ্ট বিষয়ে যাহা বল দান করে অর্থাৎ সংবৃতি বোধিচিত্ত।

একেলেঁ···সুচ্ছন্দে—একলাই জগৎ নাশিয়া জগতের মিথ্যাজ্ঞান দূর করিয়া, স্বচ্ছন্দে বিচরণ কর।

৪০

রাগ মালসী গবুড়া

জো মণ গোঅর আলা জালা।
আগম পোথী ইষ্টমালা ॥ ধ্রু ॥
ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জায়।
কাআ বাক চিঅ জসু ণ সামায় ॥ ধ্রু ॥
আলেগুরু উএসই সীস।
বাক পথাতীত কাহিব কীস ॥ ধ্রু ॥
জেতই বোলী তে তবি টাল।
গুরু বোব সে সীসা কাল ॥ ধ্রু ॥
ভণই কাহ্নু জিণ রঅণ বি কইসা।
কাল বোবেঁ সংবোহিঅ জইসা ॥ ধ্রু ॥ [কাহ্নু]

সহজ স্বরূপের অনির্বচনীয়তা, শাস্ত্র এবং আচার-অনুষ্ঠান-প্রাচুর্যের মধ্য দিয়া ইহাকে উপলব্ধি ও ব্যাখ্যার চেষ্টার ব্যর্থতা—আলোচ্য পদটির বক্তব্য।

জো মণ···ইষ্টমালা—যাহা কিছু মনোগোচর—অর্থাৎ মন এবং ইন্দ্রিয় সৃষ্ট, যাহা কিছু আগম পুথিতে (শাস্ত্রাদিতে) বর্ণিত এবং ইষ্ট-মালা অর্থাৎ ইষ্ট লাভের জন্য মালা জপ ইত্যাদি যে সমস্ত অনুষ্ঠান—সমস্তই মিথ্যা মায়া।

ভণ কইসেঁ···সামায়—বল, সহজ কায়বাক্‌চিত্ত যেখানে প্রবেশ করে না সেই স্বরূপ কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

আলে গুরু···কীস—অকারণেই (=আলে) গুরু শিষ্যকে উপদেশ দান করেন (উএসই)। যাহা বাক্যাতীত তাহা কি করিয়া বলা যায়।

জেতইঁ···কাল—যিনিই ইহা বলিবার চেষ্টা করিবেন, তিনিই অকারণ জটিলতার সৃষ্টি করিবেন। সহজ স্বরূপের উপলব্ধি বিষয়ে গুরু বোবা, শিষ্য কালা (বধির)।

ভণই···জইসা—কাহ্নু বলিতেছেন 'জিন রত্ন'—চতুর্থানন্দ কিরূপ যদি এই প্রশ্ন করা হয় এবং ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয় তবে—বোবার দ্বারা কালাকে বোঝানোর মত ব্যাপার হইবে।

৪১

রাগ কহ্নু গুঞ্জরী

আইএ অনুঅনাএ জগরে ভাংতিএঁ সো পড়িহাই।
রাজসাপ দেখি জো চমকই সাঁচে কি তা বোড়ো খাই ॥ ধ্রু ॥
অকট জোইআ রে মা কর হথা লোহ্না।
অইস সভাবে যদি জগ বুঝসি তুটই বাসনা তোরা ॥ ধ্রু ॥
মরু মরীচি গন্ধর্ব নঅরী দাপণ পড়িবিম্বু জইসা।
বাতাবত্তে সো দৃঢ় ভইআ অপে পাথর জইসা ॥ ধ্রু ॥
বান্ধি সুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেলা।
বালুআ তেলেঁ সসর সিংগে আকাশ ফুলিলা ॥
রাউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা অইস সহাব।
জই তো মূঢ়া অচ্ছসী ভান্তী পুচ্ছতু সদগুরুপাব ।। ধ্রু ।। [ভুসুকু]

পদটিতে শূন্যবাদীদের মতের প্রকাশ লক্ষণীয়। শূন্যবাদীদের মতে জগৎ সংসারের কোন অস্তিত্ব নাই, তাহা মিথ্যা মায়া মাত্র সুতরাং তাহাতে আসক্ত হওয়াও উচিত নয়। পদটিতে জগতের অলীকত্ব কি ধরণের তাহা কয়েকটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝান হইয়াছে। (দ্রষ্টব্য ঃ চর্যাপদের দার্শনিক পটভূমি অধ্যায়।)

আইএ—আদিতে; অনুঅনাএ—অনুৎপন্ন; ভাংতিএঁ—ভ্রান্তির দ্বারা; পড়িহাই—প্রতিভাত হয়; রাজসাপ—রজ্জুসর্প; সাঁচে—সত্যই; তা বোড়ো খাই—তাহাকে বোড়া সাপে খায়; অকট=মূর্খ; জোইআ—যোগী; মা কর···লোহ্না—হাত লবণাক্ত করিও না, সংসারে জড়াইয়া পড়িও না; অ স···তোরা—এইভাবে যদি জগতের স্বরূপ বুঝিস তবেই তোর বাসনা দূর হইবে। মরু···ফুলিলা—মরুমরীচিকা, গন্ধর্ব নগরী, দর্পণ প্রতিবিম্ব, বাতাবর্তে জলস্তম্ভ, বন্ধ্যাসুতের ক্রীড়া, বালুকা তৈল, শশক শৃঙ্গ, আকাশ-কুসুম ইত্যাদি যেমন (মিথ্যা—জগৎ সংসারও সেইরূপ।) রাউতু···পাব—রাউতু বলিতেছেন, ভুসুকু বলিতেছেন—সমস্ত এই স্বভাব, যদি তুমি এখনও মূঢ় আছ তবে সদ্‌গুরু পদে জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের ভ্রান্তি বুঝিয়া লও।

৪২

রাগ কামোদ

চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না।
কান্ধ বিয়োএঁ মা হোহি বিসন্না॥ ধ্রু॥
ভণ কইসে কাহ্ন নাহি।
ফরই অনুদিন তৈলোএ পমাই॥
মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।
ভাগ তরঙ্গ কি সোসই সাঅর॥
মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ন পেখই।
দুধ মাঝে লড় অচ্ছন্তে ন দেখই॥
ভব জাই ণ আবই এথু কোই।
অইস ভাবে বিলসই কাহ্নিল জোই॥ [কাহ্ন]

বস্তু সত্তার অসারত্ব প্রসঙ্গে বিজ্ঞানবাদীরা শূন্যবাদীদের সহিত একমত হইলেও বিজ্ঞানবাদীরা চিত্তকে অসৎ (অস্তিত্বহীন) বলেন নাই। তাঁহারা জগৎ সংসারের শূন্যত্ব ব্যাখ্যা করিতে নেতিমূলক যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকেই শূন্যতা বলিয়াছেন। সেই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান আবার ক্রমে উপনিষদের ব্রহ্ম ধারণার সহিত অনেকটা অভিন্ন হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য পদটিতে বিজ্ঞানবাদীদের মত অনুসরণ করিয়া বিজ্ঞপ্তি মাত্রতার আনন্দময় ব্রহ্মের মত স্বরূপ বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। (দ্রঃ চর্যাপদের দার্শনিক পটভূমি অধ্যায়)।

চিঅ······সংপুণ্ণা—চিত্ত সহজের দ্বারা শূন্য হইয়া সম্পূর্ণ। কান্ধ···বিসন্না—স্কন্ধ বিয়োগে বিষণ্ণ হইও না ; স্কন্ধ বিয়োগ অর্থাৎ মৃত্যু, কারণ বৌদ্ধ মতে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পঞ্চ স্কন্ধের সমন্বয়। ভণ কইসে···পমাই—বল কাহ্ন নাই কি করিয়া ; অনুদিন সে ত্রিলোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিহার করিতেছে। মূঢ়া···সাঅর—মূঢ়রাই দৃষ্ট বস্তুকে নষ্ট দেখিয়া কাতর হয়। তরঙ্গ ভঙ্গ কি সাগর শোষণ করে ? মৃত্যুর পর সমস্ত শেষ নয়। মৃত্যুর পরও থাকে সাগর স্বরূপ আনন্দময় শাশ্বত অস্তিত্ব। তরঙ্গ ভঙ্গে যেমন সাগর নিঃশেষ হয় না, সেইরূপ ব্যক্তি-জীবনের ঢেউ দ্বারা শাশ্বত অস্তিত্ব সাগরের কোন পরিবর্তন সূচিত হয় না। মূঢ়া···দেখই—দুধের মধ্যে স্নেহপদার্থ যেমন দেখা যায় না তবুও থাকে—সেই আনন্দ-স্বরূপও সেইরূপ আছে কিন্তু মূঢ়েরা তাহাকে দেখিতে পায় না। ভব···জোই—এখানে কোন অস্তিত্ব আসেও না যায়ও না—এইভাবে কাহ্নিল যোগী বিলাস করিতেছেন।

৪৩

সহজ মহাতরু ফরিঅ তিলোএ।
খসম সভাবেরে বাণত কা কোএ॥ ধ্রু॥
জিম জলে পাণিআ টালিআ ভেড় ন জাঅ।
তিম মণ রঅন রে সমরসে গঅণ সমাঅ॥ ধ্রু॥
জাসু নাহি অপ্পা তাসু পড়েলা কাহি।
আই অণু অণা রে জাম মরণ ভব নাহি॥ ধ্রু॥
(ভুসুকু ভণই কট রাউতু ভণই কট সঅল এহ সহাব।
জাইণ আবই রে ণ তহিঁ ভাবাভাব॥ ধ্রু॥ [ভুসুকু])

এই পদটিতেও শূন্য স্বরূপের বর্ণনা।

সহজ মহাতরু ত্রিলোকে স্ফুরিত। সমস্তই শূন্য স্বভাব (খসম স্বভাব) সুতরাং কে কাহাকে বাঁধে? জলে যেমন জল মিশিলে ভেদ করা যায় না সেইরূপ মনরত্ন সমরস (মহাসুখ) রূপ গগনে প্রবেশ করিলে আর পৃথক করা যায় না। যেখানে আত্ম বলিয়া কিছু নাই সেখানে অনাত্ম বলিয়া কিছু থাকে কেমন করিয়া? যাহা আদিতেই অনুৎপন্ন তাহার আর জন্ম-মৃত্যু অস্তিত্ব ইত্যাদি কি? পদকর্তা বলিতেছেন সমস্ত কিছুরই এই স্বভাব অর্থাৎ শূন্য স্বভাব। এই সহজভাবে কিছু যায়ও না কিছু আসেও না, কোন কিছুর অস্তিত্বও নাই অনস্তিত্বও নাই। দ্রঃ ৪১ সং পদ ও চর্যাপদের দার্শনিক পটভূমি।

৪৪

রাগ মল্লারী

সুনে সুন মিলিআ জবেঁ।
সঅলধাম উইআ তবেঁ ॥ ধ্রু ॥
আচ্ছহুঁ চউখন সংবোহী।
মাঝ নিরোহ অণুঅর বোহী ॥ ধ্রু ॥
বিন্দু ণাদ ণ হিএ পইঠা।
আণ চাহন্তে আণ বিণঠা ॥ ধ্রু ॥
জথাঁ আইলেসি তথা জান।
মাঝেঁ থাকী সঅল বিহাণ ॥ ধ্রু ॥
ভণই কঙ্কণ কলঅল সাদেঁ।
সর্ব বিচ্ছরিল তথতা নাদেঁ ॥ ধ্রু ॥ [কঙ্কন-পাদ]

সুনে—শূন্যে, চতুর্থ শূন্যে; সুন—শূন্য, প্রকৃতি-দোষযুক্ত তিনটি শূন্য, চতুর্থ শূন্যে যখন প্রথম তিনটি শূন্য লীন হইল। সঅল···তবেঁ—তখন সকল ধর্ম চিত্তে উদিত হইল, অর্থাৎ সকল কিছুর স্বরূপ অবগত হইলাম। আচ্ছহুঁ···সংবোহী—চারিটি ক্ষণ দ্বারা সংবোধিত হইয়া আছি। চিত্ত যখন প্রথম শূন্য হইতে উর্ধ্বগা হইয়া চতুর্থ শূন্যের দিকে যায় তখন প্রতিটি স্তরের সহিত এক একটি 'ক্ষণ' বা মানসিক অবস্থা কল্পনা করা হয়, যথাক্রমে বিচিত্র, বিপাক, বিমর্দ, বিলক্ষণ। চতুর্থ শূন্যের উপলব্ধি তাই চারিটি ক্ষণ দ্বারা সংবোধিত হওয়া। মাঝ নিরোহ···বোহী—মধ্যপথ অবলম্বন দ্বারা অনুত্তর বোধী লাভ করিলাম। বিন্দু······পইঠা—বিন্দুনাদ হৃদয়ে প্রবেশ করে না। বিন্দুনাদ—দ্বৈতভাব। চিত্ত দ্বৈতভাব মুক্ত। আন ··বিনঠা—একটিকে

দেখিয়া অন্যটি বিনষ্ট, শূন্যতা দেখিয়া বোধিচিত্ত বিনষ্ট। জথাঁ...জান —যেথান হইতে আসিয়াছ সেখানকে জান; বিজ্ঞানের পরিণামেই ত্রিজগতের উদ্ভব, সেই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকেই জান। মাঝেঁ...সঅল বিহান—মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া অদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে সকল বিধান হয়। ভণই...নাদেঁ—কঙ্কন বলিতেছেন, সাকার নিরাকারাদি সমস্ত কলকল শব্দ তথতা নাদে ডুবিয়া গেল।

পদটিতে বিজ্ঞানবাদীদের মতানুসরণ করিয়া, দ্বৈতমুক্ত বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-ই যে 'শূন্য'—এই প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের উপলব্ধিই শূন্যের উপলব্ধি।

৪৫

রাগ মল্লারী

মণতরু পঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
আসা বহল পাত ফল বাহা।। ধ্রু।।
বরগুরু বঅণে কুঠারেঁ ছিজঅ।
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ন উইজঅ।। ধ্রু।।
বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পাণী।
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী।। ধ্রু।।
জো তরু ছেব ভেব ন জানই।
সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মাণই।। ধ্রু।।
সুণ তরুবর গঅণ কুঠার।
ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল।। ধ্রু।। [কাহ্ন]

বাসনা বিক্ষুব্ধ অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্তই সমস্ত ভবজ্ঞান ও দুঃখ বিপর্যয়ের মূল এবং সদ্‌গুরু বচনে সেই চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়া প্রকৃতি প্রভাস্বর

চিত্তে পরিণত করাই মুক্তির উপায়—ইহাই আলোচ্য গীতিটির বক্তব্য।

মন তরু স্বরূপ, পঞ্চেন্দ্রিয় যেন তাহার শাখা। বহুল আশাই পত্রফলবাহক। সদগুরু বচনরূপ কুঠারে সেই তরুকে এমনভাবে ছেদন কর যেন সেই তরু পুনরায় না উজায় (উদ্ভিন্ন হয়)। তরু যেমন জল সিঞ্চনে বর্ধিত হয়—সেই মনতরুও সেইরূপ শুভাশুভের কামনা-কল্পনা দ্বারা বর্ধিত হয়। বিদ্বজ্জনেরা সেই তরুকে গুরুবচনে ছেদন করেন। যে মূর্খ এই তরুকে ছেদন করিতে জানে না, সে মোক্ষমার্গ হইতে সরিয়া পড়িয়া ভবকে মানিয়া লয় অর্থাৎ জগতে দুঃখময় অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লয়। শূন্য (প্রকৃতি দোষযুক্ত প্রথম তিন শূন্য) এই তরু এবং গগন (চতুর্থ শূন্য) কুঠার। সেই তরুকে ছেদন কর মূল ডাল (বাসনাদি) সমেত।

৪৬

রাগ শবরী

পেখু সুইনে অদশ জইসা।
অন্তরালে মোহ তই সা ॥ ধ্রু ॥
মোহ বিমুক্কা জই মনা।
তবেঁ তুটই অবণা গমণা ॥ ধ্রু ॥
নউ দাঢ়ই নউ তিমই ন চ্ছিজই।
পেখ লোঅ মোহে বলি বলি বাঝই ॥ ধ্রু ॥
ছাঅ মাআ কাঅ সমানা।
বেণি পাখেঁ সোই বিণাণা ॥ ধ্রু ॥
চিঅ তথতা স্বভাবে ষোহিঅ।
ভণই জঅনন্দি ফুড় অণ ন হোই ॥ ধ্রু ॥ [জয়নন্দি]

এই পদটিতেও চিত্তের দুটি রূপের বর্ণনা। অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রকৃতি দোষযুক্ত সংবৃতি বোধিচিত্ত সমস্ত প্রকার মিথ্যা ভবজ্ঞানের জন্মদাতা। অন্যদিকে প্রকৃতি প্রভাস্বর পারমার্থিক বোধিচিত্তই বিশুদ্ধ জ্ঞান, তাহাই মহাসুখময় সহজ জ্ঞান স্বরূপ।

পেখু—দেখ; সুইনে—স্বপ্নে; অদশ—আদর্শে, দর্পণে; জইসা—যেমন; মোহ—মিথ্যা মায়া, যাহা জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব জ্ঞান সৃষ্টি করে। মোহ বিমুক্কা—মোহবিমুক্ত; জই—যদি; অবণা গমণা—আসা-যাওয়া, জন্ম-মৃত্যু; নউ··ছিজ্জই—সেই চিত্তকে কেহ পোড়াইতে, ভিজাইতে, ছেদন করিতে পারে না। পেখ··বাঝই—এ সমস্ত জানা সত্ত্বেও লোকে মোহে বদ্ধ হয় দৃঢ়ভাবে। ছাঅ বিনানা—ছায়া, মায়া, কাবা—সমান, দুই পক্ষেই সেই বিজ্ঞান। অর্থাৎ সেই একই বিজ্ঞান দুইভাবে প্রকাশিত। বিজ্ঞান যেখানে অবিদ্যাচ্ছন্ন তখন তাহা হইতেই ছায়া মায়া কায়া ইত্যাদির উৎপত্তি। কিন্তু যখন তাহা অদ্বয় স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত তখন তাহা প্রকৃতি প্রভাস্বর বিশুদ্ধ বিজ্ঞানরূপ পারমার্থিক বোধিচিত্ত। চিঅ···হোই—চিত্ত তথতা স্বভাবে শুদ্ধ হইলে সমস্ত কিছুই স্ফুট হয়, অন্য কিছু দ্বারা হয় না।

৪৭

রাগ গুঞ্জরী

কমল কুলিশ মাঝেঁ ভইঅ মিআলি।
সমতা জোএঁ জলিঅ চণ্ডালী ।। ধ্রু ।।
ডাহ ডোম্বী ঘরে লাগেলি আগি।
সসহর লই সিঞ্চহুঁ পানী ।। ধ্রু ।।

নউ খরজালা ধূম ন দিসই ।
মেরু শিখর লই গঅণ পইসই ।। ধ্রু ।।
দাঢ়ই হরিহর বাহ্মণ নাড়া ।
ফীটই নবগুণ শাসন পাড়া ।। ধ্রু ।।
ভণই ধাম ফুড় লেহুরে জাণী ।
পঞ্চ নালেঁ উঠি গেল পাণী ।। ধ্রু ।। [ধাম]

তান্ত্রিক পদ্ধতি মতে, কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া উষ্ণীষ কমলে শিবের সহিত মিলিত করিতে পারিলে সিদ্ধিলাভ হয়। এই সিদ্ধির জন্য তন্ত্রে কায়-সাধনার যে পদ্ধতি বর্ণিত আছে তাহাতে ইড়া, পিঙ্গলা দুইটি নাড়ীকে যুক্ত করিয়া মধ্যনাড়ী সুষুম্না-পথে চালিত করিতে পারিলে শক্তি ক্রমে উধ্বর্গামী হয়। আলোচ্য পদটিতে সেই তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির বৌদ্ধ রূপান্তরের বর্ণনা। দ্রঃ চর্যাপদের ধর্মমত অধ্যায়, পৃঃ ৫১।

কমল কুলিশ—মহাযানী ধর্মমতের প্রজ্ঞা ও উপায় পরবর্তীকালে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে ইড়া ও পিঙ্গলার স্থান গ্রহণ করে। কমল ও কুলিশের মধ্যে মিতালি হইল এবং ইহাদের মিলনের ফলে চণ্ডালী অর্থাৎ বৌদ্ধ তন্ত্রের কুলকুণ্ডলিনী প্রজ্জ্বলিত (জাগ্রত) হইল। সেই অগ্নি পরিশুদ্ধ অবধূতী ডোম্বীর গৃহেও লগ্ন হইল অর্থাৎ ক্রমে উধ্বর্মুখী হইল। প্রকৃতি প্রভাস্বর বোধিচিত্ত সেই আগুনে জল সিঞ্চন করে। এই আগুনের প্রখর জ্বালা অথবা ধূম দৃষ্ট হয় না। দেহমরু শিখরের উপরে গিয়া এই অগ্নি গগনে প্রবেশ করে ; অর্থাৎ জাগ্রত কুলকুণ্ডলিনী দেহমরুতে কল্পিত বিভিন্ন পদ্মের মধ্য দিয়া ক্রমে উষ্ণীষ কমলে উপনীত হয়। দাঢ়ই…পাড়া—তখন হরিহর অর্থাৎ সমস্ত প্রকার

দ্বৈতজ্ঞান এবং ব্রাহ্মণ বৌদ্ধদিগের আচার-অনুষ্ঠান বিধি-নিষেধ ইত্যাদি সমস্ত নিষ্ফল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ভণই…পানী—পদকর্তা ধাম বলিতেছেন (এই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার পদ্ধতিটি) স্ফুট করিয়া জানিয়া লও তাহা হইলে পানী (সংবৃতি বোধিচিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়া) পঞ্চ নালে উঠিয়া যাইবে।

৪৯ *

রাগ মল্লারী

বাজণাব পাড়ী পঁউআ খালে বাহিউ।
অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ ॥ ধ্রু ॥
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরণী চণ্ডালী লেলী ॥ ধ্রু ॥
দহিঅ পঞ্চ পাটণ ইন্দি বিসআ ণঠা।
ণ জানামি চিঅ মোর কহি গই পইঠা ॥ ধ্রু ॥
সোণ রুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ।
নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ ॥ ধ্রু ॥
চউকড়ি ভণ্ডার মোর লইয়া সেস।
জীবন্তে মইলে নাহি বিশেষ ॥ ধ্রু ॥ [ভুসুকু]

[সংবৃতি বোধিচিত্তের পারমার্থিক বোধিচিত্তে পরিণত হওয়া এবং তাহার ফল হিসাবে যে অবস্থার উদ্ভব নৌকা বাহিবার রূপকে তাহার বর্ণনা আলোচ্য পদটির বিষয়বস্তু।

* মূল পুঁথিতে একটি পাতা না থাকায় ৪৮ সংখ্যক পদটি পাওয়া যায় নাই। তিব্বতী অনুবাদ হইতে কুক্কুরী পাদের এই পদের সন্ধান ও তাহার সম্ভাব্য রূপটি জানিতে পারা যায়।

বজ্রনৌকা পারের উদ্দেশ্যে পদ্মখালে বাহিত হইল। বজ্রনৌকা =শূন্যতা ; পদ্মখাল=প্রজ্ঞারূপ পদ্মখাল। অদ্বয় বঙ্গে (অক্ষয় মহাসুখ ভূমিতে) উপস্থিত হইয়া সমস্ত ক্লেশ লুণ্ঠিত হইল। আজ ভুসুকু বাঙ্গালী (সহজসিদ্ধ-পুরুষ) হইল কারণ চণ্ডালীকে নিজ ঘরণী করিয়া লইল। চণ্ডালী তন্ত্রোক্ত শক্তির বৌদ্ধ তান্ত্রিক রূপান্তর। চর্যাগীতি-গুলির মধ্যে চণ্ডালী শবরী ইত্যাদি মাঝে মাঝে মহাসুখকে অর্থাৎ শক্তি জাগ্রত হইবার ফলকেও বুঝাইয়াছে। (চর্যার ধর্মমত অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) পঞ্চ পাটন (পত্তন, বন্দর এখানে পঞ্চ স্কন্ধ) দগ্ধ হইল এবং ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহ নষ্ট হইল। জানি না চিত্ত কোথায় গিয়া প্রবিষ্ট হইল। সোনা রূপা প্রভৃতি পার্থিব সম্পদ আর কিছুই রহিল না শুধু নিজের পরিবারে অর্থাৎ চণ্ডালীর সহবাসে মহাসুখেই এখন অবস্থান। চতুষ্কোটি ভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইয়া শেষ হইল অর্থাৎ চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত পরম তত্ত্ব শূন্য (দ্রঃ চর্যার দার্শনিক পটভূমি অধ্যায়) লাভ হইল। এখন জীবিতে ও মৃতে কোন পার্থক্য নাই।

৫০

রাগ রামক্রী

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হিএঁ কুরাড়ী।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী।। ধ্রু।।
ছাড় ছাড় মাআ মোহা বিষমে দুন্দোলী।
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ মেহেলী।। ধ্রু।।
হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
সুকর এবেরে কপাসু ফুটিলা।। ধ্রু।।

তইলা বাড়ীর পাসেঁর জোহ্না বাড়ী তাএলা।
ফিটেলি অন্ধারিরে অকাশ ফুলিআ ।। ধ্রু ।।
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবর শবরী মাতেলা।
অনুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা ।। ধ্রু ।।
চারিবাসে গড়িলারে দিআ চঞ্চালী।
তহি তোলি শবর ডাহ কএলা কান্দই সগুণ শিআলী ।। ধ্রু ।।
মারিল ভব মত্তা দহদিকে দিধলী বলী।
হের সে সবর নিরেবণ ভইলা ফিটলি ষবরালী ।। ধ্রু ।।

শবর শবরীর মিলিত জীবনযাত্রার একটি নিখুঁত চিত্রের মধ্য দিয়া তত্ত্ব ব্যাখ্যা। তৎকালীন অন্ত্যজ জীবনের চিত্র হিসাবেও পদটি মূল্যবান। তত্ত্বের দিকে পদটির মধ্যে চিত্তের চতুর্থ শূন্যে উপস্থিতিতে মহাসুখ লাভের কথা রূপকাকারে ব্যক্ত হইয়াছে।

গঅনত গঅনত—গগন শব্দের দুইবার ব্যবহারে প্রথম দুই শূন্যকে বুঝাইতেছে। তইলা—তৃতীয়ে লগ্ন, তৃতীয় শূন্যে লগ্ন বাড়ী। হিএঁ কুরাড়ী—প্রভাস্বর চতুর্থ শূন্যরূপ হৃদয়-কুঠারে। কণ্ঠে—সম্ভোগ চক্রে (দ্রঃ পৃঃ ৬৩); নৈরামণি—নৈরাত্মা (শবরী, পূর্বপদে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।) বলি—বালি--বালিকা; জাগন্তে—জাগে; উপাড়ী—উপাড়িয়া ফেলিলে। তৃতীয় শূন্য লগ্ন বাটিকা চতুর্থ শূন্যরূপ হৃদয়-কুঠারে উপাড়িয়া ফেলিলে সম্ভোগ চক্রে নৈরাত্মা জাগ্রত হয়। ছাড়…মেহেলী—বিষম দ্বন্দ্বময় মায়া মোহ ছাড়; শবর শূন্যরূপ মেহেলী (মেয়ে) লইয়া মহাসুখে বিলাস করিতেছেন। হেরি…ফুটিলা—আমার সেই তৃতীয় বাড়ী গুরুবচন প্রভাবে গগনতুল্য

দেখি ; এখন সুন্দর (সুকড় = সুকৃত) কার্পাস ফুটিয়াছে (**কপাসু—ক** = মহাসুখ।)

তইলা···ফুলিআ—তৃতীয় বাড়ীর পাশে জ্যোৎস্না বাড়ী। তৃতীয় শূন্যের পর চতুর্থ শূন্য। অন্ধকার (অজ্ঞান) আকাশ-কুসুমের মত দূর হইল। কঙ্গুচিনা···ভেলা—কঙ্গুচিনা একপ্রকার ধান, কাগনী ধান। এখানে মহাসুখ অর্থে ব্যবহৃত। তন্ত্রে ক = মহাসুখ। চর্যাপদগুলিতে অনেক স্থানে লক্ষ্য করা যায় গোপনীয়তার জন্য মহাসুখ বুঝাইতে 'ক' দিয়া আরম্ভ কোন কোন শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন ইতিপূর্বে কপাসু। কঙ্গুচিনা পাকিল (মহাসুখ লাভ হইল), শবর শবরী আনন্দে মত্ত হইল ; দিনের পর দিন শবরের আর কোন চেতনা রহিল না। চারি···শিআলী—চঞ্চল ইন্দ্রিয়াদি বন্ধন করিয়া শবর চতুর্থ বাসস্থান গঠন করিল এবং ভব-মত্ততাকে সেখানে তুলিয় দাহ করিল। শকুন শৃগাল (বিষয়-বাসনা-সমূহ ?) কাঁদিল।

মারিল···যবরালী—ভবমত্ততাকে মারিয়া দশদিকে বলি দেওয়া হইল। দেখ শবর নির্মূল হইল—শবরালি ঘুচিয়া গেল।

গ্রন্থপঞ্জী

১। হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা —হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২। চর্য্যাপদ—মণীন্দ্রমোহন বসু।

৩। চর্যাগীতি পদাবলী—ডাঃ সুকুমার সেন।

৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)—ডাঃ সুকুমার সেন।

৫। প্রাচীন বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী—ডাঃ সুকুমার সেন।

৬। বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়।

৮। বাঙলার সঙ্গীত (১ম খণ্ড)—রাজ্যেশ্বর মিত্র।

৯। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য—ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী।

১০। তন্ত্রকথা—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী।

১১। ভারতের সাধনা—ক্ষিতিমোহন সেন।

১২। ভারতীয় সাধনার ঐক্য—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

১৩। বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

১৪। মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ—ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দার।

১৫। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা—গোপাল হালদার।

১৬। ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা—ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

১৭। বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা—তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

১৮। Obscure Religious Cults—Dr. S. B. Das Gupta.

১৯। Introduction to Tantric Buddhism
—Dr. S. B. Das Gupta.

২০। Studies in the Tantras—Dr. P. C. Bagchi.

২১। Origin and Development of Bengali
Language [O. D. B. L.]—Dr. S. K. Chatterjee.

২২। Indian Philosophy Vol. I
—Dr. S.P. Radhakrishnan.

২৩। History of Bengal Vol. I—D. U.

২৪। Journal of the Department of Letters.

২৫। বিশ্বভারতী পত্রিকা—১৩৫৪

২৬। জগজ্জ্যোতিঃ—৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা